প্যাগোডার দেশে

(ব্রহ্মের নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী)

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

প্রণীত

বীণা লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশকের নিবেদন।

বেলুড় মঠের শ্রীৎ স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী তাঁহার 'প্যাগোডার দেশে'র পাণ্ডুলিপি আমার হাতে দিয়াছিলেন দুই বৎসরেরও আগে। তখনও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় নাই, বা ভারত দ্বিধা-বিভক্ত হয় নাই। ব্রহ্মের বিধিলিপিই বা কি তাহাও অনিশ্চয়তার গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। আরও আগে স্বামীজী যখন ব্রহ্মদেশ পর্য্যটন করেন তখন ব্রিটিশ-সিংহ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তথায় বিরাজমান ছিল। সুতরাং তাঁহার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যেখানে যেখানে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দু'এক কথা পরোক্ষে বলা হইয়াছে তাহা যে তখনকার অবস্থানুযায়ী, বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মবাসীর স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প ও প্রেরণার কথাও যেখানে যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও ঐ পটভূমিকার সমাশ্রয়ে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং অন্যান্য অসুবিধার দরুণ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইবার পর শেষটায় যখন 'প্যাগোডার দেশে'র প্রথম ফর্ম্মা মুদ্রিত হইতে থাকে তখন দিল্লীর লাল কেল্লায় দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ্ হিন্দ্' সৈন্যদলের বিচারের প্রহসন চলিতেছিল। তারপর ভারত স্বাধীন হইয়াছে, ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হইয়াছে।

স্বামীজী সাধারণ ভ্রমণকারীর মত ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন নাই। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিরূপে ঐ দেশে ছিলেন। সেবাব্রত তাঁহার দ্বিতীয় প্রকৃতি। সুতরাং যখনই যেখানে তিনি গিয়াছেন সেখানেই তিনি ঐ স্থানের অধিবাসিগণের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, পল্লী অঞ্চলে—এমন কি দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিভৃত প্রদেশেও যাইয়া ব্রহ্মবাসিগণের সহিত একত্র বস-বাস ও আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের পূজা, পার্ব্বণ এবং আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছেন, এবং এইভাবে তিনি তাহাদের গার্হস্থ্য জীবন, তাহাদের সমাজ, তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ, এক কথায়, তাহাদের স্বরূপ

বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকৃতির মনোরম লীলাভূমি ব্রহ্মের বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও যেন উহার স্বভাব-সৌন্দর্য্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, যাহারা অতঃপর দরদী হৃদয় লইয়া স্বাধীন ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন তাহাদের পক্ষে 'প্যাগোডার দেশে' সহযাত্রী ও পথ-প্রদর্শকের কাজ করিবে। আর যাঁহাদের পক্ষে ঐ মন্দিরময় বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশটির সাক্ষাৎ সম্পর্কলাভ সম্ভব হইবে না, তাঁহারাও স্বামীজীর এই একান্ত নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই।

'প্যাগোডার দেশে' মোট ষোলটি প্রবন্ধের আকারে লিখিত। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সাপ্তাহিক "**দেশ**", মাসিক "**উদ্বোধন**" এবং "**সংহতি**" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। একটি প্রবন্ধ "**আনন্দবাজার**"-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ স্বামীজীকে তাঁহার ব্রহ্মের সমগ্র ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থের আকারে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন ; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামীজীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকুমার দে, এম্-এ, বি-এল, মহাশয় এই গ্রন্থের অনেকাংশের প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের অঙ্কিত এবং স্বামীজীর প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধার নিদর্শন। গ্রন্থের অন্যান্য ছবিগুলি স্বামীজী তাঁহার ভ্রমণকালে স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের ক্রমবর্দ্ধমান পাঠকবৃন্দ 'প্যাগোডার দেশে' পাঠ করিয়া ভারতের প্রতিবেশী সৌন্দর্য্যময় ঐ দেশটির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দিত হইতে পারিয়াছেন জানিলেই আমরা আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে মনে করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীদিগেন্দ্রলাল সরকার

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল।

সূচী

স্বস্তিকাসনে ধ্যান-মগ্ন ভগবান বুদ্ধদেব

প্যাগোডার দেশে

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশ আমাদের ভারতবর্ষের অতি নিকটে হলেও—আমরা অনেকেই সেই দেশ বা দেশবাসীদের সম্বন্ধে খবর অতি সামান্যই জানি, অবশ্য যে সব ভারতবাসী দীর্ঘকাল ঐ দেশে বাস ক'রছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মদেশকে 'মঘের মুলুক' বা 'ডাকুর দেশ' বলেই আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু আমাদের শোনা কথার পেছনে কোনো সত্য আছে কি না—তা জানবারও ইচ্ছা হয় নি। এই না জানার কারণ বোধ হয় ব্রহ্মদেশে যাওয়া আসার এবং সে দেশবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার কোন অবাধ পথ বা সুযোগ সুবিধা আমাদের ছিল না,—তাই তাদের সম্বন্ধে এই অস্পষ্ট ধারণা।

আজ বোধ হয় সে অলীক ধারণা আর কারো নেই, এবং ব্রহ্মদেশকে জানবার ও বোঝবার জন্য আমাদের সত্যিকারের একটা প্রবল আগ্রহ জেগেছে।

আমি অনেকদিন ব্রহ্মদেশে বাস ক'রে বিভিন্ন সময়ে ওদেশের নানা সহরে, নগরে, পল্লীতে, মঠে, মন্দিরে, পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে, ওদেশবাসী ধনী, মানী, সাধারণ এবং ভিক্ষুগণের সঙ্গেও বিশেষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। এমন কি, তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন বাসও ক'রেছি; তাতেই ওদেশবাসীদের নিত্যকার জীবনধারার যে পরিচয়টুকু পেয়েছি—আহার বিহার, হাসিকান্না, আনন্দ উৎসব, ধর্ম্ম কর্ম্ম ইত্যাদি যা' সব কিছু নিত্য চোখে দেখেছি ও বুঝেছি সেই সুন্দর ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মদেশ এবং ব্রহ্মবাসীদের কথাই এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রবো।

বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপসৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত, চিরশ্যাম-শোভাময়, পরম রমণীয় এই ব্রহ্মদেশ। এই সমৃদ্ধ ও সুন্দর দেশের জলে, স্থলে, বনে, পর্ব্বতে কত যে অমলা

রত্ন ছড়িয়ে আছে, তার তুলনা অন্যত্র বিরল। ব্রহ্মের শৈলশ্রেণী ও সমতলের বুক চিরে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার তৈল নিষ্কাসিত হচ্ছে। এর নদী-বিধৌত বিশাল প্রান্তরের অপর্য্যাপ্ত শস্য-সম্ভার বিদেশে রপ্তানি হয়। এর শ্যামল বনবীথিকার মূল্যবান শাল সেগুন কাঠ বিশ্ব-বিখ্যাত। আবার সীসা, টিন এবং স্বর্ণখনিও ব্রহ্মের পরম সম্পদ। সাগর-গর্ভে সঞ্চিত মহামূল্য মণিমুক্তা এদেশকে আরো ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তুলেছে।

প্রথমে এদেশে পাঁচটী জাতির বাস ছিল। সান, কেরিন, তেলাং, আরাকানিজ এবং বর্ম্মি। তবে সান ও কেরিন জাতি কখনও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। আরাকানিজরা পূর্ব্ব হতেই স্বাধীনভাবে আরাকান প্রদেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন। সেই মগ রাজগণের বীরত্ব-স্মৃতি বাংলা এখনো ভোলেনি। জাহাজ যাতায়াতের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় তেলাং রাজগণ সাগর পাড়ি দিয়ে এদেশে এসে থাটন্ নগরে রাজ্য বিস্তার করে বহুদিন পরাক্রমের সাথে রাজ্য শাসন করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করেছেন, এঁরা বোধ হয় কোরমণ্ডল উপকূল দিয়েই এদেশে এসেছিলেন। আবার হান্তোয়াডি অর্থাৎ বর্ত্তমান পেগু নগরীতে চোল রাজবংশও কিছু কাল রাজত্ব করেছেন। আজও এখানে তাঁদের কীর্ত্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তা দেখলে প্রাণে অনেকটা বিস্ময় উদ্রিক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মরাজগণই প্রথম হ'তে এদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করে বিশেষ সাহস, শৌর্য্য এবং বীরত্ব দেখিয়ে রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠার ভিতর দিয়ে এদেশের শাসন সংরক্ষণ করেছেন।

ব্রহ্মের শেষ রাজা থিবো মান্দালয় রাজধানীতে রাজত্ব করবার সময়ই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করেন। এর আরও পূর্ব্বে আরাকান তাঁদের করতলগত হয়েছিল।

ব্রহ্ম-ইতিহাসের পরম গৌরবময় রাজধানী পাগান নগরীর রাজা অনারাথাই বোধ হয় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে সমগ্র

ব্রহ্মদেশে ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ব্রহ্মরাজগণ স্বধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ বহু অর্থব্যয়ে অগণিত মন্দির, স্তূপ এবং বিহার নির্ম্মাণ ক'রে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেছেন। তাই বিদেশীয়দের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদেশের সহর-পল্লীতে, সমতল-নদীতীরে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে যে সব বহু অর্থব্যয়ে গঠিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-সমন্বিত মন্দির ও স্তূপশ্রেণী। সত্যিই এই মন্দিরগুলি এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এজন্য এদেশকে 'ল্যাণ্ড অব প্যাগোডাস' অথবা "ফায়া'র দেশ বলা হয়।

এদেশবাসীদের কোন জাতের বিড়ম্বনা নেই। এদের ধর্ম্ম, ভাষা ও জাতিতে কোন সংকীর্ণতা বা বিভিন্নতা মোটেই নেই। এমন কি এদের নামের পিছনে কোন পদবী পর্য্যন্ত নেই,—সবই যেন এক! এরা সদা হাস্যময়, সৌখীন এবং আমোদ-প্রিয়। এদের দেহ সুস্থ সবল এবং সুগঠিত। এরা খর্ব্বাকৃতি; এদের নাক চ্যাপ্টা; চোখ একটু ছোট; গায়ের রং খুবই ফরসা এবং লালিমাভ বলে বড়ই সুন্দর। মুখের পানে চাইলে মঙ্গোলিয়ান জাতির সঙ্গে এদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে ব'লে মনে হয়। মেয়ে এবং পুরুষ উভয়েই নির্ভীক ও সাহসী। বাল্যকাল হতেই সৌখীনতার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে ব'লে এরা অবাধ আনন্দ-স্রোতেই সর্ব্বদা ডুবে থাকতে চায়।

বিলাসিতার জন্য এদেশ বিখ্যাত; ব্রহ্মবাসিগণের চাকচিক্যময় পোষাক-পরিচ্ছদই তার প্রধান পরিচায়ক। পুরুষদের পরিধানে সুন্দর বিভিন্ন বর্ণের লুঙ্গি, গায়ে জামা, মাথায় রুমাল জড়ানো,—সবই রেশমের তৈরী। এগুলোর মূল্যও যথেষ্ট। পায়ে ভাল জুতো, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, রুমালে এসেন্সের সুমিষ্ট গন্ধ ভুরভুর করছে। মেয়েরা আরো সৌখীন। তাদের বিচিত্র রঙের লুঙ্গি এবং জামা, গলায় জড়ানো ওড়না বা চাদর,—সবই মূল্যবান রেশমে তৈরী এবং খুবই সুন্দর। পায়ে নিজেদের তৈরী ফান্না বা জুতো, হাতে দু'চার গাছা সোনার চুড়ি, আঙুলে হীরের আংটী, কাণে হীরের দুল, মাথায় হাতীর দাঁতের চিরুণী, পায়ে সোনার মল এবং মুখে তানাখা মাখানো। তানাখা এই দেশের এক প্রকার গাছ, চন্দনের

মত ঘষে ব্যবহার করা হয়। বর্ত্তমানে এর পরিবর্ত্তে শিক্ষিতেরা অনেকেই ক্রীম, পাউডার প্রভৃতি ব্যবহার করছেন। বিলাতের বাজার হতে এদেশে বিলাস প্রসাধনের অনেক দ্রব্য আমদানী হচ্ছে। মেয়েদের প্রধান সৌন্দর্য্য ও আদরের জিনিস হ'ল তাদের কালো কেশগুচ্ছ। বাল্যকাল হতে সযত্ন পরিচর্য্যায় অতি সুন্দরভাবে বিন্যাস ক'রে এই দীর্ঘ কেশদামকে কুণ্ডলাকৃতি ক'রে মাথার উপরে সাজিয়ে তাতে আবার নানা বর্ণের ফুল গুঁজে সৌন্দর্য্য আরো বাড়িয়ে তোলে। কারো কারো কেশ-গুচ্ছ পা পর্য্যন্ত বিলম্বিত; কারো বা আরো দীর্ঘ। আতর এসেন্স এদের নিত্য ব্যবহার্য্য। বিধাতার আশীর্ব্বাদে অনুপম দৈহিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও দেহের শোভা-সৌন্দর্য্য আরো বেশী করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য ব্রহ্ম-নারীগণের চেষ্টার অবধি নেই। বিলাসিতা যেন এদের খুবই স্বাভাবিক অবস্থা। কোন উৎসব-আমোদের সময় যখন ব্রহ্মবাসী মেয়ে পুরুষ শোভামর পরিচ্ছদে সেজে গুজে দলে দলে বের হয়, তখন তাদের মধ্যে গরীব এবং ধনীর পার্থক্য ধরা অসম্ভব। অবস্থানুযায়ী পরিচ্ছদ রেশমের পরিবর্ত্তে সুতোরও হয়। জাতীয় পরিচ্ছদের প্রতি বর্ম্মিদের যথেষ্ট দরদ। কখনো বিদেশীর অনুকরণে পোষাক ব্যবহার করতে তাদের বড় একটা দেখা যায় না।

ভারতের বিভিন্ন দেশের তুলনায় ব্রহ্মবাসী যথেষ্ট শিক্ষিত; শতকরা প্রায় ৬৫ জন মেয়ে এবং পুরুষ নিজেদের ভাষা লিখ্‌তে ও পড়তে পারে। শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতি গ্রামের বৌদ্ধ বিহারেই রয়েছে। বাল্যকাল হতেই ওখানে ছেলে এবং মেয়েকে পড়তে হয়। বর্ত্তমানে ইংরেজী শিক্ষায়ও এরা বেশ এগিয়ে যাচ্ছে;—জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, কেরাণী সব রকমই হচ্ছে। অবশ্য এতে খানিকটা সাহেবিয়ানাও বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলা হ'তেই এরা ডানপিটে হয়ে তৈরী হয়। তাই এরা যেমন দুঃসাহসী, তেমনি অতি সহজেই দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নিতে পারে। খেলাধূলায়ও ব্রহ্মবাসী যথেষ্ট সুদক্ষ।

সাংসারিক জীবনে এত ভবিষ্যতের ভাবনাহীন জাতি এদের মত আর কোথাও নেই। এরা যেন প্রাণে প্রাণে বুঝেছে দুনিয়াটা দুদিনের, তাই যতদিন বেঁচে

থাকা, খুব আনন্দ-স্ফূর্ত্তিতে সমস্ত প্রাণ ঢেলে ভোগ করে যাওয়াই কর্ত্তব্য। তবে ভোগ শুধু এক ভাবের নয়, সঙ্গে আবার ধর্ম্মকেও দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে রাখতে হবে। এদের জীবিকার উপায় কৃষি ও বাণিজ্য এবং বর্ত্তমানে চাকুরী। কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য এদেশ বিখ্যাত। চাকুরিটি এখনো এ দেশবাসী তেমন ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। মেয়েরা স্বাধীন, এদেশে পর্দ্দার বালাই নেই। রাস্তার ফেরিওয়ালী হতে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা মেয়েরা অতি সহজে চালাচ্ছেন। বড় ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত ব্যবসা করছেন। এটি এদের অসম্মানের কিছু নয়, বরং গৌরবেরই। বর্ম্মার বাজারে প্রবেশ ক'রে দেখে অবাক হতে হয়, শত শত রূপসী সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে অতি বিচক্ষণতার সাথে নানা দ্রব্যসম্ভার কেনাবেচা করছেন। ভিক্ষা মেগে খাওয়াটাকে এরা মোটেই পছন্দ করে না। নিজেরা যে কোন একটা কাজ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করবে,—যেমন ফুল বিক্রি, চুরুট তৈরী, জুতো তৈরী, পিঠে ও শাক সবজী বিক্রি—এরূপ ছোট খাট কাজ ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করবে। অতি সামান্য আয়েতেও এদেশের মেয়েরা নিজেদের বুদ্ধি ও কর্ম্মদ্বারা একটি পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম হয়। ভিখারীর সংখ্যা ব্রহ্মে বড় একটা নেই। উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা ডাক্তারী, ওকালতি, মাষ্টারী, কেরাণীগিরি—সব কাজেই যোগ দিচ্ছেন। তুলনায় এদেশে মেয়েরাই পুরুষের চেয়ে বেশী কর্ম্মঠ ও সব কাজেই উৎসাহী ;—ধর্ম্মে, কর্ম্মে এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারে পর্য্যন্ত !

ব্রহ্মবাসীদের ঘরবাড়ীগুলি বেশ সুন্দর। অবস্থাশালিগণের কাঠের দোতালা বাড়ীগুলোর সৌন্দর্য্য সত্যিই মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমানে ইটের পাকা বাড়ীও তৈরী হচ্ছে। অবশ্য গরীবদের কথা স্বতন্ত্র। সবদেশে যেমন এদেরও তেমনি বাঁশের বা কাঠের উঁচু মাচার উপর ঘরগুলি তৈরী। নীচে দু' একখানা তাঁত ও গৃহপালিত পশুদের আশ্রয়-স্থান। পল্লীতে প্রায় গৃহেই নিজেরা নিজেদের তৈরী রেশমী লুঙ্গি ব্যবহার করে। ঘরে আসবাব পত্র তেমন বিশেষ কিছু নেই ; তবে যতটুকু না হলে চলে না ততটুকু মাত্র। অবশ্য বড়লোকদের একটু

বিশেষত্ব আছে। তা হলেও বাংলার গরীব এবং মধ্যবিত্তদের সাথে এদের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের গৃহসজ্জার তুলনাই হয় না। বাঙালী এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নত।

আবার বলি, ব্রহ্মবাসীদের বিশেষত্ব হল বেশভূষায়। এদের বাইরের চাকচিক্য বড়ই মুগ্ধকর। যার ঘর খুঁজলে দশ টাকার জিনিসও বের হবে না, তার হাতেও হয় তো একটী দামী হীরের আংটি, পরিধানে মূল্যবান লুঙ্গি! সঞ্চয়-বুদ্ধি এদের নেই। ভবিষ্যতে কি হবে, ছেলেমেয়েরা কি খাবে, এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে ব্রহ্মবাসী মোটেই রাজী নয়। যখনই হাতে টাকা হল, অমনি কতক টাকা সৎ কাজে অর্থাৎ দেবতা বা মন্দির প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করে, নয়তো ভিক্ষুকদের সেবা করে; অবশিষ্ট টাকা দিয়ে নিজেদেয় কিছু সখের জিনিস, পোষাক পরিচ্ছদ ও আহার বিহারে নিঃশেষ ক'রে শূন্যহস্ত হয়। হয়তো লক্ষ টাকা একমাসে ব্যয় করে গরীব হয়ে প'ড়ল! কিন্তু এতে মনে কোন আপশোষ বা পরিতাপ নেই,—কাল ধনী ছিল, আজ নির্ধন! তবু এরা সকল অবস্থায়ই বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকে, সংসার জীবনে এটা বড়ই আশ্চর্য্য।

ব্রহ্মবাসীদের আহার্য্যের তেমন আড়ম্বর নেই। যদিও এদেশবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ী তথাপি এদের প্রধান খাদ্য মাছ-মাংস। এটা যে এদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ তা এরা জানে; কিন্তু নিরামিষ আহারে এরা মোটেই অভ্যস্ত নয়। এদের রান্নাও একটু নূতন রকমের। ভাত বোধ হয় এত সুন্দর আর কোন দেশে হয় না,—একেবারে সাদা ফুলের মত। আলু, মূলা, কুমড়ো, কপি, এরা ভালবাসে, কিন্তু ডাল মোটেই পছন্দ করে না। তেল বা ঘিয়ের গন্ধও এদের অসহ্য। মাছ, ব্যাও এবং অনেক জানোয়ারের মাংস এরা একটু পচিয়ে খায়। মাছকে পচিয়ে একপ্রকাব উপাদেয় আহার্য্য তৈরী হয়, তাব নাম নাপ্পি। এ পদার্থটিতে এতই দুর্গন্ধ যে এক শিশি বাড়ীতে রাখলে সে বাড়ীতে বাস করা দায়,—অবশ্য বিদেশীয়দেব পক্ষে। কিন্তু নাপ্পি না হলে এদের কোন ব্যঞ্জনই ভাল হয় না। গরীবরা মাছ পুড়িয়েও খায়। সকালে আটটায় ও বৈকালে পাঁচটার মধ্যেই আহারের সময়। দুপুরে ও রাতে এরা চা বা কফির সদ্ব্যবহার করে। অবস্থানুসারে কেউ বা চেয়ার,

টেবিলে বসে খায়। আবার অধিকাংশ গরীব লোকেরা আধহাত উঁচু একখানা গোল টেবিলের উপর আহার্য্য সাজিয়ে, সবাই চারদিকে ঘিরে বসে; যার যেমন দরকার তুলে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে খায়। গরীব ধনী সকলের গৃহেই এই সুন্দর ব্যবস্থাটি রয়েছে। কোন আত্মীয় বা অতিথি উপস্থিত হলে তাকেও ঐ সঙ্গে ডেকে নিয়ে যা কিছু তৈরী আছে তা দিয়েই আদর আপ্যায়ন করে, এতে কারো কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা নেই। একবারে অধিক আহার্য্য কেউ গ্রহণ করে না। আহারের পর দুধ বাদে চা-পাতা সিদ্ধ করে নুন দিয়ে খায়। কফি, চা এবং চুরুট এদের বড়ই প্রিয়। বৃদ্ধ হতে শিশুটীর মুখেও দিনরাত চুরুট জ্বল্‌ছে। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে দু'এক পয়সার কিছু ভাজা, সিদ্ধ কিনে খাওয়া এদের স্বভাব।

সামাজিক আচারে ব্রহ্মবাসী বড়ই উদাসীন। যে কোন জাতের রান্না খেতে এঁদের কোন বাধা নেই। আবার হয়ত ভাত খেতে খেতে হাতটা রুমালে মুছে দেবতার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিচ্ছে। স্নানের সময় কিন্তু সাবান মেখে শরীর বেশ পরিষ্কার করে।

ব্রহ্মবাসীরা খুব মিষ্ট-ভাষীরা এবং অতিথিপরায়ণ। এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও এরা বড়ই বদ্‌মেজাজী বা হঠাৎ-রাগী। এদের ভালবাসা যেমন প্রাণঢালা, তেমনি আবার অতি সামান্য ব্যাপারে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে অতি আপন জনকেও হত্যা করতে বা নিজের প্রাণ দিতে এরা কোনই দ্বিধা বোধ করে না। প্রাণটা নিয়ে ছিনি মিনি খেলতে বড়ই ওস্তাদ; কোন আপশোয বা অনুশোচনা এতে নেই। মৃত্যু যেন অতি তুচ্ছ ব্যাপাব। সাধারণ গ্রাম্য বর্ম্মিরা সর্ব্বদাই একখানা উন্মুক্ত দা হাতে ক'রে সাহসীর মত পথ চলে। কখন কখন এদের জোয়ানদের মধ্যে দা'য়ের খেলা দেখেছি—তা আমাদের লাঠি খেলার মতই কৌশল-পূর্ণ। সন্তানকে যখন এরা শাসন করে, তখন সে এক নির্ম্মম দৃশ্য। মা বাপ রেগে সন্তানকে মাববে, তার পালাবার পথ নেই। সম্মুখে দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে—যতক্ষণ না অভিভাবকের ক্রোধ নিবৃত্তি হয়। পালিয়ে গেলে বাপ মাকে অসম্মান করা হয়,—এই এদের ধারণা। গ্রাম্য-প্রধানের আদেশ কখনো এরা কেউ অবহেলা

করে না। বিপদে সম্পদে তার আহ্বানে মেয়ে পুরুষ সবাই একত্রিত হয়; একতার ভাবটী এদের ভিতর বেশ রয়েছে।

সৌন্দর্য্যের নেশায় আবার বর্ম্মিরা এতই বিভোর যে, চাঁদনী রাতে ছেলে মেয়েরা সেজেগুজে বিভিন্ন দলে আনন্দে বিভোর প্রাণে নাচগান করতে করতে পথে বের হয়। ভায়োলিন এবং ব্যাঞ্জোর সুমিষ্ট সুরও সঙ্গে থাকে। এদের ঐক্যতান-বাদন ও 'পোয়ে' নৃত্য জগৎ বিখ্যাত। শিক্ষিত মেয়েরাও এতে অভ্যস্ত; কারো কোন লাজ বা সঙ্কোচ এতে নেই। উৎসব আনন্দে ভাড়াটে পোয়ে নৃত্যেরও ব্যবস্থা হয়। তখন পল্লী বা সহরের মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো রাত জেগে নাচগান উপভোগ করবে এবং চা ও খাবারের দোকানে হল্লা চলবে।

এদেশে বাল্য-বিবাহের প্রথা নেই। বিবাহ ব্যাপারে সমাজের কোন বিধি বা নিষেধও নেই। এদের এ ব্যাপারটা কতকটা সাহেবদের কোর্টশিপের মত। গোপনে যুবক-যুবতীর প্রেম নিবেদন হয়, এবং একদিন তারা সুযোগ বুঝে উভয়ে বাড়ী হতে উধাও হয়ে যায়। তখনি প্রকাশ হয়, এদের বিবাহ হয়েছে। কয়েক দিন পরে তারা গ্রামে ফিরে এসে ভিন্ন ভাবে ঘরকন্না সুরু করে দেয়। অথবা মেয়ের বাড়ী গিয়ে ছেলেটি সংসার করে। অবশ্য বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে কখন কখন মা বাপও ছেলেমেয়ের বিবাহ স্থির করেন। বিবাহে তেমন কোন উৎসব নেই, বাঁধা নিয়মও নেই। স্বামী স্ত্রী উভয় উভয়কে ত্যাগ করে নূতন বিবাহ করতে পারে। এদের বিবাহে জাতিভেদ নেই। আবার মেয়ে বা পুরুষ বিবাহ না করেও পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারে। এতে এদের সমাজে কোন নিন্দা বা স্তুতি নেই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ম্মিরা বড়ই গোঁড়া। ভগবান বুদ্ধদেবের—'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'—এই মহান্ পবিত্র বাণীর প্রতি এদেশবাসীর অগাধ বিশ্বাস। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি, ভগবান বুদ্ধের প্রতি এবং সঙ্ঘের প্রতি এদের অসীম শ্রদ্ধা। অপর কোন ধর্ম্মের প্রতি এদের তেমন আস্থা নেই। এদেশের প্রতি পল্লীতে, সহরে,—সর্ব্বত্রই অগণিত মন্দির, বিহার, স্তূপ ও বৌদ্ধভিক্ষু

রয়েছে। গৃহীরাই অকাতরে অর্থ ব্যয় ক'রে মন্দির ও দেবতা স্থাপন হ'তে ভিক্ষুদের অশন বসন যা কিছু দরকার শ্রদ্ধায় দান করে নির্ব্বাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এদের কোন বিধি-নির্দ্দিষ্ট পূজা বা পুরোহিত নেই ; নিত্যকার প্রার্থনা ও কর্ম্মের দ্বারাই এরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করে। ভিক্ষুদের প্রতি গৃহীদের এতই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে, তাঁদের 'ফায়া' বা 'ফুঙি' অর্থাৎ দেবতা বলে সম্বোধন করে, এবং প্রত্যেক ঘরে আহার্য্যের অগ্রভাগ ভিক্ষুর জন্য রেখে দেওয়া হয়। দিনের নির্দ্দিষ্ট সময় ভিক্ষুগণ পল্লীতে ভিক্ষায় বের হ'লে গৃহলক্ষ্মীরা তাঁদের ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে দিবসের প্রধান ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন। কোন বিহারেই রান্নার ব্যবস্থা নেই। বিহারকে এরা 'চঙ্' বলে। ভিক্ষুগণ আবার বেলা বারটার পর অন্ন গ্রহণ করেন না। মন্দির ব্যতীত গৃহস্থের ঘরেও শ্রীবুদ্ধের আলেখ্য অথবা মূর্ত্তি নিত্য পূজিত হয়। এ ছাড়া গ্রামের মন্দিরে অথবা বিহারে গৃহীরা সকাল সন্ধ্যায় উপস্থিত হ'য়ে প্রণাম, প্রার্থনা ও মালাজপে মগ্ন হয়। পরে ধূপ দীপ জ্বেলে দেবতার সম্মুখে পুষ্পগুচ্ছ সাজিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। প্রতি পূর্ণিমায় অথবা বিশেষ কোন উৎসব দিবসে সহর ও পল্লীতে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে মেয়ে, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু, সবাই সেজেগুজে মন্দিরে ছুটে যায়। মন্দিরতলে নানাবিধ গান নৃত্য ঐক্যতানবাদন প্রার্থনা ইত্যাদিতে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে ধূপ-দীপ পুষ্প সবাই দেবতাকে উৎসর্গ করে। কেউ বা অন্নসত্র, জলসত্র খুলে ধর্ম্ম সঞ্চয় করে। প্রতি গ্রামে জল-সত্রের ব্যবস্থা রয়েছে। এটিও ধর্ম্মের অঙ্গ। এরা যে শুধু কতকগুলি নিয়মের ভিতর দিয়ে কাজ করেই নির্ব্বাণ লাভ করতে চায়, তা নয়, নিজেদের জীবনেও ত্যাগের মহিমা ফুটিয়ে তুলতে চায়। ব্রহ্মশিশু বাল্যকাল হতেই মায়ের সাথে ধর্ম্ম শিক্ষার সুযোগ পায়। পরে বড় হয়ে তাকে বৌদ্ধ বিহারে সংযতভাবে মুণ্ডিত-মস্তকে কষায়বস্ত্র পরিহিত হয়ে একান্ন আহারে ব্রহ্মচারী রূপে ভিক্ষুদের নিকট থেকে ত্রিপিটকের নীতি ও শীল শিক্ষা করতে হয়। এটী বাধ্যতামূলক নিয়ম। পরে কারো যদি ভিক্ষু হতে ইচ্ছা হয়, তার মা বাপ মহানন্দে তাকে ভিক্ষু সাজিয়ে সৌভাগ্যবান মনে করে। ভিক্ষুদের প্রতি এদের গভীর শ্রদ্ধা দেখলে বিস্মিত হ'তে

হয়। ধর্ম্ম এদেশে খুবই জাগ্রত। মেয়েদেরও ভিক্ষুণী হবার অধিকার রয়েছে। তাই এদেশে ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এঁরা বিশেষ কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়ে নীতি ও শীলের প্রতি বিশ্বাস রেখে ভিক্ষুর শ্রেষ্ঠ জীবন অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক মঠাধ্যক্ষ প্রধানভিক্ষুর আদেশ-নির্দ্দেশ আশ্রমবাসী সকল ভিক্ষুগণকেই মেনে চলতে হয়। মঠের শাসন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার অধিকার কোন ভিক্ষুরই নেই। মঠের বাইরে যেতে হলেও অনুমতি নিতে হয়। একমাত্র ধর্ম্ম উপদেশ ও বিহারের বিদ্যাপীঠে পড়ান ছাড়া ভিক্ষুগণ বাহিরের অপর কোন কাজ করবেন না। অবশ্য, নিজেদের পাঠ, প্রার্থনা, জপ, ধ্যান এসব নিত্য করণীয়। এদেশের অনাথ বালকদের প্রতিপালন এবং জনশিক্ষা এইসব বিহারেই সম্পন্ন হয়। এরা যতই উচ্ছৃঙ্খল বা বিলাসী হ'ক না কেন, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে নয়। বাল্যকাল হ'তেই বর্ম্মিরা ধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম ব্যাপারে এরা বড়ই উদার; যে কোন জাতিই এদের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। শুধু, পাদুকাটী বাইরে ছেড়ে যেতে হয়।

অতি দুঃখেও বর্ম্মিগণ তেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ে না। মৃত্যুটা যেন এদের নিকট তেমন দুঃখজনক নয়। অবশ্য উপযুক্ত ছেলে বা মেয়ে মারা গেলে মা বাপের মনে একটা আঘাত লাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, সেও খুব সাময়িক; কখনও তারা অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে না। বয়স্ক বা প্রাচীন ব্যক্তি মারা গেলে, তার মৃতদেহ ঘরে সাজিয়ে রেখে উৎসব আরম্ভ করা হয়। গান, নৃত্য, আত্মীয়দের খাওয়ান, দেবতারূপী ভিক্ষুদের দান ইত্যাদি দিনের পর দিন চল্‌তে থাকে। পরে একদিন মন্দিরের মত কাঠের খাটিয়া তৈরী করে, সুন্দরভাবে তাকে পত্রপুষ্পে সাজিয়ে তার ভিতর শবদেহটী রেখে শত শত লোক শোভাযাত্রা ক'রে, গান বাজনা সহ শ্মশানে নিয়ে, অনেক বাজি বাজনায় সোর-গোল ক'রে মৃতদেহ দাহ করে। অনেক সময় শবের সাথে সোণা বা রূপার নানারূপ জিনিষ দেওয়া হয়। অবশ্য, অবস্থা অনুযায়ী এ ব্যাপার দু'একদিনেও সমাধা হয়; তবে কিছু করতে হবেই। কোন প্রাচীন ভিক্ষুর মৃতদেহ হ'লেত

কথাই নেই। নূতন মন্দির তৈরী করে দু-তিন বৎসর ঐ দেহ তার ভিতর রেখে নিত্য প্রার্থনা করবে। পরে সমগ্রদেশে ঘোষণা দ্বারা প্রচারিত হবে, কবে কোথায় ঐ দেহ অগ্নিসাৎ করা হ'বে। তার একমাস আগে থেকে বিরাট মেলা আরম্ভ হ'বে; গান, বাজনা, নৃত্য, আমোদ, খাওয়া, প্রভৃতি চলতে থাকবে; হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হবে, এবং কোন মন্দিরের নিকট মুক্ত ময়দানে অপূর্ব্ব সুন্দর মন্দিরেব মত কাঠের সুসজ্জিত রথ তৈরা হবে। তাতে বারুদের বোমাও সাজিয়ে দেবে। পরে মৃতদেহটী রথের মধ্যে রেখেই মহা উৎসবানন্দ ও জনকোলাহলের মধ্যে অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করে ফেলবে। আগুন লাগাবার সময় বহু ভক্ত আগ্রহ সহকারে অগ্নি স্পর্শ করতে অগ্রসর হয়,—এও মহা পুণ্য সঞ্চয়ের এক সুযোগ!

এত আনন্দ আমোদে কাটিয়েও কিন্তু বর্ম্মিরা রাজনৈতিক ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নয়। ভারতবর্ষের পাশা পাশি দাঁড়িয়ে তারাও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এদেশে আরো বিশেষ সুবিধা এই যে, কোন কাজে নরনারীর সমবেত শক্তিতে সাফল্য লাভের সম্ভাবনাই বেশী। বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তমের কথা বোধ হয় আজও আমাদেব মনের সামনে জেগে রয়েছে। পরাধীন ব্রহ্মের মুক্তি-মন্ত্র যেন তিনিই বিশেষ করে দেশবাসীর কানে কানে ধ্বনিত করে গেছেন। আজ ওদেশে স্বাধীনতাকামী কয়টী দলও গড়ে উঠেছে। তাঁরা বলেন ভারতবর্ষেব আগেই তাঁরা স্বাধীন হবেন, কারণ—তাঁদেব একজাত, এক ধর্ম্ম এক ভাষা, তাঁদের কোন গোল বা দলাদলি নেই। এভাবেই বর্ম্মিবা ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন অতিবাহিত কবছে। বর্ত্তমানে বৃটিশ সরকার ঐদেশকে শাসন সংরক্ষণের সুবিধার জন্য উপর ব্রহ্ম ও নিম্ন ব্রহ্ম চিহ্নিত করে বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন করেছেন। অফিস, আদালত, জেল, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, রাস্তা, বাজার, সেনা-নিবাস, সবই সুন্দর ভাবে তৈরী করেছেন। পায়ে হেটে, ট্রেণে অথবা জলপথে সমস্ত দেশটি ঘুরে আসা যায়।

এদেশে কৃষি, বাণিজ্য ও রাজস্বে অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও, জানিনা কেন, একটি বর্ব্বর নিয়মের দ্বারা বৃটিশ সরকার মিউনিসিপালিটীর সীমানার বাইরে সর্ব্বত্র

সাবালক মেয়ে-পুরুষের মাথা পিছু নির্দ্ধারিত ট্যাক্স প্রতি বৎসর আদায় করেন। এ ব্যাপার নিয়ে সরকারের সাথে জনসাধারণের দু' একবার ঝগড়া লড়াইও হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিকার হয়নি। বর্ত্তমান জগতে এরূপ প্রথা বোধ হয় আর কোথাও নেই।

এদেশের প্রধান সহর বা রাজধানী হ'ল রেঙ্গুন—সুন্দর শোভাময় নূতন তৈরী সহর—এটী একটী বিখ্যাত বন্দরও বটে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় এবং অন্যান্য বিদেশীয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকই ব্যবসা বাণিজ্যাদি নানা কাজে এদেশে ছড়িয়ে ছিলেন। ভারতের মতই এদেশকে উন্নত করবার জন্য ইংরেজ সরকার নানারকম নীতি বিস্তার করেছেন। রাজগুরু পাদ্রী সাহেবরাও এসে প্রায় সহরেই তাঁদের চার্চ ও স্কুল এক সঙ্গেই স্থাপন করে যীশুর জয় গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। বর্ম্মা জাতির ভিতর তেমন সুবিধা না হলেও, এদেশের পাহাড়ীয়া 'কেরিন' জাতিটিকে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে পাদ্রীগণ তাঁদের পবিত্র প্রেমের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। জানিনা দয়াল বুদ্ধ ভগবান কবে ব্রহ্মবাসীদের আত্মজ্ঞান খুলে দেবেন।

সত্যিই যদি কেউ এদেশ দেখতে বা এদের সম্বন্ধে জানতে চান, তিনি যেন বিশেষ করে উপর ও নিম্নব্রহ্মের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ভ্রমণ করে যান। রেঙ্গুন—বর্ত্তমান রাজধানী; মান্দালয়—স্বাধীন ব্রহ্মের স্মৃতিজড়িত ধ্বংশপ্রায় শেষ রাজধানী; মেমিও ও কালো—এদেশের অপূর্ব্ব সুন্দর চির-শ্যামল সরকারী শৈলাবাস; টাউনজী—এটি সান্‌দেশ, এদেশেরই অংশ, স্বাস্থ্যকর পাহাড়ী সহর; মৌলমিন—পুরাতন সুবর্ণভূমি, বর্ত্তমান সাগর সৈকতাবাস; আরাকান—মগরাজ্য। এই স্থানগুলি দেখলে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে তার ঐশ্বর্য্য এবং পাহাড়ী ও সমতলবাসী লোকদের সরল তেজস্বী সুন্দর স্বভাবের সাথে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হ'তে হবে।

ব্রহ্মদেশ এতদিন ভারতেরই অংশ রূপে পরিচিত ছিল। অতি পুরাতন দিন হ'তে ভারত ও ব্রহ্মের প্রাণ যেন একই সূত্রে গাঁথা। আজও তার যথেষ্ট

প্রমাণ এদেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। ব্রহ্মদেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা, জাতীয়তা,—সবই ভারতের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পরিচায়ক। উভয় দেশের প্রাণের তারে একই সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। আজ দৈব-বিড়ম্বনায় ভারত হতে ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কে জানে, এর ভবিষ্যৎ আশার আলোকে উদ্ভাসিত অথবা নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

এই ব্রহ্মদেশের উপর দিয়ে এবার একটা মরণমুখী বিরাট যুদ্ধের অভিযান হ'য়ে গেল। তাতে এদেশবাসীদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হ'য়েছে। যুদ্ধের সময় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ব্রহ্মবাসীদের যে কোন পক্ষের যুদ্ধে সহায়তা করতে হ'য়েছে, কারণ এদের ত মিত্রপক্ষ কেউ নয়—জাপান বা ইংরাজ দুই-ই বিদেশী শক্তি, এবং উভয়েরই আক্রমণের উদ্দেশ্য একই—শোষণ ও পেষণ—সবই এক নীতি। কাজেই এ যুদ্ধে তাদের নিজেদের কোন উৎসাহ বা আগ্রহ থাকতে পারে না।—বাধ্য হ'য়েই যেটুকু ক'রতে হ'য়েছে, তা' একমাত্র প্রবলের চাপে পড়েই।

উভয়পক্ষের প্রবল যুদ্ধে যখন সিঙ্গাপুর ও মালয় ইংরাজের হাতছাড়া হোলো—তখন ব্রহ্মের বিপর্য্যয় অনিবার্য্য হ'য়ে দেখা দিল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই ব্রহ্মের নানাস্থান আক্রান্ত হ'ল। থাইল্যাণ্ড থেকে জাপানী সৈন্য দক্ষিণ ব্রহ্মের ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট পার হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রল। টেভয়, পেগু, টাঙ্গু, বেসিন, মংডো, বুথিডং—কালাডোন নদীর তীরে নানাস্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যান্ত্রিক যুদ্ধের দিনে বৈজ্ঞানিক কৌশলের অভিযানে উভয় পক্ষ কৃতিত্বের পরিচয় দিল। পাহাড়ী ব্রহ্মদেশের আড়ালের সুযোগ নিয়ে নানাস্থান দিয়ে জাপানী সৈন্য অতর্কিতে দুর্জ্জয় বীরত্বের সঙ্গে নদী, পাহাড়, জঙ্গল পার হ'য়ে—জলে, স্থলে, আকাশে দুঃসাহসীর মত রাত্রিদিন এগিয়ে এল। সত্যি সেদিন বৃটিশ সৈন্যের বিপর্য্যয় ঘনিয়েছিল। বিভিন্ন রণস্থল থেকে সৈন্যরা ফিরে এল—সরে গেল। এমনি ভাবেই দিনের পর দিন পরাজয়ের পর পরাজয় হ'তে লাগ্‌লো। এই ঘোরতর যুদ্ধে বহু সৈন্য জীবনপণ ক'রলে—মারাও গেল। পরে সত্যি সত্যি জাপানীদের প্রবল বিক্রমে সমগ্র ব্রহ্মদেশে তাদের বিজয় পতাকা উড়্‌ল।

ছত্রভঙ্গ বৃটিশ বাহিনী নানা গুপ্তপথে বহু কষ্টে ও চেষ্টায়, অনাহারে, অনিদ্রায়, ভয়ানক দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে ভারতের পথে ফিরতে লাগল।

সৈনিকদের যুদ্ধ-পরাজয়ে ফিরে আসা যে কি মর্ম্মান্তিক শোচনীয় ব্যাপার—তা' চোখের সামনে দেখেছি। উপরে জাপানী বিমানও এদের পিছু পিছু তাড়া ক'রেছে—এমনিভাবেই নিবিড় দুর্গম, পাহাড় ডিংগিয়ে সৈন্যদল পালিয়ে আসছে।

শুধু কি সৈন্যদল—লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীও ধনেপ্রাণে শেষ হ'য়ে এমনি দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়েই এদেশে পৌঁছেছিল। আশ্চর্য্য, এই পথিকদের যেমন আহার, আশ্রয়, পানীয় কিছুরই ব্যবস্থা তেমন ছিল না—তেমনি ভারতীয় সৈন্যদের জন্যও এই দুর্গম পথে তেমন কোন সুব্যবস্থা ছিল না। এমন কি কোথায় দলপতি, কোথায় তার দল, কেউ কারো সংবাদ রাখেনি। এমন বিশৃঙ্খলা বড় একটা দেখা যায় না। শুধু সবারই একমাত্র চিন্তা ও চেষ্টা নিজের প্রাণটা বাঁচানো।

ব্রহ্মযুদ্ধে বৃটিশের প্রধান সেনাপতি আলেকজাণ্ডার যেদিন মণিপুর পার হ'য়ে এলেন, পরদিনই সেখানে বোমা বর্ষিত হ'ল। শত্রুপক্ষ জাপানীরা যেন পিছু পিছু তাড়া করে আসছিল।

ব্রহ্মের সর্বত্রই সহরে সহরে জাপানী পতাকা উড়ল।

ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরাট বাহিনী তৈরী হ'ল। তারা ভারতকে মুক্ত ক'রবার জন্য জীবনপণ যুদ্ধ ক'রে মণিপুরের কাছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করল। পরাধীন ভারতের সে গৌরব-কাহিনী—সে বীরত্বের কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছেই স্মরণীয়। প্রাণ তুচ্ছ ক'রে লড়াই ক'রে স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছিল তারা। কিন্তু তাদের বিপর্য্যয় সুরু হ'ল, নানা কারণে আর এগিয়ে আসতে পারলো না।

সত্যই পরাধীন ভারতের বীর যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির জন্য যে পথের নির্দ্দেশ দিলেন,—যে স্বাধীনতার দুর্জ্জয় বাসনা নিয়ে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে

প'ড়লেন তা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে না নিশ্চয়। তিনি যে ভারতীয়দের প্রাণে নূতন প্রেরণা জাগিয়ে দিলেন তাই নয়, বিদেশে স্বাধীন ভারতের সরকার প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা ক'রে গেলেন।

এ স্বপ্ন-কাহিনী নয়—অতি সত্য—ভাবতেও প্রাণ বীরত্বের মহিমায় ভরে ওঠে।

প্রকৃতির পরিহাস—'আণবিক বোমা'য় জাপানের বিপর্য্যয়—আজ তাকে সকল রকম লাঞ্ছনা, হীনতা সহ্য করতে হ'চ্ছে। আবার সেই বৃটিশ ও আমেরিকার শাসন ও শোষণ নীতি সবার উপরই চল্‌বে সমান ভাবে, তবে স্বাধীন ব্রহ্মের রূপ দেখবার জন্য একদল দেশপ্রেমিক খুবই আগ্রহান্বিত।

ভারতের মুক্তিকামী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরদের বিচার দিল্লীর লাল কেল্লায় আরম্ভ হ'য়েছিল। তখন সেই দিনের মরণবিজয়ী বীরগণের কীর্ত্তিকলাপ কতকটা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। অবশেষে সেই বিচারের প্রহসন বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন ব্যতীত বীরগণ মুক্তও হয়েছেন। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী দ্বারা গঠিত নূতন অন্তবর্ত্তী ভারত-গভর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট বীর কয়টিকে অচিরেই মুক্তি দিবেন ব'লে আশা করা যাচ্ছে। বর্ম্মার দুর্গম অঞ্চলে এঁদের কীর্ত্তিকাহিনী ছড়িয়ে আছে। কোনোদিন সে সবের সম্পূর্ণ তথ্য উদ্ধার লাভ ক'রে জনসাধারণের গোচর হবে কি না কে জানে! পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়েই ভারতের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হ'তে চলেছিল। ব্রহ্মের মাটীতে যে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছে, সেই বীজ অচিরে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হবে সন্দেহ নেই। শীঘ্রই সেদিন আস্‌ছে যেদিন স্বাধীন ভারতের সঙ্গে স্বাধীন ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য সুপ্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে।

রেঙ্গুনের রূপ

সুন্দর দেশটীর সবই সুন্দর—বিদেশীরা জাহাজে এসে এখানে নামবার আগে বহুদূর হতে প্রথমেই রূপময় রেঙ্গুনের সোনালী প্যাগোডার উঁচু চূড়াগুলি দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। জাহাজ যতই এগিয়ে আসে, নদীর দুধারে দেখা যায় মিলের কালো কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। আরো খানিকটা এগিয়ে এলে তবে ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ রাজধানী রেঙ্গুন সহর চোখে পড়ে। নদীবক্ষে দেশ বিদেশের অনেক বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, কোনটী দূরের যাত্রী নিয়ে যাবে, কোনটীতে মাল বোঝাই হচ্ছে বা নামিয়ে দিচ্ছে। ব্যস্ত কুলীর দল মহোৎসাহে কাজ করছে। মোটর বোট, স্টীমারগুলি চারিদিকে যেন কিসের খোঁজে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আর ছোট ছোট সাম্পানগুলি জাহাজের ধারে ধারে ঘুরে তাদের যাত্রী খুঁজছে। বাণিজ্য-প্রধান এই রেঙ্গুন এক অপরূপ শহরই বটে। কয়েক মাইল মাত্র দূরেই সমুদ্র।

রেঙ্গুনে এসেই ক'দিন শুধু এ সুন্দর শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছিলাম। শহরটী খুব বড় নয়, তবে বেশ সাজান গোছান ও পরিচ্ছন্ন। কয়টী বড় বড় পরিষ্কার পথ সহরের মাঝ দিয়ে সোজা একদিক হ'তে অপর দিকে চলে গেছে। তারই মাঝ কেটে আড়াআড়ি ভাবে গলিপথগুলি, তাও সরু বা অপরিষ্কার নয়। সংখ্যা দিয়েই অনেক পথের পরিচয় হয়। কতকগুলি পথের আবার বিশেষ নামও দেওয়া আছে। শহরটির প্রতি কর্পোরেশনের যে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তা এর পরিচ্ছন্নতা এবং আলো-জলের সু-ব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

সব দিকটাই ঘুরে ফিরে দেখেছি, ছবির মত সাজান সুন্দর। পথের দু'দিকে একই রকমের বড় বড় ইঁটকাঠের বাড়ীগুলির মনোহর চেহারা পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি কে লুব্ধ করে। প্রায় সব বাড়ীরই নীচুতে দোকান, উপরে সব ভাড়াটে।

রেঙ্গুন রয়েল লেক হইতে সোয়েডাগন প্যাগোডা দেখা যাইতেছে

দুর হইতে রেঙ্গুন বন্দর দেখা যাইতেছে

পথে বাস, ট্রাম, ট্যাকসী, রিক্সা অবিরাম চলছে। কতকগুলি বাস শহরের বাইরেও যায় আসে। বাসগুলি বেশ বড়। চালক বর্ম্মী। যাত্রীরা হো হো শব্দ করলেই বাস থেমে গিয়ে যাত্রী উঠিয়ে নেয় বা নামিয়ে দেয়। রিক্সা-চালক ভারতীয় তেলেগু কুলী। কয়েক হাজার রিকসা রাত্রিদিন সহরের অলিগুলি ঘুড়ে বেড়ায়। ট্রামে বাসে লক্ষ্য করে দেখছি বর্ম্মি, চীনা, জাপানী, এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, সুরাটী, ভাটিয়া, গুজরাটী, বাঙ্গালী, পার্শি, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি এসিয়ার প্রায় সবদেশের যাত্রীই রয়েছে। কত দেশী বিদেশীর সাথে দেখা হয়—তার ঠিকঠিকানা নেই। পথেই বহু কাফী হোটেল। বিভিন্ন দেশের, ছোটবড় রেস্তোঁরা, অনেক বিখ্যাত হোটেলও রয়েছে। এ ছাড়া মূল্যবান সৌখীন বিলাস-দ্রব্যে সুসজ্জিত হোয়াইটওয়ে, রো প্রভৃতি কোম্পানীর মত সব সুন্দর ছোট বড় মাঝারী দেশী বিদেশী দোকান পথের দুধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বিলাসী পথিককে সর্ব্বদাই বিভ্রান্ত করছে। সব দোকানে প্রায় মেয়েরাই বিক্রেতা। আমোদ-প্রিয়দের জন্য সহরের মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষা ও রুচির কতকগুলি সিনেমা বেশ চলছে। পথের মোড়ে প্রহরী পুলিশ দিন রাত সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। তাদের দাঁড়াবার স্থানে মাথার উপর উঁচু একটী ছাতার মত তৈরী করা আছে; দেখতে বেশ।

বিংশ শতাব্দার ইউরোপীয় সৌখীন সভ্যতার আওতায় চিরমুক্ত বর্ম্মার সমাজ আজ এক অপরূপ মূর্ত্তিতে গড়ে উঠেছে। সঙ্কোচশূন্য সদা হাসিমাখা বর্ম্মি স্ত্রী-পুরুষদের মুখের ও পোষাকের দিকে চাইলেই তা বেশ মনে হয়!

শহরের ব্যবসা-প্রধান মোগল ষ্ট্রিটে দেশ বিদেশের লোলুপ ব্যবসায়ীগণ একেবারে যেন মৌচাকের মাছির মত গিজ গিজ করছে। এখানে এসে আমার প্রথমেই মনে হ'ল এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের মেলার প্রাঙ্গণের প্রধানতম মূলধন কিন্তু সেই বিশ্বাস ও সততা। হাজার হাজার টাকার জিনিষ কেনা বেচা হচ্ছে—কেবল মুখের একটি কথায়! আর টাকার আনাগোনা এই পথেই সমধিক হয়ে

থাকে। ভারতীয় যত বড় বড় ফার্ম্ম ও ব্যাঙ্কগুলিই এখানে এসে সব জড় হয়েছে। এদের বেচা কেনা তা সব অফিসে অফিসে কাগজ পত্রেই। মাল রয়েছে দূরের সব গুদাম-বাড়ীতে। বেলা দশটা হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত এদের কাজ কারবার চলে।

এখানকার ছোট বড় কয়টী বাজারের মধ্যে স্থূর্ত্তি বড় বাজারই বিখ্যাত। সংসারের সব কিছু জিনিষই ওখানে পাওয়া যায়। বিরাট দো'তলা ও একতলা বাড়ীগুলিতে কেবল সারি সারি দোকান। ঐ সব দোকানে শাক-সব্জী, ফল ফুল, মাছ, মাংস হতে আরম্ভ করে নিত্য প্রয়োজনীয় এবং বিলাস-প্রসাধনের যত সামগ্রী অতি সুন্দর ভাবে স্তরে স্তরে সাজান আছে। গ্রাহকের বিশেষ সুবিধা এক একটী জিনিষ নির্দ্দিষ্ট লাইনের দোকানগুলিতেই মাত্র বিক্রী হয়। বিক্রেতা প্রায়ই বর্ম্মী মেয়ে। ভারতীয়দের দোকানও কয়েকটা আছে। সব বাজারই নির্দ্ধারিত সময়ে আরম্ভ ও বন্ধ হয়। এবং প্রত্যেক দোকনীকে তার দোকানের দৈনিক ভাড়া নিত্যই দিতে হয়। উভয় পক্ষেরই সুবিধা।

ফেয়ার ও ফ্রেজার ষ্ট্রীটের মোড়ে নৈশ বাজারটী বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানে অধিক রাত পর্য্যন্ত বেচা কেনা চলে। সন্ধ্যা হতেই পথের ধারের খাবারের দোকানগুলিতে বেশ ভিড় হয়। এখানে সকল রকম চরিত্রের লোকেরই দেখা মেলে।

চীনাবাজার, বড়বাজার এবং অন্যান্য সব বাজারেই বড় বড় দোকানে বর্ম্মী মেয়েদের ব্যবসা চালাবার পারদর্শিতা দেখে অবাক হয়েছি। ছোটখাট দোকান চালাতে এদের ভাবতেই হয় না। পথে পথে দেখা যায় বর্ম্মী মেয়েরা নানা জিনিষ ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। কতক চীনা ফেরিওয়ালাও আছে। এদেশের মেয়েদের কোন পর্দ্দা নেই। তাই ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি, চাকুরী, লেখা-পড়া সবরকম কাজেই এরা স্বাধীনভাবে পুরুষদের সমকক্ষ হ'য়ে চলে। এখানে মেয়েরা যেমন কর্ম্মঠ তেমনি বুদ্ধিমতীও বটে। নিজেদের ঘরকন্না নিয়েই তারা জীবনপাত করে না।

পথে, বা বাজারে টুকরী হাতে কুলীর দল সবই ভারতীয় তেলেগু। এছাড়া জাহাজে, কলে, মিলে, সর্ব্বত্রই একাজে এরাই সুদক্ষ। কতক উড়িষ্যাবাসীও আছে।

সোলে-প্যাগোডা ও ডালহৌসী ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখা যায়, কর্ম্ম-চঞ্চল সহরের অদ্ভুত রূপ। এই সোলেপ্যাগোডা রেঙ্গুন সহরের একেবারে মাঝখানে। এর এক পাশেই কর্পোরেশনের বিখ্যাত বাড়ী, অপর পাশে রয়েছে একটী পার্ক। এদের চার দিককার প্রশস্ত রাজপথগুলিতে মোরটবাস, ট্রাম, রিক্সা, উল্কাগতিতে অবিরাম ছুটছে। উকিল, ব্যারিষ্টার ও কেরাণীর দল, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও চাপরাসী—সবাই ব্যস্তভাবে ভেসে চলেছে নিজ নিজ কর্ম্ম-স্রোতে। এদের চলার বুঝি আর শেষ নেই! অবশ্য, এই পথচারী জনস্রোতে ভারতীয়ের সংখ্যাধিক্যই বেশী মনে হয়।

সরকারী সব বড় বড় অফিসগুলির মধ্যে কর্পোরেশনের সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ীটি এবং ডালহৌসী ষ্ট্রীটের উপর সেক্রেটারীয়েটের বাড়ীটিই বেশ জাঁকালো গোছের। সেক্রেটারীয়েটের কাছেই ওয়াই. এম. সি. এ, জোড়া গির্জ্জা এবং বাঙ্গালীদের দুর্গাবাড়া। বুদ্ধাশ্রয়ী ব্যতীত এখানে ভিন্ন ধর্ম্মবলম্বীদেরও মন্দির বা প্রার্থনালয় রয়েছে। ঐ সব মন্দিরের সাথে সব জাতিরই একটী করে অতিথিশালা আছে। এবিষয়ে মুসলমানরা আর সব জাতকে অনেক বেশী ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও সব জাতেরই একটী করে আধুনিক ক্লাব বা আড্ডাখানা রয়েছে। স্কুল প্রায় সব জাতের ছেলেমেয়েদের জন্যই আছে। কিন্তু সব দেখে-শুনে আমার এই কথাটাই বার বার মনে হ'তে লাগলো, সবাই যেন যে যার জাতি ধর্ম্মের গণ্ডী টেনে অপর সবাইকে বলেছে—'তফাৎ—হুঁসিয়ার'। বর্ত্তমানে স্বাধীনতা-প্রয়াসী এবং সর্ব্বমানবতার সমন্বয় সাধকের দেশে এমনি প্রতি পদে ব্যবধানের সৃষ্টি কেমন যেন বেসুরো বলেই মনে হ'লো। এবিষয়ে যেটুকু বিশেষত্ব এবং গৌরব অর্জ্জন করেছে তা হচ্ছে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন। সেখানে সবাই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ আদর্শবাদী, তাই ওখানে খেতে, শুতে, পড়তে,

শুনতে, সেবায় ও সাহায্যে কোথাও ঐ ঠুনকো জাতধর্ম্মের কোন বাধা ব্যবধানের নাম-গন্ধও নেই। পৃথিবীর সব জাতির সব মানুষের জন্য সেখানকার দ্বার সর্ব্বক্ষণ অবারিত। সবাই সেখানে স্বাগত হ'বার দাবী করতে পারে।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় শহর থেকে একটু দূরে। তবুও দেখতে গিয়েছিলাম,—প্রশস্ত জায়গায়, বহু অর্থ-ব্যয়ে সুন্দর সব কলেজের বাড়ী-ঘর ও ছাত্রাবাস তৈরী হ'য়েছে। ছাত্রসংখ্যা কিন্তু মোটেই মানানসই নয়। ধারেই পাদ্রীদেরও কলেজ বাঙ্গালী ক'য়েক জন অধ্যাপকও আছেন দেখলুম।

শুনেছি এখানকার জেল-খানাটী খুবই জঁাকাল। এ ছাড়া সহরের বাইরে মাত্র ক' মাইল দূরেই বিখ্যাত "ইনসিন" জেল। ওখানে বহু সহস্র অপরাধী বাস করে। এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ জেলখানাগুলির ভেতর "ইনসিন" জেল অন্যতম। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের মত দেশ-গৌরবকে এক সময় স্থান দিয়ে "ইনসিন" জেল যথেষ্ঠ গৌরব অর্জ্জন করেছে। সহর থেকে তিন মাইল দূরে মিংলাডনে স্থানীয় সৈনিকাবাস। সহরের সরকারী হাসপাতালটী এখানে বেশ নামকরা। এর পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালটী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এই সাধু-সেবক এবং অবৈতনিক ডাক্তারদের সেবার দিক ধরলে বোধ হয় রামকৃষ্ণ-মিশন হাসপাতালই সবার উপরে স্থান পেতে পারে।

পশ্চিম রেঙ্গুন চীনা মহল্লায় বুদ্ধ মন্দিরটী বড়ই সুন্দর। চীনারা এখানে বিভিন্ন ব্যবসা করলেও, কাঠের কাজের জন্যই তারা জগৎ-বিখ্যাত। এদের খাবারের দোকানগুলিতে মাছ, ব্যাং, শূকর প্রভৃতি অসংখ্য জন্তু জানোয়ারের মাংস সর্ব্বদাই ঝুলতে দেখা যায়। আবার "পচনডাং" ও "কেমেনডান্" বর্ম্মী পাড়ায়, বর্ম্মী মেয়েদের জুতা, ছাতা ও চুরুট তৈরীর বহু ছোটখাট কারখানাও চোখে পড়েছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ঐ সব ব্যবসা বাণিজ্যের বালাই নাই। তাদের আছে কেরাণীর ঘানি, আর বাদ-বাকী জীবনের অবসরেএকটানা সেই 'ইট-ড্রিঙ্ক-এ্যাণ্ড-বি মেরী'র স্রোত। বর্ম্মীরাও কিন্তু খুবই আমোদ-প্রিয় স্ফূর্ত্তি-বাজ। আগেই বলেছি জ্যোৎস্না-রাত দেখলেই পথের ধারে এদের "পোয়ে" নাচে

আসর জমবে। সারারাত ছেলে, বুড়ো, মেয়ে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে তা দেখবে। তাই ব'লে এরা কিন্তু কখনোও অলস বা নিজেদের কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকে না।

শহরে বেড়াবার তেমন ফাঁকা জায়গা নেই। উত্তর সীমায় কালা-বস্তীর ধারে এখানকার বিখ্যাত মনোরম "রয়েল লেক"। তার স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসের স্নেহ-স্পর্শেও একাধিক সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে এসেছি। আর সেই সঙ্গে শুনে এসেছি সেখানকার ইউরোপীয় বোট ক্লাবের মন-মাতান বাজনা। অবশ্য আমার মত পথের পথিকই যে একমাত্র এই সুন্দর পরিবেশনের দ্রষ্টা ও ভোক্তা, তা বলতে পারি না। শহরের সকল জাতের শত সহস্র নরনারী এই মনোহর লেকের রূপতীর্থে নিত্য নিয়মিত যাত্রী। এখান হ'তে একটু দূরেই চিড়িয়াখানা। ওতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। ঐদিক দিয়ে আরো খানিকটা সহরের দিকে এগিয়ে যেতেই, অদূরে এখানকার বিখ্যাত খেলার মাঠ। তারপরই সামনের দিক গিয়ে সহরের প্রধান রেলষ্টশন। ষ্টেশনের উপর দিয়ে বড় পুলটা পার হয়েই শহরের মাঝখানে আসা যায়।

স্বাধীন দেশের কথা জানি না, কিন্তু পরাধীন দেশে কুলীদের অবস্থা সর্ব্বত্র একই রকম দুর্দ্দশাগ্রস্ত,—আলো-বাতাসহীন সংকীর্ণ বাড়ীগুলিতে গাদা গাদা লোকের বাস। এখানেও ঠিক তাই দেখলুম। পথের ধারে ধারে এদের জন্যই সেই সনাতন তাড়িখানা সব খোলা রয়েছে। সারাদিন পরিশ্রমের পয়সা এখানেই উপহার দিয়ে মহানন্দে এই কুলীর দল ভিড় করে তাড়ি খায়। এদের যেন রূপান্তর ঘটবার আর কোন উপায় নেই। এ সব হ'ল ভারতীয় কুলীদের মরণের রঙ্গমঞ্চ। এছাড়া বর্ম্মীদের জন্য সাজান রয়েছে—আরও ভয়াবহ সহজ অধোগতির ব্যবস্থা,—সে হচ্ছে ওদের পনসপ বা বন্ধকী দোকানগুলি, ওখানেই বর্ম্মীরা সামান্যমাত্র অসুবিধাতেই মূল্যবান জিনিষ পত্র বাঁধা রেখে বা বিক্রয় করে দিনে দিনে ফতুর হচ্ছে—চতুর চীনাদের হাতে। চোরাই জিনিষও ঐ সব দোকানেই অতি সহজে বন্ধক বা বিক্রয় হয়। পথে পথেই এই ফাঁদ-পাতা দোকানগুলি দেখে খুবই নিরাশ হয়েছি।

শহরের চারিদিকেই রয়েছে বহু বৌদ্ধ-বিহার বা ফুঙ্গীচঙ, অনেক ভিক্ষু ভিক্ষুণী সেখানে থাকেন। তার কাছে কাছেই রয়েছে যত সব রমণীয় প্রসিদ্ধ প্যাগোডা: যার গরিমায় সমস্ত ব্রহ্মদেশ আজও এত সুন্দর ও জগতে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। পশ্চিম রেঙ্গুনের "বাহান" অঞ্চলে একটি বিহারেই প্রায় দেড় শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। নিতাই শহরের পথে পথে ভিক্ষা-পাত্র হস্তে দলে দলে এই সব ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের ভিড় দেখা যায়। প্যাগোডাগুলি কিন্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণীদেরই এক চেটিয়া নয়। ওখানে রোজ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে পুরুষ সেজে-গুজে অবসর সময়ে দলে দলে প্রাণের পরম শ্রদ্ধায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে যায়।

প্রত্যেক বিহারেই গ্রামের অনাথ বালকগণ প্রতিপালিত হয় এবং ভিক্ষুগণ পাড়ার ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা দান করেন। এ সুন্দর ব্যবস্থাটী বর্ম্মার সর্ব্বত্র। এখানে বর্ম্মার ভিক্ষু ও গৃহীদের অপূর্ব্ব সুন্দর সম্পর্ক সম্বন্ধে একটী কথা সংক্ষেপে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে হচ্ছে একেবারে খাঁটী ভারতীয় বৈদান্তিক নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধির জীবন্ত উদাহরণ। ভিক্ষুগণ ভিক্ষা সংগ্রহের সময় ব্যতিগত সবাই "ফুঙ্গী চঙ্ঙেই" থাকেন, কেবল মাত্র তাঁদের সাধন ভজন নিয়ে। ব্যক্তিগত বা আশ্রম সম্পর্কিত কোন কাজেই মন দেবার প্রথা "ফুঙ্গীদের" একেবারেই নেই। এসব কাজ কর্ম্ম ও নিত্য প্রয়োজন সমস্ত স্থানীয় পল্লী-প্রধানদের উপর। ভিক্ষু বা ফুঙ্গীদের এ সব কোন বিষয়েই চিন্তা মাত্র করতে হয় না। এটা অদ্ভুত নয় কি?

আমাদের ভারতীয় সাধুদের বৈদান্তিক ভাব প্রচার সত্ত্বেও প্রত্যেক আশ্রম বা মঠাধ্যক্ষের নানা বৈষয়িক ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চিন্তা কত সময়ই না অপব্যয়িত হয়। আর সর্ব্বজন-বিদিত ভারতে নিন্দিত অবৈদিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেশে বিনা বেদান্ত প্রচারেও সাধুর সাধনার জীবন কি সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট অনাবিল।

সোয়েডাগন প্যাগোডা।

রেঙ্গুনে এসে অবধি নিতাই শুনছি এখানকার বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য-গৌরবের কথা। শীঘ্রই ঐ বৌদ্ধ মন্দিরটী দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবার খুবই আগ্রহ হ'ল। তাই একজন বন্ধুর সঙ্গে একদিন বৈকালে মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। সহরের পথে ঘুরে ফিরে এসে চায়না ষ্ট্রীটের মোড়ে একখানা ট্রামে উঠে পড়লুম। এখান থেকে দু'পয়সার টিকেট কিনলেই ট্রাম দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই সোজা উত্তরদিকে মন্দিরের প্রধান দুয়ারে পৌঁছে দেয়। ট্রামে উড়িষ্যাবাসী টিকেট বিক্রেতার কাছ থেকে টিকেট কিনলুম। এ গাড়ীর প্রায় যাত্রীই মন্দির দেখতে চলেছে। ট্রামখানা বাজারের সামনে দিয়ে, সহরের মাঝ দিয়ে ছুটে চলল। দূর হ'তেই সুবিশাল মন্দিরের সোনালী উঁচু চূড়াটী দেখতে পেয়ে দয়াল দেবতা বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ করে মন প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। বর্ম্মী যাত্রীরা মন্দিরটী দেখতে পেয়ে ধুমায়িত চুরুটগুলি মুখ থেকে নামিয়ে শ্রদ্ধায় ও আনন্দে তাদের ভাষায় কি যেন বলে উঠলো। আবার মুহূর্ত্ত পরেই আরামে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গল্প করে চ'লল। একটু বাদেই ট্রামখানা মন্দিরের দক্ষিণদিকে প্রধান তোরণ দ্বারে এসে আমাদের নামিয়ে দিল।

রেঙ্গুন সহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে—"থিনথরা" (Theingthra Hill) পাহাড়ের উপর এই মন্দির স্থাপিত। পাহাড়টী কম বেশী পাঁচ শ' ফিট উঁচু হবে। সাধারণতঃ পাহাড়ের উপর মন্দির তেমন উঁচু হয় না,—নীচুই করা হয়। কিন্তু এই মন্দিরের উচ্চতা দু'শ একাশী ফিট এবং পরিসর এক হাজার তিন শ পঞ্চাশ ফিট, দেখে অবাকই হলুম। এখানকার প্রচলিত প্রবাদ, ভগবান বুদ্ধের দুই শিষ্য "পু" ও "টাপ্" দু'টী ভাই ভারতবর্ষ হ'তে ভগবান তথাগতের পবিত্র স্মৃতি স্বরূপ তাঁর

চারগাছি কেশ স্বর্ণ কৌটায় সযত্নে বহন করে নিয়ে এসে ঐ পাহাড়ে পুঁতে তারই উপরে বহু অর্থব্যয়ে এই বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাই মন্দিরটী বৌদ্ধ জগতে অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মদেশে এরূপ বিরাট ও বিখ্যাত মন্দির আর দ্বিতীয় নেই।

বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রৌদ্রের তাপও অনেকটা কমেছে। সামনেই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উভয় পার্শ্বে দু'টী সিংহের মত "ড্রাগন", তারাই যেন মন্দিরের চির জাগ্রত রক্ষক। তোরণটী বেশ কারুকার্য্যময়; নিম্নে মর্ম্মর পাথরে বাঁধান সিঁড়ি।

এবার আমরা এগিয়ে গিয়ে জুতো ছেড়ে মন্দির-তোরণে প্রবেশ করলুম। শুধু পায়েই মন্দিরে যাবার নিয়ম। তবে জুতা হাতে ক'রে সর্ব্বত্রই যাওয়া যেতে পারে। এ প্রথা আমাদের কাছে আশ্চর্য্যজনকই বটে। বিশাল মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উপরের দিকে এগুতে লাগলুম, সিড়ির ধাপগুলি বেশ চওড়া ও লম্বা; দু'ধারে দেওয়াল। সিঁড়ির উপর দিয়ে ইঁটের তৈরী মোটা মোটা থামের সারি, ঐ থামগুলির মাথায়ই ছাদ। এসব থামের সারি ও ছাদ ঢালু ভাবেই ক্রমে উপরে উঠে গেছে। ছাদের উপরে চাইলে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে, ক্রমোর্দ্ধগতি ছাদের উপর সারি সারি মন্দিরের চূড়া সাজান রয়েছে। আবার ঐ ছাদের ভিতরের দিকে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বলিত সুচারু চিত্র, অথবা সুদক্ষ বর্ম্মী দারু-শিল্পীদের তৈরী অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তিসমূহ সাজান রয়েছে। যাত্রীদল এ সব দেখতে দেখতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা ও চলবার পথে এই সব চিত্র কলা এবং কাঠের উপর উৎকীর্ণ বুদ্ধ-জীবনের সুন্দর ঘটনাবলী অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গেই দেখতে লাগলুম।

উঠবার পথ মাঝে মাঝে ঢালু ভাবে বাঁধান, সেখানটায় সিঁড়ি নেই। খানিকটা পর আবার সিঁড়ি—আবার ঢালু, এ ভাবেই তৈরী। তবে পথটী এত বড় প্রশস্ত যে, একসঙ্গে হাজার হাজার লোকেরও যেতে আসতে কোন অসুবিধা হয় না। মন্দিরের প্রবেশ-পথের গোড়া হতে যে থামের সারি রয়েছে,, ওতেই যেন

মানুষ চলাচলের পথটীকে কয়টী ভাগে ভাগ করে দিয়ে, একটা স্থায়ী সুব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ থামগুলিই যেন মন্দির-দ্বারে নীরব দ্বারী এবং নীরব গাইডের কাজ করছে।

সিঁড়ির দু-দিকেই দেয়ালের গা ঘেঁষে বর্ম্মী রমণীদের ফুল, বাতি, ও ধূপের দোকান। ঐ সব দোকানে অজস্র টাট্‌কা ফুলের স্তবক সাজান। কোন দোকানে বিক্রীর জন্য তথাগতের প্রস্তর মূর্ত্তি, ছবি ও নানারকমের খেলনা র'য়েছে। দোকানওয়ালীরা তাদের চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে সেজে গুজে, মুখে পাউডার মেখে, সুদীর্ঘ ঘন কালো কেশগুচ্ছকে কুণ্ডলাকৃতি বেণী পাকিয়ে মাথার উপর জড়িয়ে, তাতে আবার ফুল গুঁজে দিয়ে—শোভা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। যাত্রী দেখলেই দু'ধারের দোকান হ'তে, তরুণীগণ বর্ম্মা ভাষা অথবা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে তাদের কাছ থেকে দেবতাকে অর্ঘ্য দানের ফুলবাতি কেনবার জন্য সাদরে আহ্বান করতে থাকে। কতক যাত্রীকে দেখলুম দর করে সব কিনছে। আমরাও দেবতার জন্য কিছু ফুল, বাতি, ধুপ কিনে নিলুম।

শত শত বর্ম্মী মেয়ে পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, ফুল বাতি ধূপ নিয়ে দেব-দর্শনে চলেছে। স্বভাবতঃই এদের চেহারা বেশ সুশ্রী। মন্দিরে আবো সেজে গুজে এসেছে। মেয়েরা বিচিত্র রংয়ের সিল্কের লুঙ্গী পরে, গায়ে পাতলা গেঞ্জি। ফুরফুরে সিল্কের চাদর খানা গলায় জড়ান, মুখে পাউডার মাখা, দীর্ঘ কুন্তল-রাশি সযত্নে বিন্যস্ত করা, হাতে দু'চার গাছা সোনার চুড়ী, পায়ে সোনার মল এবং কানে হীরের ফুল। পুরুষদের পরিধানে মূল্যবান লুঙ্গী, মাথায় সিল্কের চাদর জড়ান, গায়ে সুন্দর সিল্কের সুদৃশ্য জামা। হাতে হাত-ঘড়ি এবং রুমালে এসেন্স। সবাই পাদুকা বাইরে রেখে এসেছে। এদের পোষাক পরিচ্ছদে গরীব ধনী পৃথক করবার উপায় নেই।

দেবতার মন্দিরে যেন সকলেই সমান ভাবে পরিপূর্ণ মনপ্রাণ নিয়ে এসেছে, এখানে কোন অভাব অভিযোগের তাড়না নেই। কয়েকজন সৌম্য শান্ত ভিক্ষু ভিক্ষুণীকেও দেখলুম, মন্দির দর্শনে চলেছেন। মাঝে মাঝে জলছত্র,

অন্নছত্র ও বর্ম্মা খাবারের দোকানগুলিতেও যাত্রীদলের ভিড়। দু-একটি গরীব, পথিকদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, তবে এরা কালিঘাটের অত্যাচারী ভিখারী দলের মত নয়। এ সব দেখতে দেখতেই উপরে উঠছি। সঙ্গে বন্ধুটি আমায় ডানদিকে একটি ঘর দেখিয়ে বল্লেন, এটি মন্দিরের "ডায়নামো" ঘর। এখান হ'তেই মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা হয়। এ ব্যবস্থাটি বেশ ভালই লাগল। শুনলাম এদেশের প্রায় মন্দিরেই নিজেদের এরূপ আলোর ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের ওঠার সিঁড়ি এখনও শেষ হল না। আমরা যে ধীরে ধীরে উঁচু পাহাড়েই উঠে যাচ্ছি, সেটা এতক্ষণে বেশ মনে হ'ল। তবে, পথের দু'ধারে সুসজ্জিত সুন্দর দৃশ্যাবিথী দেখতে দেখতে মুগ্ধ চিত্তে এগিয়ে যাচ্ছি বলেই কষ্টটা তেমন গায়ে লাগছে না। এভাবে অনেকগুলি সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে একদল দর্শনার্থীর সাথে মন্দির-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েই, আমরা আবার বিস্ময়ে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইলুম। ঊর্দ্ধে ঐ আকাশচুম্বী স্তূপ-মন্দিরের চূড়া,—মন্দির-শীর্ষে অজস্র ধনরত্ন ব্যয়ে রাজা "মিনডনের" দেওয়া স্বর্ণছত্রটি শোভা পাচ্ছে। কোন সে অতীত যুগ হ'তে তার দোলায়-মান ঘণ্টাগুলি সুমধুর টুং টাং রবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোকে ভগবান তথাগতের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করছে। দূর হ'তে পথিক ও যাত্রীগণ ঐ মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে দেবতার কথা স্মরণ ক'রে ভক্তিনত প্রাণে প্রণতি জানায়। আমরাও আমাদের প্রণাম নিবেদন করলুম।

এই বিরাট চৈত্য "সোয়েডাগন." এর পাদদেশে চারদিক মণ্ডলাকারে বেষ্টন ক'রে দু'সারি মুখোমুখি মন্দির। এ সব কারুকার্য্যময় মন্দিরে রয়েছে— বোধিসত্ত্বের নানা ভাবের অতি মনোরম পাথর, পিতল, তামা বা ইঁটের মূর্ত্তি। এই দু'সারি মন্দিরের মাঝ দিয়েই আসল স্তূপ-মন্দির প্রদক্ষিণ করবার প্রশস্ত পথটি ঘুরে গেছে। এই পথের সমান দূরত্বে চারদিকেই প্রধান মন্দিরের গা ঘেঁষে প্রশস্ত সুন্দর মন্দির চার'টাই ভক্তদের প্রার্থনালয়।
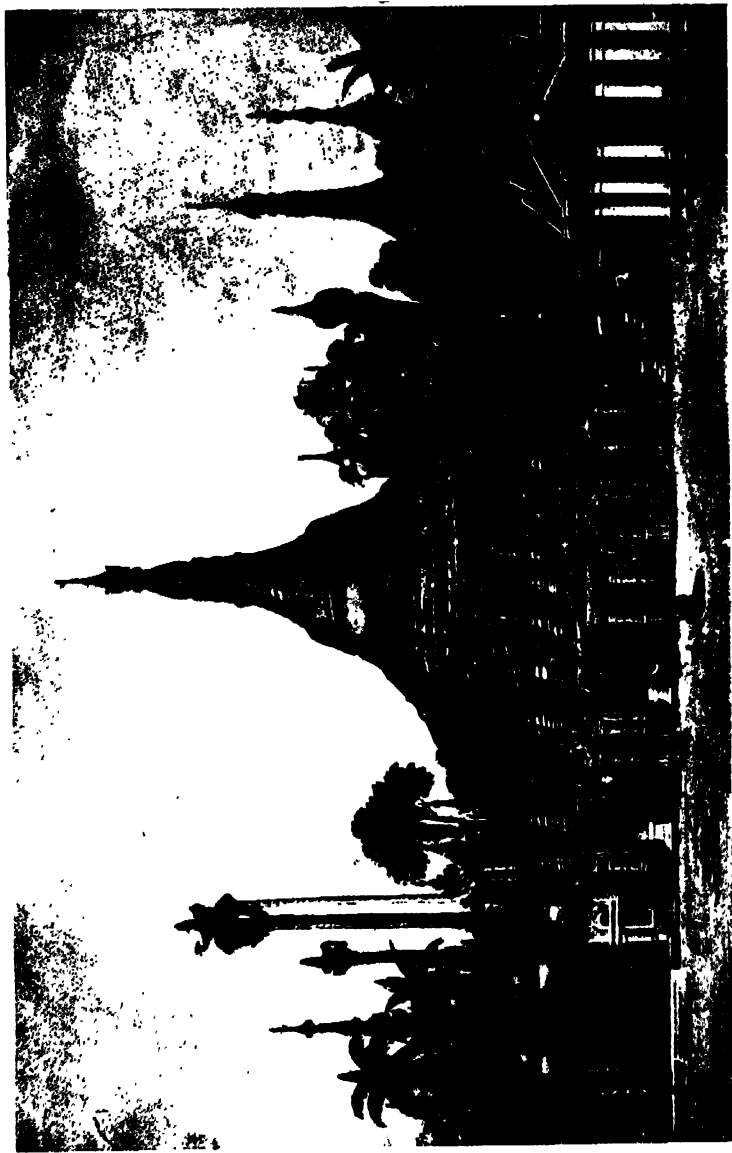
ব্রহ্মের সুবিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডা

বাহির হ'তে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রতে চারদিককার চারটি পথও এসে প্রার্থনালয়ের গোড়ায় থেমে গেছে। তাই ভক্তগণ যে কোন পথে এলেই প্রথমে এই প্রার্থনালয়ের সামনে উপস্থিত হয়।

এদের কোন আনুষ্ঠানিক পূজার বিধি নেই। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এদের মন্দিরে গিয়ে দর্শন—প্রার্থনা করতে পারেন। ভারতীয় তীর্থ-মন্দিরের মত কোন পাণ্ডা বা পুরোহিতের উপদ্রব এদের তীর্থে বা মন্দিরে নেই। এই মহান উদার ভাবের জন্যই বোধ হয় এক সময় জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত প্রসার হয়েছিল। আর যখনই এ কথাটী মনে হয়, তখন যেন হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, দীনতা ও মলিনতা দূর হয়ে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে উঠবার জন্য যে ক্লান্তি বা অবসাদ—কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই সব দূর হয়ে গেল। আমরা খানিকক্ষণ মুগ্ধচিত্তে চারদিকটা দেখে নিলুম। এবার সামনের প্রার্থনালয়ে উপস্থিত হয়েহ দেখলুম, ঠিক মাঝখানে, একটু ভিতরে প্রধান দেবতা স্বর্ণময় ভগবান বুদ্ধদেব স্বস্তিকাসনে শান্তভাবে সমাসীন। তার সামনেই দু'ধারে সারি সারি ভগবান বুদ্ধের আরো সব ধ্যানস্থ ছোট বড় অনেকগুলি মূর্ত্তি। সকল দেবতার সামনেই রয়েছে কাঠের তাকে অসংখ্য ফুলদানীতে নানা রকমের ফুলের তোড়া এবং অপর দিকে সরু তারের উপর জ্বলেছ শত শত মোমবাতি—তাতেই মন্দিরকে সর্ব্বদা আলোকিত ক'রে রেখেছে। দু'পাশের দু'টী পাত্র হ'তে ধূমায়িত ধূপ-শলাকার পবিত্র সৌরভে মন্দির-তল আমোদিত ক'রে ভক্তপ্রাণে তৃপ্তি দিচ্ছে। বর্ম্মী মেয়ে, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ দলে দলে ধূপ দীপ জ্বেলে দেবতার সামনে নতজানু হয়ে তিনবার "সিকো" বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে, সুন্দর গালিচা পাতা আসনে বসে পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে করজোড়ে সরবে অথবা নীরবে দেবতার নিকট প্রার্থনাদ্বারা মনের আকুতি জানাচ্ছে। আমরাও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভক্তিনত চিত্তে বুদ্ধ-ভগবানের চরণ-প্রান্তে প্রণত হলুম, এবং ফুলদানীতে ফুলগুলি সাজিয়ে যথাস্থানে ধূপ ও বাতি জ্বেলে দিয়ে, অনিমেষে প্রাণভরে দেবতাকে দেখতে লাগলুম।

দলে দলে মেয়ে পুরুষ মন্দিরের চারদিককার শ্বেত পাথরে বাঁধান পথে মন্দির প্রদক্ষিণ করে আসছে। ঐ প্রশস্ত পথে হাজার হাজার যাত্রী অনায়াসে এক সঙ্গে যাতায়াত করতে পারে।

এবার আমরাও প্রার্থনালয় হ'তে বেরিয়ে, সেই পথেই ধীরে ধীরে এগিয়ে পশ্চিম দিকে চললুম। পথের মাঝখানটা পাপোষ দিয়ে ঢেকে যাত্রীদের চলার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে রোদের তাপে কষ্ট হয় না এবং বর্ষাতেও পা পিছলে যায় না।

এই বিরাট আঙ্গিনার সব দিকটাই ইঁট ও পাথরে বাঁধান। চারদিকে সব কিছুই যেমন সুরুচিসঙ্গতভাবে সাজান—তেমনি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যতই এগিয়ে যাই—ততই যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। যে দিকে চাই সর্ব্বত্রই মন্দির আর বুদ্ধ-মূর্ত্তি, এ যেন দেব-লোক। আমরা চীনা প্রার্থনালয়টীর সামনে দিয়ে পশ্চিমদিকে কতকটা এগিয়ে যেতেই অদূরে একটী মন্দিরে বুদ্ধ ভগবানের আট দশটী বিশালকায় মূর্ত্তি একই ভাবে পাশাপাশি বসান আছে দেখলুম। আরো এগিয়ে যেতে অপর একটি মন্দিরের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে শাক্যমুনি পঞ্চশিষ্য-পরিবৃত হয়ে শালবনে শিষ্যদের যে ভাবে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন, এ সেই শয়ান মূর্ত্তি। এ এক অপরূপ সুন্দর মহান দৃশ্য।

এখানকার ছোট বড় সব মন্দিরগুলিই কারুকার্য্য-মণ্ডিত। সুদক্ষ বর্ম্মী কারু-শিল্পীদের জগৎ-প্রখ্যাত সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয়-এসব মন্দিরে রয়েছে। দেয়ালের গায় চিত্র-শিল্পীর তুলির ফলকে শাক্যমুনির জীবনের ঘটনাবলী অতি সুন্দরভাবে পর পর ফুটিয়ে তুলেছে। এসব সৌন্দর্য্যের তুলনা বোধ হয় আজকার জগতে নিতান্ত বিরল। দর্শকগণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে দেখেও যেন দেখার সাধ মিটাতে পারে না। মন্দির ও মূর্ত্তি দেখতে দেখতে আমরাও কতকটা অতৃপ্ত অন্তরে পশ্চিম দিকের প্রধান প্রার্থনালয়ে উপস্থিত হয়ে যুক্তকরে দেবতার চরণে প্রণত হ'লুম। এখানেও দেব-বিগ্রহের সামনে শত শত পুষ্পাধারে

প্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া, দীপমালার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো, ধূপের সৌরভ এবং প্রার্থনারত ভক্তগণ। এ মন্দিরটীর কারুকার্য্যের একটু বিশেষত্ব আছে। ছাদের গায় ও পিলারে ফুল লতাপাতার খুবই চাকচিক্যময় সুন্দর শোভা; দুয়ারের উপর উৎকৃষ্ট কারুশিল্পে বুদ্ধ-জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় র'য়েছে।

এখান হ'তে বাইরে উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে বাঁ দিকে একটী ছোট মন্দিরের সামনে শ্বেত পাথরের দু'টী হাতী শুঁড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বেত হস্তী বুদ্ধ-জন্মের পবিত্র ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাই—হিন্দুদের শিবের ষাঁড়ের চেয়েও বুদ্ধাশ্রয়ীরা একে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে থাকে।

সামনে এগিয়ে চলেছি, দু'ধারেই মন্দির। একটি মন্দিরে দেখলুম দুগ্ধ-ধবল পাথরের তৈরী পাঁচটী বুদ্ধমূর্ত্তি পাশাপাশি যোগাসনে ধ্যানমগ্ন, বড়ই সুন্দর। এই মন্দির-গাত্রেও বর্ম্মা চিত্রশিল্পী বুদ্ধ জীবনকে অতি সুন্দর ভাবে সুদক্ষ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছে। তার কয়টী চিত্র বড়ই চিত্তাকর্ষক। রাজাসনে শাক্যসিংহ, বৈরগ্যাবলম্বন করে ছন্দকের সামনে রাজবেশ ত্যাগ, কেশগুচ্ছ কর্ত্তন, বোধি তরুতলে নানা বিঘ্নের ভিতর গভীর তপস্যা, এবং ভিক্ষুবেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়ে সবাইকে শান্তি ও সত্যের অভয়বাণী দান এই সব ছবি দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ ক'রে থাকে। আমরাও অবাক বিস্ময়ে বহুক্ষণ ধ'রে চেয়ে দেখলুম। যে দিকেই চেয়ে দেখছি আরো যেন দেখতে ইচ্ছা হয়।

এবার বন্ধুটী আমায় বললেন 'সন্ধ্যা হ'য়ে এলো যে'—উত্তর দিলুম 'তাতে আর কি হয়েছে?' দেবতাকে প্রণাম করে প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে আরো কয়টী মন্দির দেখতে এগিয়ে গেলুম। এখানকার মন্দিরগুলিতে তথাগতের ধ্যানস্থ, শায়িত নানা ভাবের সাদা পাথরের তৈরী অনেক শোভাময় সুন্দর মূর্ত্তি রয়েছে। কোনটী বা ইঁটেরও তৈরী। এ সব দেবতার শীর্ষদেশ অত্যুজ্জ্বল মূল্যবান পাথর ও মুক্তাখচিত। সামনের বড় মন্দিরে এক বিরাট ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ স্বস্তিকাসনে সমাসীন। এমন সুন্দর ধ্যানগম্ভীর শান্ত উদার দেবতার সামনে সত্যই আপনাকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। এ মূর্ত্তির গঠন বড়ই সুন্দর

অনেকক্ষণ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। দেবতার মস্তক হ'তে সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল মুক্তা ও পাথরের শান্ত জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ মন্দিরের সামনের দিকটা ব্রহ্মের সুচারু দারুশিল্পের অনুকরণে টিন কেটে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ক'রে সুসজ্জিত করা হয়েছে। মাঝের প্রশস্ত হলটিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণ সময়ে সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে থাকেন। শত শত আগ্রহাকুল শ্রোতাও আসেন। অন্য সময় এইটিই যাত্রীদের বিশ্রাম-ভবন।

এর নিকটেই অপর মন্দিরে বিরাট একটা দোলায়মান ঘণ্টা দেখিয়ে বন্ধু আমায় বললেন, এ দেশে প্রবাদ যে, এই ঘণ্টা যে বিদেশী লোক বাজাবে তাকে আবার এদেশে আসতে হবে। ঘণ্টার সামনে একটি হরিণের শিং পড়ে ছিল, তাই দিয়ে কয়েকবার ঘণ্টা বাজিয়ে বাইরে এসে বহু মন্দির ও যাত্রীর ভিতর দিয়ে পূবদিকে এগিয়ে চললুম।

এবার প্রধান পথটা ছেড়ে বাঁ দিকে অনেকগুলি মন্দির ও মূর্ত্তি দেখতে গেলুম। সামনেই বৃক্ষমূলে কৃত্রিম পাহাড়ের উপর একটা ছোট স্তূপ-মন্দির। বন্ধুর নিকট শুনলুম ব্রহ্মের "চাইটো" নামক স্থানে বিরাট পাহাড়ের উপর এক খণ্ড পাথরে এক আশ্চর্য্য বিখ্যাত স্তূপ-মন্দির আছে। তাকে "চাইটো ফায়া" বলা হয়। একে বিস্ময়কর বলবার কারণ, এর ভিত্তি স্বরূপ এক বিরাট পাহাড়ে সব জায়গা ছেড়ে দিয়ে, পাহাড়ের একধারে একটা মাত্র বড় পাথরের উপর ঐ মন্দিরটা রচিত হয়েছে এমনি কৌশলে যে দেখলে মনে হয় মন্দিরটা যেন পাহাড়ের ঐ কোনটাতে একটু ছুঁয়ে রয়েছে মাত্র। তারপর আবার কতকগুলি মন্দিরের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি, প্রতি পাদক্ষেপেই শুধু দেবালয় আর দেবতা। সব মন্দিরই শিল্পীদের শিল্পচাতুর্য্যের অপূর্ব্ব গরিমায় মণ্ডিত। যতই দেখছি ততই বিস্ময়ে মুগ্ধ হচ্ছি।

এবার উত্তর দিকে প্রবেশ-দ্বারের নিকটে একটা মন্দিরে গিয়ে দেখলুম রাজপরিচ্ছদে শাক্যসিংহ, পাশেই আবার পরিব্রাজক বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্ত্তি দু'টা দেখে প্রাণ যেন কেমন একটা উদাস সুরে

করুণ হ'য়ে উঠ্‌লো। এ মন্দিরের মাঝখানে জল-পূর্ণ মকর-মুখে শ্রীবুদ্ধের চরনচিহ্ন। ভক্তগণ দলে দলে ঐ পবিত্র জল স্পর্শ করে ধন্য হচ্ছে, আমরাও হলুম। এ ছাড়া এখানে আরো অনেক ভাবের বুদ্ধমূর্ত্তি রয়েছে।

এবার বাইরে এসে পূর্বদিকে এগিয়ে যেতেই বাঁদিকে মন্দিরের উত্তর সীমার উঁচু দেয়াল। তার ওপর বসে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলুম, শুধু নীরব অরণ্যানীর স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। নিকটের পল্লী যেন কোথায় লুকিয়ে আছে। ওখান হতে নেমে পূবদিকে এগিয়ে দেখলুম দক্ষিণ দিকে দু'টী বিহারে ক'জন ভিক্ষু ভক্তদের সাথে আলাপে ব্যস্ত। আরো সামনে কয়টী সুন্দর দেবালয়ের ধার দিয়ে এগিয়ে চল্লুম। সব মন্দিরেই বুদ্ধ ভগবান বিরাজিত। ছোট কয়টী ঘরে বৌদ্ধ জ্যোতিষীগণ বর্ম্মীদের ভাগ্য গণনায় ব্যস্ত। আমরা আঁকা বাঁকা পথে প্রধান চৈত্যের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী মন্দিরে সারি সারি একশত একটী বুদ্ধ মূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হলুম। কাছেই বড় বড় কয়টী পাথরে ত্রিপিটকের বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে। এখানেও নিকটেই একটী বিরাট ঘণ্টা আছে, এর সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই প্রবাদ প্রচলিত।

বাইরে খোলা জায়গায় এসে দেখলুম—সোনার তৈরী একটী তাল গাছ, এর অল্প দূরই রয়েছে একটী কাঠের তৈরী সিঁড়ি। কয়টী পুতুলের সাহায্যে এই গাছ ও সিঁড়ির বিশেষত্ব বুঝান হয়েছে। সংসারের বিষয়-মুগ্ধ মানুষ যেন দু'টী পুতুলের রূপে ঐ সোনার তালগাছ লোভাতুর ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আর অন্য পুতুল যেন সব লোভ বাসনা ত্যাগ ক'রে নির্ব্বাণের পথে পৌছাবার সিঁড়িতে যেতে সব লোভীদের দু'হাত তুলে ডাকছে। ভোগ ও ত্যাগের বিশেষ শিক্ষা বৌদ্ধ জনসাধারণকে দেবার এই অদ্ভুত বহু মূল্যবান কৌশল দেখে বড়ই বিস্ময় এবং আনন্দবোধ হ'ল। এখানে নরনারীর ভীড় সর্ব্বক্ষণ লেগেই রয়েছে।

এবার গিয়ে পূবদিকের প্রার্থনা মন্দিরে হাজির হ'লুম। এখানেও ভক্তগণ দেবতার সামনে ধূপ দীপ জেলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নতজানু হয়ে প্রাণের

প্রার্থনা নিবেদন করছে। শত শত দীপমালার স্নিগ্ধ আলো, অসংখ্য পুষ্প স্তবকের সুমিষ্ট সৌরভ, তার সাথে ধূমায়িত ধূপের পবিত্র গন্ধ মিশে গিয়ে মন্দিরতল এক স্বর্গীয়ভাবে যেন ভরে গেছে। দর্শক, ভক্ত সবার প্রাণে অপরিসীম তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। আমরাও দেবতাকে প্রণাম ক'রে বাইরে এলুম। বিরাট প্রাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে ব'সে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ মালা জপ অথবা স্তুতি পাঠে মগ্ন। আবার কোথাও বর্ম্মী রমণীগণ মন্দিরের গোড়ায় শত শত দীপ জ্বেলে একান্তে ব'সে দেবতার শুভাশীষ কামনা করছে।

ঘুরে দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাচ্ছি, খানিকটা এগুতেই বাঁ দিকে সোনালী রংয়ের অপূর্ব্ব সুন্দর দেবালয়গুলি তাদের রূপের ছটায় দর্শক মাত্রেরই চোখ যেন ঝলসে দেয়। প্রত্যেক দেবালয়েই স্থাপিত বুদ্ধমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম করলুম। আঙ্গিনায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গিয়ে দেখলুম, ভারত হ'তে আনাত কত কাল আগের বোধি বৃক্ষের একটী শাখা আজ এখানে সুপরিণত বৃক্ষরূপে দাঁড়িয়ে আছে। তার চারদিকে বাঁধান বেদীমূলে ভক্তগণ দীপ জ্বেলে ফুল সাজিয়ে ভক্তি-ভাবে বৃক্ষপূজার সাথে দেবতাকেও স্মরণ করছে। অদূরে এই মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকের শেষ সীমায় উঁচু দেয়ালটির কাছে দাঁড়িয়ে সহরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম, শুধু জোড়া গির্জ্জার উঁচু চূড়াদু'টী এবং দূরে নদীবক্ষে জাহাজের চিমনীগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

মন্দির-প্রাঙ্গনের চারদিকে একটী পরিখার মত রয়েছে, তার একটু উপরেই অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার, তাতে বহু ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা থাকেন। এবং উপরেই হ'ল মন্দিরের চারদিককার উঁচু দেওয়াল, যার কাছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, সূর্য্য ডুবে যাবার আর বেশী দেরি নেই। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম-রশ্মি মন্দির-চূড়ায় প্রতিফলিত হচ্ছে। তার অপূর্ব্ব শোভা দেখে মনে হ'ল যেন তপ্ত স্বর্ণের গলিত ধারা মন্দির-শীর্ষ হ'তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরের সেই শোভা যে দেখেছে, তার মরমে গিয়ে তার পরশ লেগেছে। তা যেন আর ভুলবার নয়।

ধীরে ধীরে ওখান হ'তে নেমে আপন ভাবে চলেছি। মনে হল যেন স্বপ্ন-রাজ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সাম্‌নেই চোখে পড়্‌ল মন্দিরের ট্রাষ্টিদের অফিস ঘর, তার পরেই বুদ্ধ-মন্দির, তাতে রয়েছে তথাগতের অন্তিম শয়ান মূৰ্ত্তি। দেখেই প্রণত হলুম। এই মন্দিরের গায়েও চিত্র-শিল্পীদের তুলিকা-সম্পাতে অপূৰ্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। শিল্পীরা ভগবান তথাগতের জীবনী নানা বিচিত্র ভাবে এঁকেছেন। বুদ্ধদেব রোরুদ্যমান বহু ভক্ত ও শিষ্য-পরিবৃত হয়ে শালবনে নির্ব্বাণ লাভ করছেন—এ চিত্রটী বড়ই মৰ্ম্মস্পর্শী। দেখ্‌লুম, অনেক ভক্ত কাছে গিয়ে অতি দুঃখিত চিত্তে ঐ ছবিটী খুব মন দিয়ে দেখ্‌ছে।

আমরা বাইরে এসে এখানকার যাদুঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম, কাঁচের কয়টী আলমারীতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মণি মুক্তা হীরক-খচিত সুন্দর সব বুদ্ধ মূৰ্ত্তি। তা ছাড়া সোণা রূপার ছোট বড় স্তূপ-মন্দির, হাতীর দাঁতের ভিতর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের মধ্যে শত শত বুদ্ধ-মূৰ্ত্তির শোভা। সমুদ্র হ'তে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান ঝিনুক, মুক্তা, পাথর কত না কিছু সব জিনিষই যত্নে রাখা হয়েছে, দাতাদের নামও তার সাথে লেখা আছে।

আমরা এসব দেখে বাইরে আস্‌তেই "ডায়নামো" ঘরের গুম্ গুম্ শব্দের সাথে মন্দির-প্রাঙ্গনে শত শত আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠ্‌লো। হঠাৎ যেন আলোর রাজ্যে এসে পড়লুম। মন্দিরের সবই দেখা হয়েছে। এবার ফেরবার পথে আর একবার মুখ তুলে চাইলুম ঐ গগনস্পর্শী নীরবগম্ভীর বিরাট চৈত্য চূড়ার পানে—তার অতি উচ্চ স্বর্ণ-শীর্ষে পবনান্দোলিত সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে মনে হয় যেন কোন চিররহস্যময় অসীমের আহ্বানকে মূৰ্ত্ত করে তুলেছে। সমস্ত মন প্রাণ একটা অন্তর্গূঢ় আনন্দের স্বপ্নাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে মনে দেবতাকে স্মরণ করে প্রণত হলুম। ধীরে ধীরে এবার ফিরে চলেছি—মনে হচ্ছে যেন কোন দেবলোকে এসেছিলুম। যা এতদিন শুনেছিলুম, স্বচক্ষে দেখে তাকে প্রাণের ভিতর চিরস্মরণীয় করে জাগিয়ে রাখলুম—ঐ বিশাল মন্দির "সোয়েডাগন" আর দেবতা তথাগত।

টামোয়ে

নিঃশেষপ্রায় চৈত্রের একটী স্বপ্ন অপরাহ্ন। টামোয়ে" যাবার জন্য ফুডাজিকেল ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলুম আমি ও আমার এক সঙ্গী—দু'তিনখানা ট্রাম সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল। এবার সম্মুখের দিকে "টামোয়ে" লেখা একখানা ট্রাম আস্‌ছে দেখে আমরা এগিয়ে লাইনের ধারে এসে দাঁড়াতেই ট্রাম কাছে এসে থেমে গেল। আমরা ট্রামে উঠে বসে পড়লুম।

রেঙ্গুন সহরের উত্তর-পশ্চিম শেষ সীমায় এই "টামোয়ে"। মাত্র কয়েক বছর হ'ল এ স্থানটীকে সহর-সংলগ্ন ক'রে সুন্দর রাস্তা, ময়দান, বিজ্‌লি-বাতি জলের কল এবং পাকা বাড়ী—সব তৈরী করা হয়েছে। নতুন ঘোড়দৌড়ের মাঠটিও ওখানেই। সহর হ'তে ট্রাম লাইনটী এখানে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহেই ঘোড়দৌড় উপলক্ষে ওখানে বহু জনসমাগম এবং যান বাহনাদির আমদানী হয়।

আমাদের ট্রামখানা সহরের বুকের উপর দিয়ে সেক্রেটারীয়েটের পাশ কাটিয়ে জোড়াগির্জ্জার ধার দিয়ে মণ্ট্‌গোমারী ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল। একটু পরে থিয়েটার হলটীর সাম্‌নে দিয়ে সশব্দে রেল লাইনের ওপর পুলটী পেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে 'ষ্টপেজ'-এ থেমে লোক নামিয়ে ও উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অফিস-ফেরত বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, বর্ম্মী, এ্যাংলো যাত্রীতে ট্রামটি ভরে গেল। উড়িষ্যাবাসী টিকেট-বিক্রেতা এসে টিকেট চাইতেই সঙ্গী বন্ধুটী জিজ্ঞেস ক'রে 'টামোয়ের' ভাড়া জেনে, সাত পয়সা করে দু'খানা টিকেট কিনে নিলেন। ট্রাম বেশ জোরেই চল্‌ছে; আমি সঙ্গীর সাথে নানা গল্পে ও আলোচনায় ব্যস্ত।

ট্রাম এসে "কান্দোগ্নে" বাজারের সাম্‌নে দাঁড়াল। কতকগুলো অফিস-ফেরত বাবু এখানে নেবে গেলেন, বাড়ী ফেরবার পথে বাজার হ'তে তাঁরা কিছু কিনে

নিয়ে যাবেন, বাজারটী এখনও খোলা আছে ; অবশ্য সহরের বাজারগুলো রোজই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হ'য়ে যায়। এ বাজারটি বিশেষ বড় নয়, তবে সব জিনিষই পাওয়া যায়, সহরের এদিকটায় আর তেমন বড় বাজারও নেই।

ট্রাম ছেড়ে একটু সাম্‌নে এগিয়ে যেতেই দেখ্‌লাম একটী তাড়ির দোকানে মহা ভিড় লেগেছে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে বোতলে ক'রে মহা আনন্দে তাড়ি খাচ্ছে, কেউ কিনবার জন্যে ব্যস্ত, কেউ নেশার ঘোরে মাটীতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, তাড়ির দোকানের মালিক হলেন চীনদেশবাসী, আর পান-পিয়াসী সবাই ভারতীয় তেলেগু কুলি। এরা দিন রাত রিক্‌সা নিয়ে বেড়ায় এবং কুলীগিরি ক'রে যখনই কিছু পয়সা রোজগার হ'ল রাতে বা দিনে, অমনি তাড়ির দোকানে গিয়ে সেই উপহারটি দিয়ে তাড়ি পান করছে। এরূপ তাড়ির দোকান সহরে অনেক স্থানেই রয়েছে। তাড়িও এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ তৈরী হয়। মিলের কুলীরাও তাড়ি খেতে ওস্তাদ। অবশ্য তাদের ঘরের সামনেই দোকান থাকে, দূরে আর যেতে হয় না। এই তাড়ির দোকানের সামনের দৃশ্য দেখে মনটা বড়ই দমে গেল। মনে হ'ল এই গরীব লোকগুলো জীবনভোর এই রিক্‌সা টানা অথবা কুলীগিরি ক'রে আর তাড়ি খেয়েই কি কাটাবে ? বাড়ী ঘর যেন তাদের নেই ! নেশায় এমনভবে বিভোর হয়ে আছে—তারা যেন জগতের আর কিছুই চায় না। শুধু যেন এই ভাবেই জীবন বইবার জন্য তাদের জন্ম।

ট্রাম ছুটে চলেছে, উভয় পার্শ্বে বর্ম্মা বাড়ীতে মেয়েরা কেউ বসে চুরুট টানছে, আবার কেউ বা বিক্রীর জন্যে চুরুট তৈরী করছে। দলে দলে আবার অনেকে সুন্দর সেজেগুজে বেড়াতেও বের হচ্ছে ; কোন বাড়ীর দোতালায় গ্রামোফোন চল্‌ছে। ইনস্‌পেক্টর এসে আমাদের টিকেটগুলো দেখে টিকিটের পাশটা কেটে দিয়ে গেল। যাদের টিকেট কেনা হয়নি, তাদের নিকট পয়সা আদায় ক'রে সবার টিকিটই পরীক্ষা ক'রে সে রাস্তার মাঝে নেমে গেল। ট্রামখানা এবার লেকের নিকট থামতেই বহু যাত্রী ওখানে নেমে গেল।

আমরা ট্রামে বসে রয়েল লেকের দক্ষিণ পারের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখে খুবই মুগ্ধ হলুম। লেকের ঝির-ঝিরে নির্ম্মল হাওয়া আমাদের দেহে তার স্নিগ্ধপরশ বুলিয়ে দিল। এতদূর হ'তেও লেকের গাঢ় সবুজ বনানী ভেদ করে সুউচ্চ সোয়েডাগন প্যাগোডার সোনালি চূড়াটি দেখ্‌তে পেয়ে অমনি বুদ্ধ ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলুম। ট্রাম একটু বেঁকে কালা বস্তি ও পৌনা বস্তির ভিতর দিয়ে পূবদিকে চল্‌ছে। কালা অর্থে বিদেশী; পৌনারা মণিপুর হ'তে ব্রহ্মরাজের জ্যোতিষীরূপে এসেছিল, পূর্ব্বে বোধহয় এই স্থানে এদের নির্দ্দিষ্ট বাস ছিল, বর্ত্তমানে তা নেই। খানিকটা এগিয়ে ট্রাম পুনরায় উত্তর দিকে চল্‌ল। আমাদের পাশ দিয়ে বিপরীত দিক হ'তে দু'তিনখানা ট্রাম সহরের দিকে চলে গেল। এখানে ট্রাম লাইনের উভয় পাশের বাড়াগুলো দেখে মনে হ'ল এ পাড়াটী যেন নূতন তৈরী হ'য়েছে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বল্লেন, 'এটী সম্পূর্ণ নূতন বস্তি, এপাড়াটার নাম হাড্ডি বস্তি।' এতটা পথ আস্‌তে ট্রামের যাত্রী প্রায় সবই নেবে গেছে, শুধু দু'চারজন যারা শেষ পর্য্যন্ত যাবে তারাই রয়েছে। টামোয়ের বড় মস্‌জিদটীর নিকট এসে একটু দাঁড়িয়ে আমাদের ট্রামখানা সোজা পশ্চিম দিকে একেবারে টার্মিনাসের দিকে চল্‌ল।

প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে ট্রামখানা টামোয়ের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হ'ল; আমরা নেবে পড়লুম। অনতিদূরেই উত্তরদিকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। পশ্চিমদিকের রাস্তায় সহর ও বাহির হ'তে সর্ব্বদা মোটর যাতায়াত করছে। সেই রাস্তাটীর পশ্চিম দিক্‌কার পল্লীতেই এক বিরাট বুদ্ধ-বিগ্রহ স্থাপিত। এখান হ'তেই তাঁর উন্নত মস্তকটী দেখা যাচ্ছে। আমরা এখানে নাব্‌তেই মুক্ত ময়দানের নির্ম্মল হাওয়ায় মনপ্রাণ স্নিগ্ধ উদারতায় ভ'রে উঠ্‌ল।

এবার হেঁটে সোজা বড় রাস্তায় এবং তার লাগোয়া কাঠের পুলটী অতিক্রম ক'রে অসমতল মাঠের ভিতর দিয়ে দেবায়তনের দিকে এগিয়ে চলেছি। রাস্তার উপর হ'তে মূর্ত্তিটী অতি নিকটে ব'লেই মনে হয়েছিল; কিন্তু তা যথার্থ নয়। মাঠের ধারে বর্ম্মা রাখাল বালকেরা গরু চরাতে এসেছে, কেউবা ঘুড়ি

উড়াচ্ছে। আমাদের দেখে তারা অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধুটি ওদের ভাষায় একজনকে ডেকে ঐ মন্দিরে যেতে কোন্ রাস্তাটি সুবিধে জিজ্ঞেস কর্‌তেই তারা সাম্‌নের পথটি দেখিয়ে দিল। আমরা ঠিক পথেই চলেছি। অদূরেই একটি চীনা বাড়ীতে দেখলাম শত শত হাঁস প্যাক প্যাক করছে। বাড়ীর চারিদিকে শক্ত বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে বাইরে যাবার-আসবার জন্য একটী পথ রেখেছে, তা-ও বাঁশের কেয়ারি দিয়ে বন্ধ, আর ভিতরে নিজেদের বাস ক'রবার ঘরের চারিদিকে খোলা জায়গায় বালি ফেলে কতকটা ঢালু। নীচের দিকে খানিকটা জলকাদা র'য়েছে; উপরের দিকটা একেবারে শুষ্ক। হাঁসগুলি দিনরাত ঐ কাদা জল বা শুক্‌নোতে থাকে। তবে মাঝে একবার বেলা দশটার সময় চীনা বালক লাঠি হাতে গরু চরাবার মত হাঁসগুলোকে বাড়ী হ'তে বাইরে চরাতে নিয়ে যায়। মাঠে মাঠে ঘুরিয়ে বৈকালে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। তখন খেতে দেয় ভাত বা ধান, চাল-সিদ্ধ ইত্যাদি। রাতে ঐ শুক্‌নো জায়গাতেই হাঁসগুলো ডিম পাড়ে। দুই তিনটি প্রহরী কুকুর রয়েছে, যে কোন বিপদ হ'তে হাঁসগুলোকে তারা রক্ষা করে এবং ঘেউ ঘেউ ক'রে মালিককে জানিয়ে দেয়। এ ব্যবসায় চীনারা বেশ দুপয়সা উপায় করে। এরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার না ক'রেও উত্তাপ দিয়ে শত শত বাচ্চা এক সঙ্গে ডিম হ'তে ফুটোয়—জমিতে ড্রেনের মত কেটে, ভিতরে বালি বিছিয়ে তার উপর ডিমগুলো সাজিয়ে দেয় এবং ড্রেনের উপরটা কাঠ দিয়ে ঢেকে একটু মাটি-চাপা দেয়; আবার ড্রেনের নীচুতে লাইন ক'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ব্যাপী আগুনের উত্তাপ দেয়, পরে ড্রেনের উপরটা খুলে ডিমে একটু একটু ঘা দিতেই—বাচ্চাগুলো চিঁ চিঁ ক'রে বের হয়! এই কৌশলটি এরা কাউকে বড় শেখায় না, তবে এক আনা দিলেই একটি ডিম ফুটিয়ে দেয়। বাচ্চাদের পরিচর্য্যার জন্য ভিন্ন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ওখানে তাদের সাবধানে রাখা হয় এবং একটু বড় হওয়ার পরে পাখা বেরোবার সঙ্গেই বিক্রি করে দেয়। বাচ্চা, ডিম, হাঁস সবই এরা বাড়ী ব'সেই বিক্রি করে।

আরও এগিয়ে যেতে দেখ্‌লাম মাঠ ভ'রে বিচিত্র ঋতু-পুষ্প থরে থরে ফুটে রয়েছে—বাঙ্গলা দেশের সর্ষে ক্ষেতের মত এই ফুলের চাষ করেছে—দেখতে বড়ই সুন্দর! এবার আমরা মাঠ ছেড়ে পল্লীপথে এগিয়ে যাচ্ছি। দু'ইপাশের বাঁশবন এবং অন্যান্য জংলা গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে লতা গুল্মে জড়িত হ'য়ে পথটিকে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আমরা কোথাও মাথা উঁচু ক'রে, কোথাও নীচু হ'য়ে এঁকে-বেঁকে এই ক্ষুদ্র পথে যেন একটি লতা-বীথিকার মাঝ দিয়ে চলেছি। লতাকুঞ্জের ফাঁক থেকে পাখীর কল-কাকলিও ভেসে আস্‌ছে।

এখানে এসে বাঙ্গালার শ্যামল-পল্লীর সহজ সৌন্দর্য্যের রম্য রূপটি মনে জেগে উঠ্‌ল। সহরে বাস করে পল্লীর সরল সৌন্দর্য্যের অনুভূতি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অদূরে দুই দিকে মাঝে মাঝে বর্ম্মীদের দু'ই চারখানি ঘর, পল্লীটি যে খুবই নিঃস্ব তাদের ঘরগুলোর দিকে চাইলেই বুঝা যায়। মাটী হ'তে দুই তিন হাত উঁচু করে বাঁশের বা কাঠের মাচা বেঁধে তার ওপর পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট ঘরগুলো ঠিক পাহাড়ীদের আবাসের মতই তৈরী। দু'চার জন প্রবীন বর্ম্মী-বর্ম্মিণী বসে সাংসারিক কাজ করছে। কেউবা আহার সমাপন করে নিচ্ছে। ঘরগুলোর দুইদিকেই ফুলের ক্ষেত। নানা রংয়ের ফুল অপর্য্যাপ্ত ফুটে রয়েছে। ক্ষেতের চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে তার সাথে শিম, বরবটি, ঝিঙ্গে—ইত্যাদি তরকারীও বেশ ফলিয়েছে। দুই তিনটি বর্ম্মিণী ফুল কেটে জড়ো করছে। একটি ছোট মেয়ে বসে সেগুলি গুছিয়ে বেঁধে সাজিয়ে রাখ্‌ছে। ভোরে এ ফুল বাজারে বিক্রী কর্‌তে নিয়ে যাবে। তরকারীও বিক্রীর জন্যেই। এতেই এদের দু'চার পয়সা উপার্জ্জন হয়। এদেশে ফুলের ব্যবসা বড়ই লাভজনক। সাধারণতঃ মেয়েরাই এইসব ব্যবসায়ে নিপুণ।

এবার আমরা মূর্ত্তিটীর অনেক নিকটে এসে পড়েছি। পথের সম্মুখে একটা জংলা মাঠ। তারই দক্ষিণ দিকের ছোট রাস্তাটি ধ'রে কয়েকটি বর্ম্মীর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে চলেছি। বাড়ীর প্রহরী কুকুরগুলো খুব সাহসিকতা দেখিয়ে সগর্জ্জনে তাড়া

ক'রে এল। বন্ধুটি বর্ম্মা ভাষায় "খোয়ে খোয়ে" বলে চীৎকার কর্‌তেই গৃহস্থেরা কুকুরকে ডেকে থামিয়ে দিল। এবার আমরা মূর্ত্তিটীর সন্নিকটে এসেছি। একটি বর্ম্মী আমাদের জুতো খুলে যেতে বল্‌লেন। মূর্ত্তিটীর পিছন দিক্‌ দিয়ে এসেছি, তাই দেখে মনে হচ্ছে একটি উঁচু প্রাচীন প্রাচীর যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে! অবশ্য দেবতার মাথার পশ্চাৎ দিক্‌টা দেখা যাচ্ছে। পূর্ব্ব দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা সেই বিশাল বিগ্রহের সাম্‌নে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের এই শায়িত মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে যুক্ত করে প্রণত হলুম! শুধু মনে হ'ল এতবড় বিরাট মূর্ত্তি কোন অজ্ঞাতনামা সৌভাগ্যবান পুরুষ কতকাল পূর্ব্বে বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মের জন্য অকাতরে অজস্র অর্থব্যয়ের কথা ভেবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মন-প্রাণ অবনত হয়ে এল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে শায়িত মূর্ত্তিটী ইটের দ্বারা নির্ম্মিত। তবে নির্ম্মাতার বিশেষ সুখ্যাতি করা যায় না। কারণ গঠন-ভঙ্গী মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। শায়িত মূর্ত্তিটীর মস্তকটি শায়িত অবস্থায় না রেখে শিল্পী দেহ হ'তে মস্তকটি উপবিষ্ট অবস্থার মত উন্নত করে রেখেছেন। কাজেই মূর্ত্তিটী খুবই অস্বাভাবিক হয়েছে। জানিনা—হয়ত এ বিরাট মূর্ত্তির মস্তকটি শায়িত অবস্থায় রাখা সম্ভবপর হয়নি ব'লেই এভাবে তৈরী কি-না। যা হোক, এই বিশলকায় মূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে পায়ের নিকটে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একখানা পায়ের পাতা, দাঁড়ান একটি মানুষের চেয়েও প্রশস্ত! এক একটি আঙ্গুল থামের মত মোটা। শায়িত অবস্থায় মূর্ত্তিটীর উচ্চতা ছোট খাট একটি পাহাড়ের মতই। দৈর্ঘ্যও অনুপাতে কম নয়। শীর্ষটি এই পল্লীর উঁচু ঘর-বাড়ীর এবং বৃক্ষাদির উপর দিয়ে উঠেছে। এর কোন আবরণ নেই,—উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপ-তলে স্থাপিত। স্থানটি বেশ সুনিবিড় স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। বনানী-বেষ্টিত এই নির্জ্জন পল্লীতে এলেই এখনকার নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্য সবাইকে মুগ্ধ করে। সম্মুখে একটি বিশ্রামভবন অথবা প্রার্থনালয় রয়েছে—একতলা পাকা বাড়ী, কোন ভিন্ন ঘর তাতে নেই, সম্পূর্ণটাই খোলা হল ঘর। সেখানে ব'সে দয়ালু বুদ্ধের এই বিরাট বিগ্রহটি আরও প্রাণ ভরে, চেয়ে

দেখ্‌লুম। চারিদিকে ছোট বড় জংলাগাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পার্শ্বেই গরীব পল্লীগুলো; তাদের এমন অবস্থা নয় যে তারা মূর্ত্তিকে নূতন ক'রে সংস্কার করে। অদূরে দুই তিনটি জমকালো বৌদ্ধ বিহার।

বিশ্রাম আলাপের সঙ্গে সঙ্গীকে বল্‌তেই তিনি সময় উপযোগী একটি গান গাইলেন! বেশ ভালই লাগ্‌ল। আরও একটা গান হ'ল, দেবতা এ গান শুন্‌লেন কিনা জানিনে। পরে জংলার ভিতর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথটি বেয়ে এই বিগ্রহের চারিদিক ঘুরে দেখ্‌তে বের হ'লুম। একটু এগিয়ে যেতেই দেখি অদূরে ক্ষুদ্র বনানীর আড়ালে বসে' নীরবে একজন সৌম্য শান্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু একান্তে ধ্যান-নিরত রয়েছেন—দাঁড়িয়ে তাঁর শান্ত উজ্জ্বল মুখের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলুম; মন যেন তাঁর অন্তর্জগতে বিচরণ করছে, বাহিরের জগতের কোন খবরই তিনি রাখেন না। সাধুকে দেখে আমাদের মনেও সাময়িক ভাবান্তর এল, পুলক ও গাম্ভীর্য্যে প্রাণ ভরে গেল। সাধুর ধ্যানের কোন ব্যাঘাত হবে ভেবে অতি সন্তর্পণে আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হ'তে এ স্থানটি অনেকটা উঁচু। দক্ষিণ দিকে নীচু জমিতে আল ক'রে গোলাপের চাষ করা হয়েছে। শত শত গোলাপ গাছে অসংখ্য বিচিত্র বর্ণের গোলাপ ফুটে আছে। বেলা-শেষে বর্ম্মী মেয়েরা গোলাপ কাট্‌ছে, কেউবা কূয়া থেকে জল তুলে বাগানে দিচ্ছে। এবার পশ্চিম দিকের ছোট দু'ইতিনটি দেব-বিগ্রহের সাম্‌নে দিয়ে উত্তর দিকে জংলাপূর্ণ মাঠের পথে পুনরায় দেবতার সম্মুখে ফিরে এলুম। মনে হ'ল এই বিরাট দেবতা বহুকাল থেকে বনান্তরালে শায়িত অবস্থায় লুকিয়ে রয়েছেন। বর্ত্তমানে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী ব্যতীত অপর কোন ভক্ত-সমাগম বিশেষ হয় না।

বহুদিন পরে এমন স্থানে এসে পল্লার আবহাওয়াটা বেশ অনুভব করলাম এবং বর্ম্মার গরীব পল্লী-জীবনের কতকটা আভাস পেলাম। পূর্ব্বেই বলেছি, বর্ম্মী জাতি খুবই সৌন্দর্য্যপ্রিয়, এরা ফুলকে খুবই ভালবাসে। সহরের বাজারে এসব পল্লী হ'তে তাই এত ফুলের আমদানী হয়। নিত্য মন্দিরে, দেবতার চরণে রাশি রাশি সুন্দর পুষ্পার্ঘ্য এরাই দিয়ে থাকে।

এবার আমরা ভগবান তথাগতের বিরাট বিগ্রহের সাম্‌নে নত জানু হ'য়ে প্রণাম প্রার্থনা ক'রে ফিরে আসবার সময় সেই ধ্যান-নিরত সাধুটীর সাথে দেবতার সাম্‌নেই দেখা হ'ল। তিনি ধ্যান ভঙ্গের পর একটি মালা জপ করতে করতে দেবতার সামনে এসেছেন, আমরা দেখেই সসম্ভ্রমে তাঁকে সম্মান করলুম। তিনি আমাদের বাঙ্গালী দেখে আগ্রহ ক'রে পাশে বস্‌লেন—আমিও তাঁর সাথে একটু আলাপ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি কি নিত্য এখানে আসেন? সহাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "না, তবে মাঝে মাঝে এখানে আসি, নীরবে ধ্যান ধারণা করতে—সহর কোলাহলপূর্ণ—এ স্থানটি বড়ই শান্ত ও নীরব—এখানে এ দেবতার কাছে আমার বেশ ভাল লাগে।"* তিনি আবও বল্‌লেন, 'আমি আপনাদের দেশে গিয়ে "বুদ্ধগয়া" ও "সারনাথ" দেখে এসেছি। ওদেশেই আমাদের ৺ভগবানের জন্ম। কাজেই আপনারা আমাদের অতি আপন। একই ধর্ম্মালোকে আমরা আলোকিত। আরও দেখেছি আমাদের 'ফায়াকে' অর্থাৎ বুদ্ধদেবকে আপনাদের দেশের লোকেরাও ৺ভগবান বলে পূজা করেন। সত্যি ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ।" তাঁর কথাগুলো আমাদের বড়ই আনন্দ দিল। তিনি বল্‌লেন, "আপনারা কি এখানে এই প্রথম এসেছেন?" উত্তর দিলুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক দিন যাবৎ এ বিরাট মূর্ত্তিটীর কথা শুনেছিলুম, কিন্তু দেখা হয়নি, তাই আজ দেখতে এলুম।" কথা বল্‌তে বল্‌তে বেলা নেবে এল। তাই তাঁকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ঘুরে ফিরে সেই লতা-বিথীকার মাঝ দিয়ে, জনবিরল গ্রাম্য পথে সূর্য্য ডুবে যাবার সঙ্গেই "টামোয়ের" বড় রাস্তায় উপস্থিত হলুম। চারিটী রাস্তার সংযোগস্থল—চারিদিকে খোলা মাঠ, উদাসী সন্ধ্যার মৌনতা ভঙ্গ ক'রে স্নিগ্ধ বাতাস আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিল। দূরে বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো সারি দিয়ে জ্বলে উঠ্‌ল। সত্যি আজ প্রাণে একটা অখণ্ড তৃপ্তি নিয়ে আমরা এগিয়ে একখানা ট্রাম ধরে, একটু রাত করেই ঘরে ফিরে এলুম।

* এই নির্জ্জন স্থানে কিছুদিন হ'ল ঐ বিরাট দেবতার সামনের পান্থশালাটীকে ঘিরে কোন সদাশয় ব্যক্তি একটী "বিহার" তৈরী করে দিয়েছেন বর্ত্তমানে কয়েক জন ভিক্ষু ওখানে বাস করেন।

পেগুতে
জলখেলা উৎসব

চৈত্রের প্রথম পূর্ণিমায় ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জলখেলা আরম্ভ হয়েছে। হিন্দুদের যেমন দোল পূর্ণিমায় রং খেলা হয়, এও ঠিক সেইরূপই; তবে রংএর পরিবর্ত্তে শুধু জল, এই যা প্রভেদ। পল্লী ও নগর আজ আনন্দে মুখরিত। বর্ম্মী বালক, যুবক, যুবতী—সবাই উৎসবানন্দে মেতে উঠেছে, রাস্তায় জলপাত্র হাতে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। পথিক বর্ম্মী মেয়ে-পুরুষকে জল দিয়ে একেবারে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা পিচকারীতে জল নিয়ে দোতলা বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। জলখেলার সঙ্গে গানবাজনারও ব্যবস্থা রয়েছে। কোনও দল হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তায় যাকে পাচ্ছে জল দিচ্ছে। কোনও দল মোটর লরীতে সেজেগুজে নাচগানে মত্ত হ'য়ে রাস্তায় লোকদের গায় জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে চলেছে। আজ আর কোন বর্ম্মী ভদ্রব্যক্তির পালাবার পথ নেই। যে যাকে পাচ্ছে তাকেই স্নান করিয়ে দিচ্ছে, অবশ্য বর্ম্মী হওয়া চাই; অপর জাতদের বড় একটা জল দেয় না। শুনেছি পূর্ব্বে সকলকেই ভিজিয়ে দিত; একবার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে গোলযোগ হওয়ায় প্রতি বৎসর পুলিশের বড়কর্ত্তা বর্ম্মীদের পূর্ব্বেই সাবধান ক'রে দেয়—যাতে অপর জাতের গায়ে জল দেওয়া না হয়। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে, জলখেলায় বর্ম্মীদের গরীব-ধনী কাউকেই এই জলে ভিজে কিন্তু কখনও ক্ষণিকের জন্যও অসন্তুষ্ট হ'তে দেখিনি, বরং সবার মনেই আনন্দ। রাস্তায় গাড়ী, মোটর, বাস—যাতেই যে যাচ্ছে, সবাইকেই রাস্তার দু'দিক হ'তে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এইরূপ আনন্দ দু'তিন দিন যাবৎ চলেছে। রেঙ্গুনে রাস্তায় জলখেলা দেখ্‌বার জন্য লোকের ভিড় জমেছে, পুলিশ মাঝে মাঝে তাড়া দিয়ে লোক সরিয়ে দিচ্ছে।

আগামী কালই জলখেলার উৎসব শেষ হবে। কাল বর্ম্মী ভক্তগণ দলে দলে সহরের বিখ্যাত সোয়েডাগন মন্দিরে গিয়ে জল দিয়ে মন্দিরতল ধুয়ে দেবে। এদেশে প্রবাদ,—এই জলখেলা উৎসবের তিন দিনের মধ্যেই বৃষ্টি হবে এবং এর পরই এদেশে চাষ আরম্ভ হয়। এ প্রবাদ কিন্তু সত্যই প্রত্যক্ষ করেছি,—দারুণ রোদের ভিতরও হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। না হ'লে অকল্যাণ—দেবতা অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন বুঝ্‌তে হবে।

আমাদের এক বন্ধু বল্লেন, "কাল পেগু গেলে মন্দ হয় না,—সেখানে এই জলখেলা উপলক্ষে বিরাট মেলা হচ্ছে, আর পেগুতে একটী শায়িত বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তি রয়েছে, যার বৃহত্ত্বের তুলনা সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই,—সেই বিখ্যাত বিগ্রহটিকে দেখে আসা যাবে।"

এই প্রস্তাবে সকলেই একমত হওয়া গেল; কাল অতি প্রত্যূষে পাঁচটার গাড়ীতে পেগু রওনা হব ঠিক হ'ল। রেঙ্গুন হ'তে পেগু ট্রেণে পঁয়তাল্লিশ মাইল মাত্র। মেলট্রেণ দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে দেয়। 'লোকাল'গুলো দেরীতে যায়। মোটর বাসও সর্ব্বদা যাওয়া-আসা কর্‌ছে।

পরদিন অতি প্রত্যূষে পাঁচটার পূর্ব্বেই রেঙ্গুন ষ্টেশনে এসে পেগু পর্য্যন্ত তিনখানা টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠে বস্‌তেই প্লাটফর্ম্মে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। গাড়ী ছাড়তে মাত্র পাঁচ মিনিট দেরী রয়েছে। ইত্যবসরে ইঞ্জিনখানা এসে ধাক্কা খেয়ে গাড়ীর সঙ্গে লেগে গেল। যাত্রীরা সব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গার্ড সাহেব তাঁর বাঁশী ও পতাকা হস্তে গাড়ীর সম্মুখে আসা-যাওয়া কর্‌ছেন। একটু পরেই নির্দ্ধারিত সময়ে গার্ডের বাঁশী বেজে ওঠার সঙ্গেই ইঞ্জিন সুচিক্কণ বংশীধ্বনি ক'রে হুস্ হুস্ শব্দে গাড়ী টেনে নিয়ে চল্ল। ইঞ্জিনের কালো চোঙা থেকে উৎসারিত কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া নির্ম্মল আকাশকে গভীর ধূসর বর্ণে রঞ্জিত ক'রে দিল। ক্রমেই গাড়ীর গতি বাড়্‌তে লাগল। আমরা বেশ প্রশস্ত জায়গায় ব'সে গল্প-গুজব কর্‌ছি,—এর মধ্যেই দু'টী ষ্টেশনে থেমে লোক নামিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গাড়ী পুনরায় চলতে আরম্ভ করেছে। আমাদের এ ট্রেণ মেলগাড়ী

নয়, তাই সব ষ্টেশনে থেমে থেমে যাবে ; তাই দেরীও হবে অনেক, কারণ ছোট ছোট ষ্টেশনগুলো খুবই কাছে কাছে।

দিনের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের গাড়ীর অদূরে বর্ম্মীপল্লীর জীর্ণ কুটীরগুলোর পাশ দিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরের সুবর্ণ চূড়াগুলো প্রভাত-আলোর স্পর্শে ঝল্‌মল্ কর্‌ছে। আবার মাঝে মাঝে বিশাল ধানক্ষেত শূন্য পড়ে রয়েছে। ধান উঠে গেছে, বৃষ্টি পড়লেই আবার চাষ আরম্ভ হবে। ছোট-বড় দু-চারটী নদীনালা মাঠের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে। বর্ম্মী ছেলেরা গরু মহিষ নিয়ে মাঠে এসেছে। রেল লাইনের উভয় পার্শ্বেই প্রভাত-সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণে একটা স্নিগ্ধশান্তি বিকীর্ণ ক'রে দিচ্ছিল।

গাড়ীখানা প্রত্যেক ষ্টেশনে তিন-চার মিনিট ক'রে থেমে থেমে চলেছে। প্রায় ষ্টেশনেই বর্ম্মী ফিরিওয়ালারা নানা রকম খাবার নিয়ে যাত্রীদের আহ্বান কর্‌ছে। মাছ ভাজা, পিঁয়াজী, কলা, মিঠে ভাত, মোয়েঙা—এ এক রকম ময়দা দিয়ে তৈরী খাবার। এই সব খাবারের কোনটাই আমাদের পছন্দ হ'ল না ;—বর্ম্মীযাত্রীরা দু-চার পয়সার কিনে খেতে লাগলো। মাঝে রাস্তায় অপর একখানা গাড়ী পাশ কেটে রেঙ্গুনের দিকে চ'লে গেল। আমাদের গাড়ীখানা দ্রুত চলেছে—কখনও মাঠের ভিতর দিয়ে, গ্রামের পাশ দিয়ে, আবার কখনও বা নদীর পুলের উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে দু'চারটী জলখেলার দলও দেখ্‌তে পেলুম,—গাড়ীতে জল ছুড়ে দিচ্ছে।

এদেশের গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও সুবিধা দেখলুম। যে যাত্রী প্রথম এসে একটা বেঞ্চ সম্পূর্ণ অধিকার ক'রেছে, অন্য কোনও যাত্রী বসবার জায়গা নিয়ে তার উপর কোনও উৎপাত করতে পারবে না,—এটী বেশ ভাল বোধ হ'ল। তবে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই—বড়ই নোংরা ; অবশ্য বর্ম্মীদের জলের আবশ্যক বড়-একটা হয় না, তাই বোধ হয় এরূপ ব্যবস্থা। এদেশের গাড়ীতে মেয়েদের জন্য কোনও পৃথক্ আসন নেই। এরা পর্দানশীন নয়—তাই মেয়ে-পুরুষ স্বাধীনভাবেই যাওয়া আসা করছে, কোন সঙ্কোচ কারো নেই।

প্রায় আটটার মধ্যেই আমরা পেগু ষ্টেশনে উপস্থিত হলুম। বেশ বড় রকমের প্লাটফরম্,—এটী একটী জংশন। সর্ব্বদা নানাদিক থে'কে গাড়ী আস্‌ছে যাচ্ছে, মাদ্রাজী কুলী এসে হাঁকডাক করছে, আমাদের কুলী নেবার মত সঙ্গে কিছু ছিল না। তবে এখানে ফিরিওয়ালাদের নানারূপ খাবার দেখে সত্যই কিছু না কিনে আর পারা গেল না। মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, পিঁয়াজী, সোডা, লিমনেড্, রুটি, চা, কাফি, কলা, আরও নানারকম বর্ম্মী খাবার—যা' চাই সবই রয়েছে। একটী ভাল রেস্তোরাঁও র'য়েছে। আমরা বিশুদ্ধ মাদ্রাজীর কাফি, মুসলমানের রুটি, বর্ম্মার কলা, এই নিয়ে তিন বন্ধু মিলে প্রাতরাশ সমাপন করলুম। এই ষ্টেশনে অনেক যাত্রী নাম্‌লো, গাড়ী অনেকটা ফাঁকা হ'ল। এবার সহরের ভেতরে যাবার জন্য উদগ্রীব হ'লুম। এটী একটী জেলার সদর টাউন; পূর্ব্ব-পশ্চিমে সহরটী লম্বা, মাঝে ষ্টেশন। দুইখানা রিক্‌সা নিয়ে আমরা পূর্বদিকের পথে এগিয়ে চলেছি। একটু পরে নদীর পাড়ে এসে রিক্‌সাওয়ালা দক্ষিণ দিকের মোড় ঘুরে চল্ল।

রাস্তায় মাঝে মাঝে জলখেলায় মত্ত তরুণ ও তরুণীরা জলপাত্র হস্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুযোগ বুঝে তরুণীগণ তরুণদের জল ছুড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে, তারাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়্‌ছে না; সঙ্গে সঙ্গে পথিকদেরও ভিজে যেতে হচ্ছে; বৃদ্ধেরা আশেপাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের পূর্বস্মৃতি স্মরণ ক'রে আনন্দিত হচ্ছে। রেঙ্গুন সহরে বাস ক'রে এতদিন বুঝতে পারিনি, এখানে এসে সত্যিই বর্ম্মার সহর ব'লে মনে হ'ল।

এবার আমরা পিগু নদীর লৌহ সেতুটীর উপর দিয়ে চলেছি। নদীটি সহরের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে; যদিও তেমন প্রশস্ত নয়, কিন্তু বেশ গভীর ও স্রোতশীল। পুলটী বেশ সুদৃঢ় ও প্রশস্ত। এক পাশ দিয়ে গাড়ী, মোটর আসছে, অপর পাশ দিয়ে যাচ্ছে, উভয় পার্শ্বে লোকের চলবারও পথ র'য়েছে। এই সেতুটিই পূর্ব্ব-পশ্চিমে সহরকে যুক্ত ক'রে রেখেছে। নদীর উভয় তীরেই চাল কলের উচ্চ চোঙগুলি দেখা যাচ্ছে। বর্ম্মার এই জেলায়ই নাকি চাল কলের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

পুলটী পার হ'য়ে আমরা পূর্ব্ব পারে বাজারের সম্মুখে রিক্সা থে'কে নেবে ভেতরে প্রবেশ করলুম। নদীর ধারেই বাজার; এখানে সব জিনিষই পাওয়া যায়। ভারতীয়দেরও অনেক দোকান রয়েছে, বর্ম্মীদেরও আছে। বর্ম্মী মেয়েরা এখানে সেখানে ব'সে নানা জিনিষ বিক্রয় করছে। শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ, মাংস—অনেক কিছু রয়েছে—সৌখীন জিনিষেরও দোকান র'য়েছে; দু'চারটী হীরা জহরতের দোকানও আছে। বর্ম্মার প্রায় সব সহরেই মণি, পান্না, চুণীর দোকান দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কারণ বর্ম্মীরা যেমন অবস্থাশালীই হউক না, কেন, কিছু পয়সা হ'লেই মেয়েরা দু'একটি হীরার আংটি কিনবে; অবস্থাপন্ন হ'লে ত' কথাই নেই। বাঙলার অনেকে বোধ হয় হীরা-মুক্তা চোখেও দেখেনি, এদেশে কিন্তু অতি সাধরণেরও ঐরূপ কোনও একটী মূল্যবান জিনিষ রয়েছে। অবশ্য এরা পয়সা জমাবার বিশেষ পক্ষপাতী নয়। বাজারের একটী সুন্দর ব্যবস্থা দেখ্‌লুম,—প্রত্যেকটি জিনিষই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়। এখানেও জলখেলার ভিড় জমেছে মন্দ নয়। আমরা ফিরে রিক্সাওয়ালাকে "সোয়েমাডো" প্যাগোডায় যেতে বল্লুম; সেখানে কয়দিন যাবৎ উৎসব ও মেলা হচ্ছে।

এবার সহরের মাঝের রাস্তাটী দিয়ে সোজা পূর্বদিকে চলেছি। রাস্তার ধারে সব উকীল, ডাক্তার বা বড়লোকের বাড়ীগুলি সুন্দরভাবে সাজান র'য়েছে। কোনও বাড়ীতে গ্রামোফোনে বর্ম্মী-গান চলছে—দু'চার জন বাঙালীও রাস্তায় দেখ্‌লুম। পূর্ব্বেই শুনেছিলুম—এ সহরে কয়জন বিশিষ্ট বাঙালী উকীল, কেরাণী ও ডাক্তার রয়েছেন; এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গে কারো পরিচয় হয় নি। বাজার পার হ'য়ে এসে রাস্তার দক্ষিণ পাশে দেখ্‌লুম, মিউনিসিপ্যাল অফিস। নিকটেই পোষ্ট অফিস, আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতে হাসপাতাল, অদূরে কোর্ট। এবার তিনটী রাস্তার মোড়ে এসে উপস্থিত হ'লুম, মাঝখানে একতলা একটী সুসজ্জিত পাকা বাড়ীতে সর্ব্বসাধারণের জন্য জল-সত্রটী আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। বিভিন্ন জাতের লোকের জন্য বিভিন্ন স্থানে

ভারে ভারে জল সজ্জিত র'য়েছে। পাশে পানপাত্রও আছে—যার ইচ্ছা পান কর, দিবারাত্রিই উন্মুক্ত।

এখন প্যাগোডার দিকে চলেছি। অনেক দূর থেকে মন্দিরের গগনস্পর্শী স্বর্ণ চূড়া দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম কর্‌লুম। রাস্তায় দলে দলে লোক মন্দিরের দিকে যাচ্ছে ও ফিরে আস্‌ছে—দূর হ'তেই জনকোলাহল শোনা যাচ্ছে। এবার অনেকটা কাছে এসেছি। অনতিদূরে দু'টী বিরাট ড্রাগন, মন্দিরের সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে র'য়েছে। সম্মুখের বড় রাস্তাটীর দু'ইদিকেই মেলা বসেছে। নানা রকম বর্ম্মী খাবারের দোকান ও মনোহারী দোকান,—খেলনা, পুতুল প্রভৃতি কত রকমের যে কত জিনিষ বিক্রী হচ্ছে! জুয়াড়ীদের আড্ডাও বসেছে। একপার্শ্বে একটী বিরাট তাঁবুতে বর্ম্মার বিখ্যাত "সাম্পে পোয়ে" নর্ত্তকীদল সন্ধ্যা হ'তে ভোর পর্য্যন্ত তাদের নৃত্যনৈপুণ্যে ও গান-বাজনায় লোকদের মোহিত ক'রে রেখেছে। তাদের ওখানে প্রবেশ-মূল্য আট আনা ও এক টাকা। অপর ধারে ছোট একটী তাঁবুতে নানারকম ম্যাজিক ও শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে পয়সা নিচ্ছে। এদের সঙ্গে বাজনাও চল্‌ছে; দিনরাতই খেলা চল্‌ছে, লোক-সমাগমও হচ্ছে বেশ। পুলিশের দল রাস্তায় গাড়ী, মোটর ও জনতা নিয়ন্ত্রিত কর্‌ছে। আমরা রিক্সা হ'তে নেবে এই জনতার ভিতর দিয়ে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লুম। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে চলেছি। উভয় পার্শ্বে ফুল, বাতি ও ধূপ বিক্রীর জন্য বর্ম্মী মেয়েরা সেজেগুজে দোকান সাজিয়ে বসেছে। আজ তাদের অপূর্ব্ব পোষাক-পরিচ্ছদে উৎসব-আনন্দেরই সাড়া দিচ্ছে,—যাত্রী দেখ্‌লেই আহ্বান কর্‌ছে। আমরা মাঝ রাস্তার একটী দোকান থেকে ধূপ, বাতি ও ফুল কিনে নিলুম। একটু পরেই সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে প্রধান মন্দিরতলে উপস্থিত হ'লুম। সাম্‌নেই মন্দিরগাত্রে একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্বস্তিক আসনে সমাসীন। আশেপাশে কয়েকটী মূর্ত্তি একইভাবে স্থাপিত। সম্মুখে পুষ্পাধারে নানা জাতীয় পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত।

আলোকাধারে শত শত আলো জ্বল্‌ছে। ধূপের স্নিগ্ধ গন্ধ ও কুসুমের সৌরভ সবারই প্রাণ বিমোহিত ক'রে কেমন একটা পবিত্রতার ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে। সাম্‌নে ব'সে যুক্তকরে শত শত ভক্ত প্রার্থনা কর্‌ছে। আমরাও ধূপ-দীপ জ্বেলে, পুষ্প গুচ্ছ সাজিয়ে অবনত মস্তকে প্রণত হ'য়ে দেবতার কাছে প্রাণের নিবেদন জানালুম। এদের মন্দিরে কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।

একটু পরে ওখান হ'তে বাইরে এসে দক্ষিণ পাশ দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে অগ্রসর হ'লুম; ঊর্দ্ধে ঐ আকাশচুম্বী মন্দিরের সুবর্ণ-চূড়া আর নিম্নে তার চারি-দিকে ঘিরে শত শত নানা ভাবের বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত। সাম্‌নে প্রশস্ত পথটী চারিদিক ঘিরে চলেছে।

এই মন্দিরে এলে ঠিক রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডার কথাই মনে হয়। একই রকমের তৈরী, এরও বিস্তৃত প্রাঙ্গন প্রাচীরবেষ্টিত। চারিদিকে চারিটী প্রবেশ-দ্বারও র'য়েছে, সবই এক রকম। এ মন্দির-প্রতিষ্ঠায়ও যথেষ্ট ধনরত্ন মন্দিরগর্ভে প্রোথিত করা হ'য়েছিল। এদেশে এক প্রবাদ আছে, যে মন্দির যত বেশী ধনরত্ন দ্বারা তৈরী হবে, সে মন্দির তত বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। সে তুলনায় এই সোয়েমাডো প্যাগোডা নেহাৎ কম নয়। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে এদেশীয় দু'জন বণিক ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দু'টী কেশ অতি যত্নে ভারতবর্ষ হ'তে এদেশে নিয়ে আসেন। এ সংবাদ প্রচারিত হ'তেই দলে দলে লোক তাঁদের কাছে যায়। তাঁরা 'থিনগাপুর' নামক স্থানে দু'টী মন্দির স্থাপন ক'রে তার পূজা করেন। রাজা থামানাটাও গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে পূজা করেন; এবং কিছুদিন পরে বুদ্ধদেবের আদেশ অনুযায়ী বণিকদের নিয়ে এই কেশপেটিকা হানতোয়াডী নিয়ে আসেন। বহু অর্থব্যয়ে ঐ কেশ ভিত্তি ক'রেই এই সোয়েমাডো প্যাগোডা তৈরী করা হয়। থিনগাপুর হ'তে তাঁদের এখানে পৌঁছাতে তেরো-চোদ্দ দিন সময় লেগেছিল। তাঁরা যেখানে বিশ্রাম ক'রেছেন, সেখানেই স্মৃতি মন্দির তৈরী হয়েছিল। আজও তার দু'একটি

মন্দির বিদ্যমান রয়েছে। এই সোয়েমাডো মন্দিরের উচ্চতা ধরাপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে পাঁচ শ' হাত ব'লে প্রবাদ।

আজ উৎসব উপলক্ষে মন্দির-প্রাঙ্গনে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হ'য়েছে—দূরপল্লী হ'তেও বহু ভক্ত এসেছেন। গান বাজনা ও নাচ চল্‌ছে। দলে দলে গায়ক ও বাদক সুন্দর ও চাকচিক্যময় পোষাকে সুসজ্জিত হ'য়ে অপূর্ব্ব নৃত্য ও গানে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছে। আমাদের তিন মূর্ত্তির এ জনতায় হারিয়ে যাবার জোগাড়। অতিকষ্টে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে এলুম। বর্ম্মী ছোটশিশু হ'তে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত উৎসব-আনন্দে মত্ত। কেউ বা দেবতার সম্মুখে ব'সে, কেউ বা দূর হ'তে মালাজপে মগ্ন। ভিক্ষু ভিক্ষুণীও এসেছে অনেক। বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলুম, দু-একটী খাবারওয়ালা ছাড়া এ মন্দিরতলে শতকরা নিরানব্বই জন ব্রহ্মবাসী। আমাদেরও প্রাণে বেশ আনন্দ হ'ল। এবার মন্দির থেকে বেড়িয়ে এলুম। বেলা প্রায় এগারোটা হ'য়েছে। রিক্সাওয়ালা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। একজন বন্ধু বল্লেন, "এখন কিছু খাবার পেলে ভাল হয়।" অপর একজন বল্লেন, "চল হে, এ দিক্‌কার যা-কিছু দেখ্‌বার র'য়েছে তা দেখা শেষ করে ষ্টেশনে গিয়ে খাওয়া যাবে।" রিক্সাওয়ালাদের পূর্ব্বেই বলা ছিল। এবার তারা এই প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ দিক দিয়ে পশ্চাৎ দিকে এগিয়ে চলেছে। এই রাস্তার ধারে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার র'য়েছে। এতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীও র'য়েছে অনেক। আমরা অপর একটা প্রাচীন মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হ'লুম। এ মন্দিরটী একটী উঁচু টিলার উপর স্থাপিত। লৌহস্তম্ভের উপর টিন দিয়ে তৈরী, আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চারদিক ঘুরে দেখ্‌লুম। মন্দিরের ভিতরে কতকগুলি সুন্দর ছবি র'য়েছে। সুদক্ষ শিল্পী তার তুলিতে ব্রহ্মরাজ-কাহিনী ও ধর্ম্ম-কাহিনী এমনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে, দেখ্‌লে সত্যই মুগ্ধ হ'তে হয়। এ মন্দিরটীর আশে-পাশে বাড়ীঘর তেমন নেই,—জংলা ও প্রান্তর-ঘেরা।

আমরা রিক্সায় উঠে' উত্তরদিকের একটী সুন্দর রাস্তার সিভিল লাইনের মাঝ দিয়ে সহরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লুম। এখানে কমিশনারের বাড়ী।

এইটিই হ'ল সহরের পূর্ব্ব সীমা। নিবিড় প্রান্তরের মাঝে মাঝে উচ্চ ভূমিতে সরকারী দু'চারটী বাড়ী। রাস্তাগুলি সুন্দররূপে কাঁকর দিয়ে বাঁধান। সহরের এই দিক্‌টাই নির্ব্বাক বনানীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অবদানে সমৃদ্ধ। আশে-পাশে ধান্যক্ষেত্র, নদী-নালাও আছে। সহরের সঙ্গে গ্রাম্য নীরবতা যেন মিশে র'য়েছে—তাই এ সহরের এই সৌন্দর্য্য প্রাণ মুগ্ধ করে।

আমরা বৃক্ষাচ্ছাদিত ছায়া-শীতল বাঁধান পথে গ্রাম্য আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে সরকারী অফিসের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'লুম। এ রাস্তাটী দিয়ে পিনতাজা, টাঙ্ পর্য্যন্ত মোটর-বাস সর্ব্বদাই যাওয়া-আসা করছে। নিকটেই অপর একটী রাস্তায় তানপিন পর্য্যন্ত মোটর-বাস যাচ্ছে। অবশ্য পেগু হ'তে এসব স্থানে ট্রেনেও যাওয়া যায়। এখানকার অফিসের বাড়ীঘরের নূতনত্ব কিছুই নেই। ব্রহ্মদেশের জেলার সদর রাস্তাগুলি সবই প্রায় একই রকম। অপর পার্শ্বে সরকারী স্কুল ও খেলার মাঠ। অদূরে এ. বি. এম. স্কুল।

আদালতের সামনে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ দেখে অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। প্রাণে কত পুরানো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে দিল। এই স্তম্ভটীর গায়ে চোল রাজবংশের রাজেন্দ্র চোল প্রমুখ তিন জন রাজার নাম লেখা র'য়েছে। এখানে যে তাঁরা রাজ্য বিস্তার ক'রে বহুদিন রাজত্ব ক'রেছিলেন, তার জীবন্ত সাক্ষীস্বরূপ ঐ স্তম্ভটী দাঁড়িয়ে আছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই পেগুতে (হানতোয়াডীতে) ভারতীয় দু'তিনটী রাজবংশ পর পর রাজত্ব ক'রেছেন, তার কীর্ত্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ অনেকগুলি এখানে বিদ্যমান আছে। সর্ব্বশেষে বোধ হয় ব্রহ্মরাজ "আলং ফায়ার" হাতে চোল রাজবংশ বিজিত হয়। ভারতের সহিত ব্রহ্মের যে বহু পূর্ব্বকাল হ'তে একটা সম্বন্ধ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ এদেশে র'য়েছে। এই বিখ্যাত পেগু নগরী অনেকগুলি রাজত্বের উত্থান-পতনের স্মৃতি-বিজড়িত। আজ এখানে দাঁড়িয়ে সেই অতীত ভারতীয় রাজগণের পুণ্যস্মৃতি এদেশেও যে অঙ্কিত র'য়েছে, এই চিন্তা ক'রে প্রাণমন অপার আনন্দে নেচে ওঠে। ভারতবাসী এই

নূতন বিজ্ঞান-যুগের বহু পূর্ব্বেই সাগর ডিঙিয়ে এসে এদেশে রাজ্যবিস্তার ক'রেছিলেন।

এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে পূর্ব্ব পরিচিত রাস্তায় ষ্টেশনের দিকে এলুম। আজ এদের উৎসব শেষ হবে, তাই দলে দলে যাত্রী ফিরে যাচ্ছে। আজকের মত স্নানের কথাটা ভুলে ষ্টেশনে ব'সেই তিনজনে আহার সমাপন করা গেল। রিক্সাওয়ালারা কাফি-রুটি খেয়ে বিশ্রাম ক'রে হাসিমুখে বল্লে, "বাবুজী, 'সোয়ে ফায়া' দেখবে না?" আমরা বল্লুম, "নিশ্চয়ই, একটু রোদ কমে যাক।" আজ রৌদ্রের উত্তাপটা যেন একটু বেশী; কারণ গতকাল বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে উত্তাপটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কিছু সময় বিশ্রাম-আলাপে কাটিয়ে প্রায় দু'টোর সময় সোয়ে ফায়া দেখতে চল্লুম। ষ্টেশনের পুলটার উপর হ'তেই ঐ মন্দিরটা দেখা যায়। শুনেছি, রাত্রিতে ঐ দেবালয়ের আলোক-সজ্জা বড়ই সুন্দর। শত শত বিজলী বাতি সারি দিয়ে জ্বলে উঠে' বহুদূর থেকে দর্শককে মুগ্ধ করে। আমাদের সেই রিক্সাওয়ালারাই ষ্টেশনের পশ্চিমদিকের রাস্তাটি দিয়ে নিয়ে চলেছে। কিছুদূর এগিয়ে চারটা রাস্তার সংযোগ-স্থলে উপস্থিত হয়ে আমরা পশ্চিমদিকের ইটের নির্ম্মিত পুলটা পার হ'য়ে সোজা পথেই চলেছি। উভয় পার্শ্বে লতাবীথিকাপ্রচ্ছন্ন নিবিড় বনানীর সৌন্দর্য্য। শস্যক্ষেত্রে গো-মহিষ বিচরণ করছে, মাঝে মাঝে দু'চারখানা ঘরও দেখতে পাচ্ছি। সোয়ে ফায়ার অতি নিকটেই রাস্তার ধারে দু'চারখানা দোকানে বর্ম্মীরা খাবার বিক্রী করছে।

আমরা দু'একটা বাঁক ঘুরে এবার ফায়ার প্রধান দুয়ারে এসে উপস্থিত হ'য়ে রিক্সা হ'তে নেমে দেবতা-দর্শনে অগ্রসর হলুম। এ ফায়ার নাম সোয়েথোলিঙ ফায়া, অর্থাৎ শায়িত বুদ্ধদেব। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত জগদ্বিখ্যাত দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আজ উপস্থিত হ'য়েছি, তাই বড়ই আনন্দ হচ্ছে। এদেশের চিরন্তন প্রথানুযায়ী মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বেই পাদুকা ত্যাগ ক'রে এসেছিলুম। আমাদের মত যাত্রী দেখে বর্ম্মীরা অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। সিঁড়িতে উঠ্‌বার পূর্ব্বেই দেখ্‌লুম, সম্মুখে সুদৃঢ় লৌহস্তম্ভের উপর টিনের ছাউনী দেওয়া সুবৃহৎ গৃহ। তন্মধ্যে

বিরাট বেদীর উপরে বুদ্ধদেবের বিশালকায় শায়িত মূর্ত্তি র'য়েছে। এখান হ'তেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দেবতার চরণ সান্নিধ্যে এগিয়ে চল্লুম। দুই পার্শ্বের ফুলের দোকান হ'তে বর্ম্মী রমণীগণ ফুল কেনবার জন্তে আহ্বান করতে লাগল। একটি দোকান হ'তে দেবতাকে অর্ঘ্য দেবার জন্তে ফুল, বাতি, ধূপ কিনে নিলুম—এদেশের প্রায় মন্দিরেই এই ব্যবস্থা। এবার আমরা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে একেবারে দেবতার সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়ে অবাক্ বিস্ময়ে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইলুম, মুখে আর বাক্যস্ফূরণ হ'ল না, একেবারে স্তম্ভিত হলুম। প্রাণের ভিতর একটা ভাবের উৎস ব'য়ে গেল। এ দেবতাকে দেখতে হ'লে মাথা উঁচু ক'রে চাইতে হয়—এ যেন ছোটো খাটো একটা পাহাড় পড়ে র'য়েছে।

আমাদের তিন বন্ধুরই এক অবস্থা। কারণ এতদিন যা কল্পনার চোখে দেখে এসেছি, আজ সম্মুখে তাকে সত্য প্রত্যক্ষ করছি। এত বড় বিরাট প্রশান্ত মূর্ত্তি জীবনে আর কখনো দেখিনি, ধারণাও করতে পারিনি। খানিক পরে দেবতার সম্মুখে প্রণত হ'য়ে প্রাণের আবেদন জানিয়ে সম্মুখের পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ সাজিয়ে, দীপ ধূপ জ্বেলে, পুনরায় প্রণতচিত্তে প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা জানালুম, "হে বিরাট দয়াল দেবতা! আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা দূর ক'রে, তোমার বিশাল বক্ষে স্থান দাও,—আর যে ফিরে যেতে মন চায় না।" এই ভাবে একস্থানে কিছুক্ষণ কেটে গেল। আশে-পাশে বর্ম্মী ও চীনা ভক্তগণ দলে দলে আস্‌ছে এবং প্রণাম ও প্রার্থনা করছে। এবার আমরা দেবতার চারদিক প্রদক্ষিণ ক'রে এলুম। ঐ বিরাট মূর্ত্তিটী পূর্ব্বদিকে মুখ ক'রে,—দক্ষিণ দিকে মস্তক রে'খে কাৎ হ'য়ে একটী বেদীর উপর নির্ব্বিকার শান্তভাবে শায়িত। এ বিরাট দেবতার গঠন-ভঙ্গী খুবই স্বাভাবিক ও সুন্দর। জানিনা কতকাল পূর্ব্বে, কোন্ রাজার বহু অর্থব্যয়ে, কোন্ অজ্ঞাত সুদক্ষ শিল্পী এই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন—যা দেখে আজ বিশ্ববাসী বিস্মিত ও স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছে। প্রথম দেখে প্রস্তরমূর্ত্তি বলে ভ্রম হয়; প্রকৃতপক্ষে এ মূর্ত্তি ইটের নির্ম্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮৩ ফিট; বেষ্টন ২১০ ফিট;
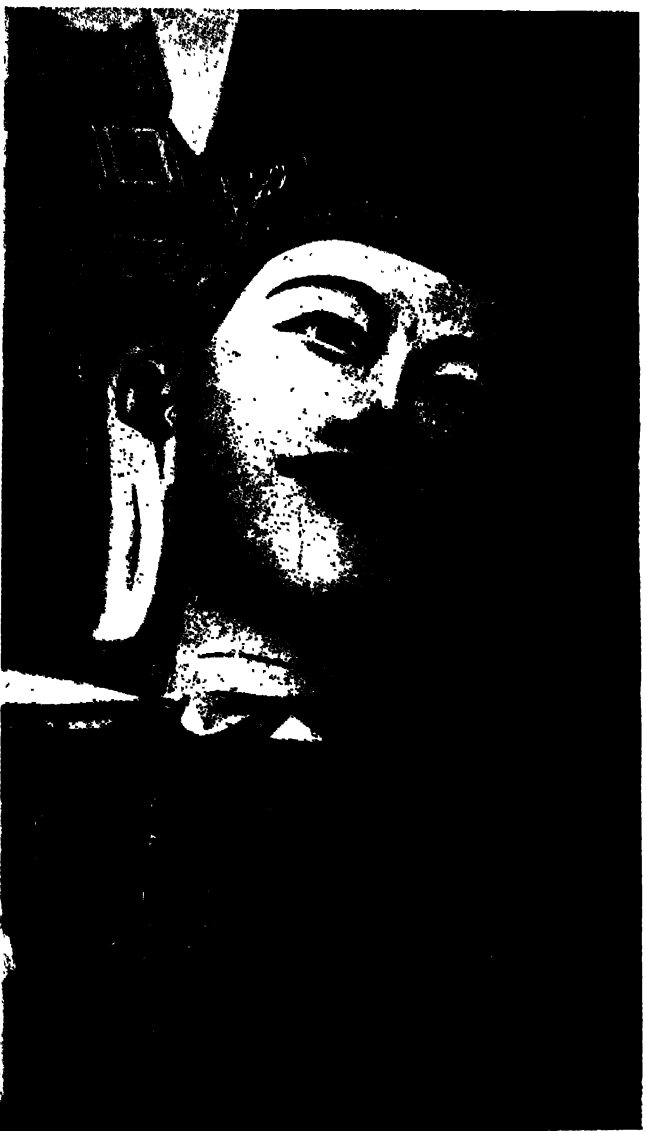
পেগুতে জগতের বৃহত্তম শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি। শুধু মুখখানাই দেখা যাইতেছে।
শায়িত অবস্থায় এই বিরাট বিগ্রহের দৈর্ঘ্য ১৮৩ ফিট।

চক্ষুর দৈর্ঘ্য ১৬ ফিট ; নাসিকা ১৮ ফিট। এক স্কন্ধ হ'তে অপর স্কন্ধ ৪৮ ফিট। বর্ম্মার রেলওয়ে লাইন তৈরী হবার সময়, জঙ্গলের ভিতর এ মূর্ত্তিটীর সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এ দেবালয় ট্রাষ্টিদের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত। ব্রহ্মবাসিগণ এ মূর্ত্তিটী বড়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। বহুদূর হ'তে ভক্তগণ এসে কোনও কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই দেবতার সম্মুখে প্রার্থনায় মগ্ন হন। আমরা প্রায় একঘণ্টা এই বিরাট বিগ্রহের সাম্‌নে মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীতলে ব'সে দেবতার কথা ভাবতেই আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হ'লুম। মাঝে মাঝে দেখ্‌ছি ভক্তগণ এসে ঝাড়ু দ্বারা মন্দির-প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্ন কর্‌ছে—এও এদের ধর্ম্মকাজ। এবার বন্ধুদের সঙ্গে ক'রে পুনরায় ভক্তিনত চিত্তে প্রণত হয়ে ফিরে চল্লুম। যাত্রী-সমাগমও বেশ হচ্ছে। বাইরে এসে রাস্তার নিকট পুকুর-ধারে গিয়ে দেখলুম—সবাই মুড়ি-খৈ কিনে জলে দিচ্ছে—দলে দলে মাছ এসে খেয়ে যাচ্ছে। এ পুকুর থেকে কেউ কখনও মাছ মারতে পারবে না। আমরাও কিছু কিনে মাছের আহার যোগালাম —এও বর্ম্মীদের এক অহিংসা ধর্ম্ম। পরে রিক্সায় উঠে পূর্ব্বপথে ষ্টেশনেই ফিরে এলুম। আজ রাত্রে এখানেই বাস করব।

সুইজিন শহর

পেগুর জগদ্বিখ্যাত বিরাট বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি দর্শন ক'রে পরদিনই সকালের ট্রেনে নেংলাবিন রওনা হলুম। পেগু ষ্টেশন ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই রেল লাইনের পূর্ব দিকে শস্যশ্যামল বিস্তৃত প্রান্তরের অপর পারে বনানীর সবুজ শোভায় শোভিত নীরব গম্ভীর উঁচু পাহাড়পুঞ্জের দিকে আমার মন আকৃষ্ট হ'ল— অবাক্ হয়ে মুগ্ধ নয়নে সেদিকে চেয়ে রইলুম। জানিনা কেন যে মানব-প্রকৃতির একটি বিশেষ আকর্ষণ র'য়েছে এই গভীর গিরিশৃঙ্গ এবং নিঃসীম সাগরের প্রতি। গাড়ীতেই একজন বর্ম্মী যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম ওটা কোথাকার পাহাড়, ওখানে কোন পল্লী বা সহর আছে কিনা। সে তার ভাষায় বল্‌লে ওটা সুইজিন পাহাড়ের সারি, সিটান নদীর অপর পারে ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে একটা সুন্দর সহর র'য়েছে, তার নাম 'সুইজিন'; ঐ পাহাড়েই কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ম্মী-বিদ্রোহীরা আশ্রয় নিয়েছিল। বর্ম্মী যাত্রীটি আরামে তার চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঐ জায়গার আরও সুন্দর বর্ণনা করতে লাগল। তার কথা শুনে সত্যি একবার ঐ সহরটা দেখবার ইচ্ছা হল। নেংলাবিনের দিকে যতই এগিয়ে আসছি ঐ ঢেউ-খেলান পাহাড়ের সারি যেন আরও মনোমুগ্ধকর বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

বেলা প্রায় দেড়টায় নেংলাবিন সহরে এসে পৌঁছলুম। মিঃ রায় পূর্ব্ব হ'তেই আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তারই বাসায় গিয়ে স্নান আহার সমাপন করলুম। বিকেলে মিঃ রায়ের সাথে নেংলাবিন সহরটা দেখতে বের হলুম। এটা পেগু জেলার একটা সাবডিভিশন। কোর্ট, হসপিটাল, জেল, স্কুল, মিউনিসিপ্যাল অফিস, বাজার ইত্যাদি সবই বর্ম্মার অপর সহরের মতই; বাড়ী ঘর গুলিও একই ভাবে তৈরী। রাস্তা-ঘাট তেমন মন্দ নয়। এ সহরে কতক ভারতীয় আছেন; কেউ বা উকিল, ডাক্তার, কেরাণী, আবার কতক বা ব্যবসায়ী। চেট্টিদের ব্যাঙ্কও

আছে। বর্ম্মীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যে, উকিল, কেরাণী, পুলিস নানা কাজেই র'য়েছে। এখানকার বর্ত্তমান এস্-ডি-ও আরাকানীজ। সম্পূর্ণ সহরটী ঘুরে এলুম; সহরের পাশে দুই তিনটি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির—বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। আবার পাদ্রীদেরও দুই তিনটি স্কুল, তারা বর্ম্মীদের ভিতর খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা কর্‌ছে। এই সহরের সুন্দর বড় বড় বাড়ীগুলি প্রায়ই কাঠের তৈরী, দু'চারটী পাকা বাড়ীও র'য়েছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সাথেই বৈদ্যুতিক আলোকমালা সহরকে আলোকিত ক'রে দিল। ব্রহ্মদেশে এই বিশেষত্বটী প্রায় সব সহরেই আছে—এমন কি পল্লীগ্রামের মন্দিরগুলিতেও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা র'য়েছে। আমরা ঘরে ফিরে এলুম। রাস্তায় দু'চার জন ভারতীয়ের সাথে আলাপ পরিচয় হ'ল। ঘরে ব'সে মিঃ রায় এবং আরও কয়েক জনের সাথে এখানকার অনেক গল্প গুজব হ'তে লাগল। বর্ম্মী বিদ্রোহীদের কথা হ'তেই একজন সাম্‌নের দেয়ালঘেরা সরকারী জেলটি দেখিয়ে বল্লেন, "ঐখান হ'তেই সেবার একদিন প্রায় ৪০।৫০ জন বর্ম্মী রাজদ্রোহী একসঙ্গে দিন-দুপুরে অতি দুঃসাহসিকভাবে কতকগুলি, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত ক'রে সুদক্ষ প্রহরীদের সম্মুখ হ'তে নির্ভীকভাবে বেরিয়ে এসে পূর্ব্বদিকের ঐ পাহাড়ে চলে গেল। কেউ তাদের অবরোধ কর্ত্তে সক্ষম হ'ল না। সেদিন এ সহরে সরকারী রক্ষী পুলিশ থাকা সত্ত্বেও যেরূপ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা একমাত্র স্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত কেউ বুঝতে পারবে না। ভয়ে আমরা খানিকক্ষণ দরজা বন্ধ করে ভাবছিলুম ঐ সহরটা বুঝি এবার বিদ্রোহীদের হাতেই! আমি শুনে ত' অবাক্, ব্রিটীশ সিংহের এত শাসন-সংরক্ষণের ভিতর হ'তেও এমনি ব্যাপার হয়ে গেল! তিনি আরও বলতে লাগ্‌লেন, "তখন নিত্যই খবরের কাগজে দেখেছি উপর ও নিম্ন কয়টী জেলায় প্রায়ই আজ এখানে কাল ওখানে বিদ্রোহীদের আক্রমণ, লুণ্ঠন নিয়মিত চল্‌ছিল। সরকারী সুদক্ষ ফৌজ এদের শাসন করবার জন্য দলে দলে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে ও কয়েক স্থানে গুলি বর্ষণ করে; কিন্তু তাতেও ওদের বিক্রম মোটেই কম্‌ল না, ওরা বরং পাল্লা

দিয়ে গুপ্তভাবে পাল্টা উপদ্রব চালিয়ে সৈন্যদলকে ব্যস্ত করে তুলছিল। তখন গল্প শুনতুম বিদ্রোহী-দলপতি নাকি খুবই সুচতুর দুর্দ্দান্ত—জোর ক'রেই গ্রাম হ'তে জোয়ান জোয়ান লোকদের তার দলে টেনে নিয়ে বিদ্রোহী দলের একটা ছাপ তার শরীরে লাগিয়ে দিত; এবং পাহাড়ী অঞ্চলে সে অনেক গুপ্ত আড্ডা স্থাপন করেছিল। পরে অবশ্য ব্রিটিশ সরকার কিছু দিনের চেষ্টায় বহু সৈন্য সামন্ত চারদিকে পাঠিয়ে গ্রামের পর গ্রাম তাড়া ক'রে শত শত দস্যুকে পাকড়াও ক'রে বিচারে ফাঁসী দিয়ে, জেল ও দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে তবে দেশে শান্তি স্থাপন করেছিল। শুনেছি বিদ্রোহী নেতা সায়াসাণও নাকি ধরা পড়েছিল—বিচারে চরম শাস্তিই সে পেয়েছে।

খবরের কাগজে অবশ্য এ সংবাদ পূর্ব্বে দেখেছিলুম, কিন্তু আজ যে প্রত্যক্ষ সে-স্থানেই উপস্থিত! আমি আগ্রহাতিশয্যে ঐ ব্যাপার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করলুম, "ঐ পাহাড়ের নিকটেই কি সুইজিন শহর?" তাঁরা বল্লেন, "হাঁ, ঐ পাহাড়েই, ঐ দলের একটা আড্ডা ছিল।" ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে জানলুম যে এই নেংলাবিন ষ্টেশন হ'তেই একটি ব্রাঞ্চ লাইন সীটান নদীর তীরে "মাডক" পর্য্যন্ত গিয়েছে। প্রত্যহ তিনবার ক'রে গাড়ী যায়-আসে,—খুব বেশী দূরের পথ নয়।

মাডক হ'তে মোটর বোটে, নৌকায় অথবা পায়ে হেঁটে সুইজিন যাওয়া যায়। আমার কিন্তু সকল কথার ভিতর ঐ সুইজিন শহর দেখবার ইচ্ছাটাই প্রবল ভাবে মনে জেগে উঠলো। আরও খানিকক্ষণ বিশ্রাম-আলাপে কাটিয়ে পরে রাত্রির আহারাদি সমাপন ক'রে ঘুমিয়ে পড়লুম।

দু'তিন দিন পর নেংলাবিন হ'তে একদিন দুপুরের গাড়ীতে সুইজিন দেখ্‌বার জন্য মাডক রওনা হলুম। মাত্র তিন চার খানা গাড়ী একটী ছোট ইঞ্জিনে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চল্ল। মাঝ পথে স্থানীয় লোকদের জন্য একটী ছোট ষ্টেশন আছে। সুইজিন শহর হতে বহুলোক এই গাড়ীতে যাওয়া-আসা করে এবং ঐ সব পাহাড়ের উৎপন্ন ফসল সহরে চালান দেয়। ট্রেন চলবার পূর্ব্বে গরুর গাড়ীতে

লোকজন যেত-আসত, এক ঘণ্টার মধ্যেই এই লাইনের শেষ ষ্টেশন মাডকে এসে পৌছলুম। পাশ দিয়ে বিখ্যাত সীটান নদী বয়ে যাচ্ছে, অপর পারেই সেই পর্ব্বত-শ্রেণীর নীরব শোভা এত নিকটে দেখে মন আরও উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো— সহরটী কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এখানে একজন বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করলুম। তিনি খুব যত্ন করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন—সুইজিন দেখ্‌তে যাবো শুনে তিনি বল্লেন—"ও আর কি! আধ ঘণ্টার পথ, কাল যাবেন"—তাঁর কথাই রইলো।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সীটান নদীর তীরে খানিকটা বেড়িয়ে দুই একটী বর্ম্মা পল্লীর ভিতর দিয়ে ঘুরে এলুম। পল্লীবাসীদের বৈকালিক আহারের সময় হয়েছে—তাই সব ঘরেই ছেলে বুড়ো সবাই মিলে আধহাত উঁচু একখানা গোল টেবিলের উপর আহার্য্য রেখে চারদিকে ঘিরে বসেছে, কেউ বা কর্ম্মক্লান্ত দেহে একটু জিড়িয়ে স্নান ক'রে খেতে আস্‌ছে, আবার কেহ আহার শেষ ক'রে দল বেঁধে সেজেগুজে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গল্পে মস্‌গুল্‌ হ'য়ে বেড়াতে বেরুচ্ছে। সন্ধ্যার পরেই হল এদের আনন্দ আমোদের সময়। সকাল আটটার ভিতর এবং বৈকালে পাঁচটায় এদের আহারের সময়—টিফিন এদের সারাদিনই চলে, আহারের পর সবাই চা ও চুরুট টেনে আরাম করে। গ্রামের ঘরগুলো সবই একই ভাবের তৈরী—কাঠের উঁচু মাচা বাঁধা ; তবে অবস্থা বিশেষে একটু বড় ছোট —এই যা প্রভেদ। গৃহ-সজ্জা তেমন কিছু না থাক্‌লেও পোষাকের পারিপাট্য যথেষ্ট। গ্রাম্য লোক খেটে খুটে কাজকর্ম্ম ও ছোট খাট ব্যবসা করে খায়— কারও বা হাল-গরুও আছে। এখানে নদীটি তেমন প্রশস্ত নয়, তবে জলস্রোত প্রবল। শুন্‌লুম গ্রীষ্মকালে এর জল অনেকটা কমে যায়। এখান হ'তে নীচে বা উপরের দিকে বিভিন্ন স্থানে জলপথেই যেতে হয়। প্রত্যহ একখানা লঞ্চ নিম্নের দিকে "ডাওজি" পর্য্যন্ত যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে। অবশ্য এখানকার ট্রেন ধরবার জন্যই তার সময় নির্দ্ধারিত। অপর একখানা সপ্তাহে দুইদিন এখান হ'তে আরো নিম্নে "মিচোর" দিকে যায়। মোটরবোট, দুই বেলাই সুইজিন

হ'তেই যাত্রী নিয়ে আসছে ও যাচ্ছে। ষ্টেশনের কাছেই মাডক বস্তিটি,—বিশেষ বড় নয়। বর্ম্মা পাড়ার ধারেই দুই চার ঘর নোয়াখালীর মুসলমানও র'য়েছে, এরা সবাই কৃষিজীবী। নদীর ধারে তিন চারটী চালের কল ও কাঠচেরাই কল র'য়েছে। এর মালিক প্রায়ই চৈনিক—দু'একজন বর্ম্মীও আছে। ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লুম চালের কল-এর কাজ খুব জোরে চলছে, কাঠচেরাই কলের-এর ব্যাপার দেখে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম; বিরাট বিরাট কাঠগুলোকে কলের ভিতর দেওয়া মাত্র বক্র একখানা ছোট করাত বৈদ্যুতিক শক্তিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলছে—যেমন মাপের দরকার তেমনি ভাবে কেটে বেরিয়ে আস্‌ছে।

জোয়ান জোয়ান হাতীগুলো কাঠের কারবারীদের বিশেষ দরকারী। এরা খুব কাজ করে—প্রথমেই নিবিড় ঘন জংলা উঁচু পাহাড়ে শাল, সেগুন বড় বড় গাছগুলো কাটা হ'লে ঐ গভীর অরণ্য হ'তে একমাত্র হাতীর সাহায্যেই সেগুলোকে টেনে নীচুতে পাহাড়ী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পরে ঐ সব কাঠ প্রবল স্রোতের টানে ভেসে আরও নীচুতে প্রশস্ত নদীতে আসে; সঙ্গে প্রহরী থাকে। পরে ঐ গাছগুলো একসঙ্গে বেঁধে বড় বড় বাঁশের চালির সাথে (বাঁশের বোঝায়) বেঁধে ভাসিয়ে বিভিন্ন নদী-পথে দুই তিন মাসে এক একটি বন্দরে বা সহরে এসে পৌছোয়। গাছগুলো ভাসিয়ে আনার সাথে লোক থাকে, তাদের আহার-নিদ্রাও ঐ ভাসান গাছের উপরেই হয়। এরা সাধারাণতঃ পাহাড়ী লোক —খুবই কষ্টসহিষ্ণু ও একাজে খুব মজবুত। তারা জোয়ার ভাটা দেখে গাছগুলো ভাসিয়ে নিয়ে আসে। কাঠগুলো সহরে বা বন্দরে আসার পর আবার হাতী দিয়ে সে কাঠগুলো নদী হতে টেনে গুদামে নিয়ে রাখা হয়; বর্ত্তমানে কোথাও কোথাও ক্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাতেই সব কাজ করা হয়। কিন্তু পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে সঙ্কীর্ণ পথে কাঠগুলোকে নামিয়ে আনতে একমাত্র হাতীই ভরসা—ওখানে আর কোন কিছুর সাহায্য চলে না। হাতীগুলোকে কাজ করবার সময় দেখলে মনে হয় যেন মানুষের মতই বুদ্ধি তাদের আছে। হাতীরা ঘণ্টা শুনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শুঁড় দুলিয়ে আনন্দে কাজ করতে যায় এবং রক্ষকের সব আদেশগুলি ইঙ্গিতেই

বুঝতে পারে। আবার বিশ্রাম-ঘণ্টার শব্দ শুনলে অমনি তারা কাজ ছেড়ে আনন্দে গা ভাসিয়ে নদীর জলে স্নান করে ; পরে আহার ও বিশ্রাম করতে চ'লে যায়।

পরদিন সকালে নয়টার ভিতরে আহারাদি সমাপন ক'রে একজন সঙ্গী নিয়ে এখান হ'তে হাঁটা-পথে 'সুইজিন' শহর দেখতে রওনা হলুম। মাডক হ'তে খেয়া নৌকায় সীটান নদী পার হ'য়ে নদীর ধার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে পূর্ব-দিকের মাঠের আলবাঁধা পথে এগিয়ে চলেছি—রাস্তাটি ঠিক বাংলাদেশের মেঠো পথের মত সরু নয়—বেশ প্রশস্ত, মাঝে মাঝে পাথর কেটে ইটের মত উঁচু করে সাজান রয়েছ, এতে বর্ষায়ও যেতে কোন অসুবিধা হয় না। নিকটে একটী বৌদ্ধ বিহারের পাশ দিয়ে চলেছি। দুই তিনজন ভিক্ষু গ্রাম্য ছাত্রদিগকে পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন। ২০।২৫টী ছাত্র—তারা অবাক্ হ'য়ে আমাদের পানে চেয়ে দেখছে আর বলাবলি করছে, "কালা" অর্থাৎ বিদেশী। আমরা নীরবে চলেছি—অতি নিকটেই সুইজিন পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পৌছুতে দেরী হচ্ছে। পাহাড়ের ধাঁধাঁ এইরূপই—দেখতে খুবই কাছে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। এবার আর একটি ছোট নদী খেয়ানৌকায় পার হ'য়ে মাঠের পথ হ'তে পল্লী পথে চলেছি। রাস্তা বেশ প্রশস্ত। এটি ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর তৈরী, বাংলার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড'কে এখানে ঐ বলা হয়। সুইজিন হ'তে এই হাঁটা-পথেই নিত্য সরকারী ডাক আসে ও যায়। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আর কতদূর।" সে বল্লে, "ঐ যে দেখা যাচ্ছে। আর একটি নদী পার হতে হবে।" আর পারেই পাহাড়ের কোণে সুইজিনের সুন্দর সহরটী দেখা যাচ্ছে। পথে দু'দশ জন বর্ম্মী পথিকের সাথে দেখা হ'ল, এরা গ্রাম্য লোক—হাতে, পায় সব উল্কি ছাপ দেওয়া, মুখে চুরুট জ্বলছে, হাতে একখানা বড় দা নিয়ে পথ চল্‌ছে। এ পারে দুই চারজন মুসলমান চাষীর সাথে আলাপ হ'ল ; এদেরও বাড়ী নোয়াখালী জেলায়। এরা এদেশে এসে প্রতি বছরই তামাক, ফুট, তরমুজ ইত্যাদি চাষ ক'রে বেশ দু'পয়সা উপায় করে। মাঝে একবার বর্ম্মীদের সাথে অমিল হওয়ায় অনেককে জমি-জিরাত ফেলে প্রাণের

ভয়ে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। আবার কেউ বা বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে ক'রে চাষ-বাস নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছে। তারা বল্লে এখানকার উৎপন্ন তামাক বর্ম্মা-বিখ্যাত, এর দামও বেশী। এই তামাকেই বর্ম্মার উৎকৃষ্ট চুরুট তৈরী হয়। এদের দেখে মনে হ'ল এরা বেশ আনন্দেই র'য়েছে।

আমরা নদী পার হয়ে সুইজিন শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। পথটী জুড়ে বেশ বড় রকমের একটি পান্থশালা, এদেশে একে "জিয়াত" বলে। ঐ ঘরের ভিতর দিয়ে রাস্তা সহরে চলে গেছে। আমরা সে পথেই চলেছি, সঙ্গী আমায় গল্পের ছলে বল্লে—এ সহরের 'সুইজিন' নাম সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে। সুইজিন অর্থে সুবর্ণময় সহর; পূর্ব্বে নাকি এ সহরের ধারে ঐ পাহাড়ী নদীর জলে সোনার রেণু কুঁড়িয়ে পাওয়া যেতো, তার জন্য এখানকার ঐ নাম। মনে হল এদেশের পক্ষে এ ব্যাপার অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়, কারণ এদেশে জলে, স্থলে, পর্ব্বতগুহায় অমূল্য সব রত্নরাজী, সোনা, চুণী, মণি আরও কত কি ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় মুসলমান চাষীরা এস্থানকে "সুদীন সহর" বলে। এ নদীর জল খুব পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর।

সহরের মাঝ দিয়ে বাজারে এলুম। পথে একদল সুন্দর পোষাক পরা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সাথে দেখা হল। তারা হাসি গল্প ক'রে বাড়ী ফিরে চলেছে; সবার হাতে বা কাঁধে ঝোলান একটী ব্যাগ, তাতেই বই খাতা সব র'য়েছে। কেউবা আনন্দে চুরুট টেনে চলেছে। আরও সব বুড়ো জোয়ানদেরও দেখলুম, যে যার কাজে ব্যস্ত, খেলা ধূলা হাসি তামাসা সর্ব্বত্রই চলছে। কেউবা আমাদের পানে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখ্ছে। বাজারের ভিতরে গিয়ে দেখ্লুম চারদিকে দেওয়াল-ঘেরা ভিন্ন ভিন্ন লাইনে বিভিন্ন জিনিষের দোকানগুলিতে বেচা কেনা চল্ছে, ক্রেতা, বিক্রেতা সবই এদেশীয়, দু'চার জন ভারতীয়ও আছে। মেয়েরাই এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সুপারগ। মাঝে মাঝে চায়ের দোকানগুলিতে খুব ভীড় জমেছে, হাসির হর্‌রাও চলেছে।

বাজার হ'তে বাইরে এসে পাহাড়-কাটা ঢালু লাল কাঁকুরে সুন্দর পথে এগিয়ে ঘুরে ঘুরে হাঁসপাতাল, কোর্ট, স্কুল, ডাকবাংলা, পোষ্টাফিস, মিউনিসিপ্যাল অফিস, খেলার মাঠ, ইত্যাদি সবই দেখে এলুম। সহরটি ছোট হলেও বড়ই সুন্দর ভাবে সাজান গোছান, পাহাড় কেটে সহর আরও বাড়ান হয়েছে। মাঝে মাঝে কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সুসজ্জিত কাঠের বাড়ীগুলি সত্যি যেন ছবির মত দেখাচ্ছে। প্রবেশ দুয়ারের ধারেই তাদের সৌখীন নানা জাতীয় লতা-বীথিকায় ঘেরা ফুলের বাগানে অজস্র ফুল ফুটে আছে,—বড়ই সুন্দর! উকিল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেক অবস্থাশালী লোকই এখানে বাস করেন। কয়টি সোজা রাস্তা সহরের মাঝ দিয়ে চলে গেছে, মিউনিসিপ্যালিটীর যে এ সহরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি র'য়েছে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরটী দেখ্‌লেই মনে হয় ; বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও এখানে আছে।

এখানকার স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল সুন্দর মানুষগুলোকে মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখলেই মনে হয় এরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে, অভাবের তেমন তাড়না নাই। সঙ্গী বল্লে, এখানকার তৈরী চুরুট এবং 'ফান্না' (জুতা) এদেশ বিখ্যাত। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যেই বেশী পয়সা উপায় করে। রাস্তায় যেতেই কয়েকটী চুরুট ও ফান্না তৈরীর কারখানা দেখলুম। অনেক বর্ম্মী মেয়ে পুরুষ ঐ সব জিনিষ তৈরী করছে, তেলেগু কুলীরা তাদের কাজে সাহায্য করছে ; এরা মাস মাইনের কুলী। কোন কোন গৃহস্থের চাষ-বাসও র'য়েছে। সঙ্গী এবার আমায় অপর পথে সহরের অদূরে খানিকটা উঁচু পাহাড়ের ঢালুতে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেল। সুবর্ণময় মন্দির উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে, কাছেই বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষুগণ বাস করেন। ভগবান তথাগতের কয়টি সুন্দর ধ্যানস্থ মর্ম্মর-মূর্ত্তি দেখে প্রণত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করলুম। দলে দলে ভক্ত-সমাগম হচ্ছে, তাদের হাতে পুষ্পস্তবক, ধূপ, বাতি দেবতাকে নিবেদন ক'রে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে। এ মন্দিরটি বহুদূর হ'তে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূর হ'তে মনে হয় যেন কঠিন প্রস্তর-স্তূপ ভেদ

ক'রে এ মন্দির আপনি গৌরব-গর্ব্বে উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে থেকে সধর্ম্মের মহিমা প্রচার করছে।

খানিক বাদে আমরা সহরের পথে ফিরে এলুম। সুইজিন শহর দেখে সত্যি বেশ আনন্দ হ'ল। এটি টাঙ্গু জেলার একটি 'টাউন-সিপ'। তিন দিকে পাহাড় ঘেরা, সাম্‌নে নদী প্রবাহিত, প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে গড়া এ ছোট সহরটী যে এত সুন্দর তা পূর্ব্বে ভাবতেই পারি নি। সঙ্গী আমায় সহরের কাছে দূরে নিবিড়, ঘন, উঁচু কাল ঢেউ-খেলান পাহাড়গুলো দেখিয়ে বল্‌ল—ঐ গম্ভীর গিরিরাজি অনির্দ্দিষ্ট ভাবে যে কোন্ দিগন্তের পানে চলেছে কেউ তা জানে না। দূরে উঁচু পাহাড়ে দুই একটি ছোট বস্তি দেখিয়ে সঙ্গী বল্‌ল, "ঐ সব পল্লাগুলো 'কেরেন' জাতীয় লোকদের, ওরা পাহাড়া জাতি, খুব কর্ম্মঠ। এ সব পাহাড়ে ওরা অনেক আছে, পাহাড় অঞ্চলেই তারা যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন করে, লেবু, কলা, তিল, মুগ, শসা, কুমড়া ইত্যাদি। আবার এসব ফসল নীচুতে নামিয়ে নদীপথে নৌকায় মাডক পর্য্যন্ত গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে দেয়—তারা ওখান হতে ট্রেনে জিনিষগুলো বিভিন্ন সহরে পাঠিয়ে দেয়। পাহাড়ীদের কারো বা দু'চারটা গরু-মোষও আছে।" আমরা ফিরে চলেছি ; এবার সঙ্গী আমায় খুব উৎসাহে কয়টী পাহাড় দেখিয়ে বল্‌ল —"বোধ হয় শুনেছেন কিছুকাল পূর্ব্বে বর্ম্মী রাজদ্রোহীরা ঐ সব পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মাঝে মাঝে তারা সীটান্ নদীর এপারে-ওপারে দু'একটি বস্তিতে ডাকাতি ও লুণ্ঠন করেছিল।" আমি অবাক্ হ'য়ে সঙ্গীর কথা শুনতে লাগ্‌লুম এবং পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম। অপর পারে পেগু জেলায় "সাজে" নামক পল্লীতে তিনবার নাকি ডাকাত পড়েছিল। গ্রাম্য লোক ডাকাতদের বন্দুক দেখে' ভয়ে বাধা দিতে সাহস পায়নি। পার্শ্বে, দূরে, কাছে যেদিকেই চেয়ে দেখেছি সেই নিবিড় গম্ভীর বনানী-মণ্ডিত পর্ব্বত-মালার ঘন কাল রূপ যেন মেঘের মত স্তরে স্তরে ছেয়ে আছে, মনে হলো বিদ্রোহী দস্যুরা যে বুদ্ধিমানের মতই তাদের আশ্রয়-স্থান ওখানে ঠিক করেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই, কারণ পাহাড়ী পথ

পরিচিত না থাক্‌লে কখনই সহরবাসী সুদক্ষ সৈনিক বা পুলিশ কেউ সেখানে গিয়ে তাদের সন্ধান নিয়ে শাসন করতে পারে না। বর্ত্তমানে এসব পাহাড়ী পল্লীতেও অতিরিক্ত পুলিশ পাহারা চলছে।

আমরা সুইজিনের সুন্দর সহরটি দেখে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাডকে ফিরে এলুম। ঐ পাহাড়-ঘেরা সহরটি তার রূপ-সৌন্দর্য্যের মাঝে সৌখীন সুখী পরিবারদের নিয়ে নীরব শান্তিতে আমাদের অনেক পিছনে পড়ে রইল। আমি আবার ক'দিন পরেই রেঙ্গুনে ফিরে গেলুম।

শ্রীবুদ্ধ উৎসব

বৈশাখী পূর্ণিমা অথবা বুদ্ধ-পূর্ণিমা। সমগ্র ব্রহ্মদেশ আবার উৎসবানন্দে জেগে উঠ্‌ল, এই পুণ্য পবিত্র তিথিতেই ভগবান বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর সত্যোপলব্ধি ও মহাপরি নির্ব্বান লাভও এইদিনেই হয়েছিল। তাই এই মহান্ স্মরণীয় তিথিকে উপলক্ষ করেই বৌদ্ধজগতে সর্ব্বত্র আজ উৎসব আরম্ভ হয়েছে। মঠ-মন্দিরময় এই বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ী ব্রহ্মদেশটা জুড়ে আজ কি বিরাট উৎসবের সাড়াই না পড়েছে। চোখে না দেখলে তা কেউ বুঝতে পারবে না। এদেশে বারমাসইত উৎসব আনন্দ লেগে রয়েছে, তাহলেও আজকার দিনের বিশেযত্ব সবকে ছাড়িয়ে গেছে। সহর, পল্লী সর্ব্বত্র আজ উৎসব-মুখরিত, সবাই উৎসবানন্দে মগ্ন, মঠ মন্দির সব সুসজ্জিত, শোভাময়,—স্কুল কলেজ, আফিস, বাজার—সবই বন্ধ। দুদিন পূর্ব্ব হ'তেই মন্দিরে মন্দিরে সর্ব্বত্র উৎসব আরম্ভ হয়েছে। দলে দলে নরনারী, বালক বৃদ্ধ তরুণ তরুণী অবস্থানুযায়ী

মূল্যবান বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে প্রাণের আনন্দে দেবতার নামে ছুটে চলেছে মন্দির পানে। পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে, মোটরে, ট্রামে, গোযানে—ধনী মানী গরীব সবাই প্রাণের একটা আকুল আগ্রহ নিয়ে চলেছে দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে, দেবতার পূজা করতে। কুমারীগণ পত্রপুষ্প-সুসজ্জিত জলপূর্ণ মঙ্গল-কলসী হস্তে, অপর সবাই পুষ্পগুচ্ছ ধূপ দীপ আরো সব অর্ঘ্য নিয়ে, নগ্নপদে ভক্তি-নম্রচিত্তে মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করছে। কি অপূর্ব্ব সুন্দর মহান্ দৃশ্য! পথে পথে লোকের ভিড় জমেছে। বহু দূর পল্লী হ'তে কত যে কষ্ট সহ্য ক'রে আজ পুণ্য দিনে শত সহস্র ভক্ত নরনারী এদেশের বিখ্যাত মন্দির-তীর্থগুলোতে এসেছে পুণ্যার্জ্জন করতে—ধর্ম্মসঞ্চয় করতে! মান্দালয়, রেঙ্গুন এবং থাটনের সব বিখ্যাত মন্দিরতীর্থে আজ লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছে। বাইরে বিরাট প্রদর্শনী বসেছে। ধর্ম্মশালাগুলো যাত্রীপূর্ণ; সেখানেও আনন্দ-কোলাহল চলেছে।

শহরের বিভিন্ন পল্লী ও গ্রাম হ'তে শত শত মেয়ে পুরুষ শোভাযাত্রীদল—মনোরম বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে, ঐক্যতান বাদকদলের সুমিষ্ট সুর-লহরীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপূর্ব্ব দর্শকদের মুগ্ধ ক'রে মন্দিরে চলেছে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক দলই তাদের একটী বিশিষ্ট ভাবধারা পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যে এবং নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়ে রূপায়িত ক'রে তুলবার চেষ্টা করছে। দর্শক ও ভক্তগণ সব দেখে শুনে মুগ্ধপ্রাণে দেবতাকে স্মরণ করছে। এরূপ শত শত দল বিভিন্ন মন্দিরে চলেছে।

এদেশে শহরে, পল্লীতে, পাহাড়ে, নদীতীরে যে অগণিত স্তূপ, মন্দির ও দেবমূর্ত্তি রয়েছে—সবই আজ উৎসব-সজ্জায় সুসজ্জিত। ভাব-গম্ভীর এই সব উচ্চ চৈত্য-শীর্ষ হতে ঘণ্টার মৃদু নিক্কণ সত্যিই যেন দেবতার শুভাশীষ ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে।

বৌদ্ধধর্ম্মে কোন পূজার বিধান নেই। ভক্তের শ্রদ্ধার পূজা—ভক্তির অঞ্জলি—এতে আর কোন বিধি-নিষেধ নাই, তাই সহস্র সহস্র ভক্ত আজ মন্দির

উৎসবানন্দে ব্রহ্মবাসীগণ, সুসজ্জিত শোভাযাত্রাসহ মন্দির পানে চলিয়াছে।

তলে একত্রিত হ'য়ে, দেবতার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে বারত্রয় প্রণামান্তে ধূপ দীপ জ্বেলে পুষ্পগুচ্ছ সাজিয়ে, বহুবিধ আহার্য্য বা অপর কোন অর্ঘ্য দেবতার সম্মুখে দিয়ে যুক্তকরে, কেউ উচ্চকণ্ঠে, কেউ নীরবে মন্ত্র পাঠ করছে। কেউ দেবতার ধ্যানে মগ্ন,—কেউ বা মালা জপে নিরত, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণও প্রার্থনায় মগ্ন। সবাই আজ চাইছে দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ। কোথাও মন্দির-প্রাঙ্গনতলে দেবতার প্রতিনিধি ভিক্ষুগণ হাজার হাজার ভক্তের সমক্ষে বুদ্ধের জীবনী ও বাণী ব্যাখ্যা করছেন। নীরবে নত-শিরে সবাই শ্রদ্ধাপূত অন্তরে উপদেশ শুনছে। কি বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা এদের প্রাণে! ভিক্ষুদের সবাই দেব-সম্মানেই সেবা ক'রে থাকে। অনেক ভক্ত জল-সত্র, অন্ন-সত্র, মন্দির বা দেবতা প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষুগণকে চীবর দান, মন্দিরতল বিধৌত করা অথবা সম্মার্জ্জনী সাহায্যে মার্জ্জনা—এরূপ নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্যার্জ্জন ক'রে নির্ব্বাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। আজ এই হাজার হাজার দর্শক ও ভক্তের আনন্দোচ্ছ্বাস-ধ্বনিতে মন্দিরতল মুখরিত। দেবতার আসনও বুঝি ট'লে উঠ্‌ছে। চারদিকে গান বাজনা ও পবিত্র প্রার্থনা-মন্ত্রের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুরে যেন একটা দেবভাবের উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই বিপুল জনারণ্যের ভিতর দিয়েও যেন দেবতার আবির্ভাব মূর্ত্ত হয়েছে। যে দিকেই চাওয়া যায়, আনন্দে প্রাণ ভ'রে ওঠে—দেবতার স্বরূপ জাগে প্রাণে, সবাই যেন এক হয়ে গেছে—এক ভাবে এক ধ্যানে, এক মনে আনন্দ উপভোগ করছে।

আরো বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই এদের মন্দিরে যেতে কোন বাধা-নিষেধ নেই, তাই বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রয়ী এ উৎসবে আনন্দ করতে আসে। এদেশে যাঁরা ভিন্ন ধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আশ্চর্য্য তাঁরাও আজ মন্দিরে পূজা করতে যাচ্ছেন। কারো কোন বাধা নেই, প্রাণে কোন দ্বিধা নেই, সবাই দেবতার নিকট সমান—তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভে সবাই ধন্য। যার যেমন অর্থ বা সামর্থ্য আছে, আজ সবাই প্রাণ-খু'লে উৎসবে ব্যয় করবে, ধর্ম্মোৎসবে কেউ এতটুকু কৃপণতা করছে না। ধর্ম্মই যে এদের প্রাণের প্রথম ও প্রধান উৎস—তা এদেশে এলেই বেশ উপলব্ধি হয়।

যাঁরা বলেন—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে দেশটা উৎসন্নে গেল, জাতি দুর্ব্বল হ'য়ে গেল", তাঁরা যদি একবার এই "অহিংসা পরম ধর্ম্মে"র উপাসক ব্রহ্মদেশবাসী কি ভাবে তাদের নিত্য-জীবনের সাথে ধর্ম্ম মিলিয়ে নিয়েছে তা দেখে যান তবে নিশ্চয়ই অবাক্ হবেন। রজোগুণোদ্দীপ্ত এ জাতি প্রাণটা নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেল্ছে! কাউকে মারতে বা নিজে মরে যেতে, যাদের প্রাণে একটুকুও দরদ-বোধ নেই, সে জাতি কি ভাবে এই ধর্ম্ম উদ্‌যাপন করছে দেখ্‌লে সত্যই অবাক্ হ'তে হয়—ধর্ম্মই যেন তাদের প্রাণ এবং নিত্য করণীয়!

প্রত্যেক পূর্ণিমা-তিথিতেই এদের সব মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মোৎসব হয়ে থাকে,—যথেষ্ট ভক্ত-সমাগমও হয়। তবে এই বৌদ্ধ-পূর্ণিমাই হ'ল বিশেষ উৎসবের দিন, তাই আবাল-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র সবাই আপন ভু'লে মহানন্দে, দেশশুদ্ধ লোক এসেছে মন্দিরে—দেবতার উৎসবে প্রার্থনা করতে। এমনভাবে উৎসবের সাড়া বোধ হয় আর কোন দেশে দেখা যায় না! সবার প্রাণেই অনাবিল আনন্দ-স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

দেখলে মনে হয়, সংসার-জীবনে এরা ধর্ম্মকে অবশ্য-কর্ত্তব্য বোধেই পালন করছে। ধর্ম্মকে ভিন্ন ভেবে বাদ দেয়নি,—জীবনের সাথে মিলিয়ে নিয়েছে; এবং ধর্ম্মের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে একটুও কুণ্ঠিত নয়! তাই ধর্ম্মোৎসবে এদের এত আগ্রহ ও আনন্দ। ধর্ম্ম-ব্যাপারে এরা আবার অত্যন্ত গোঁড়া। অন্য কোন ধর্ম্মমত মানতে বা জানতে চায় না, একমাত্র বুদ্ধদেব, তাঁর জীবন ও বাণী,—অন্য কিছু নয়।

দুই তিন দিন ব্যাপী এ উৎসবে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হবে। দিন-রাত এ উৎসব চল্‌ছে। আমিও আজ উৎসব দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়লুম, উৎসব আনন্দে মুখরিত রেঙ্গুন সহরের পথে পথে ঘুরে ঘুরে বিরাট বিখ্যাত সোয়েডাগণ প্যাগোডার দিকে চল্লুম। দূর হ'তেই শুন্‌তে পাচ্ছি জন সমুদ্রের আনন্দ কোলাহল আকাশ বাতাস ধ্বনিত ক'রে প্রবল উচ্ছ্বাসে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। অনেক কষ্ট ও চেষ্টায় জনতার ভিড় ঠেলে সুসজ্জিত মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে—অবাক্

হয়ে তাকিয়ে রইলুম ঐ বিপুল জনারণ্যের প্রতি, তাঁরা বিরাট মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে—তিলমাত্র স্থান নেই। মনে ভ্রান্তি এল, এত লোক কোথা হ'তে এল—তবে কি দেবতার আকর্ষণে এই মন্দির-তীর্থে আজ সকল নরনারী সহর ছেড়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে! অমনি শ্রদ্ধায় মনপ্রাণ মুগ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল দেবতার পায়। যে দিকে চাইছি সেদিকেই আনন্দের মূর্ত্ত বিকাশ;—নৃত্য, গীত, স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা—যা কিছু সবটার ভিতর দিয়েই সেই একই আনন্দের প্রবাহ ব'য়ে চলেছে। আরো মনে হচ্ছে-মর্ত্ত্যবাসীর ব্যাকুল আহ্বানে দেবগণ যেন আজ এই উৎসব-ক্ষেত্রে নেমে এসে স্বর্গীয় জ্যোতির প্রভাবে সবার মনপ্রাণ আলোকিত ক'রে শান্তিধারা বইয়ে দিয়েছেন। মহা আনন্দ,—বিশ্বলোকের আনন্দের অমৃত উৎস যেন আজ অবারিত হ'য়ে গেছে। সেই উৎসে অবগাহন ক'রে সবার মন আজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চারিদিক চেয়ে যতই দেখ্‌ছি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়্‌ছি। মনে হচ্ছে নিজেকে বুঝি হারিয়ে ফেলব এই অনাবিল আনন্দ-স্রোতের মাঝখানে। কেমন যেন ভাবাচ্ছন্ন মনে অগণিত জনগণের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছি, মনে হচ্ছে যদিও এদেশবাসীরা শ্রীবুদ্ধের বাণী জীবনে সব কার্য্যে পরিণত করতে পারেনি, তাহ'লেও দেবতার প্রতি এঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অসীম। ✓ ভগবান তথাগত নিশ্চয় এদের প্রাণের পূজা গ্রহণ করেন এবং শান্তি ও আনন্দ দানে নির্ব্বানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সন্ধ্যার সঙ্গে প্রত্যেক মন্দিরে বিভিন্ন বর্ণের হাজার হাজার উজ্জ্বল বিজলী-বাতি জ্ব'লে উঠ্‌ল। ভক্তদের নীরব প্রার্থনা চল্‌ছে দেবতার সামনে; স্থানে স্থানে বিখ্যাত বর্ম্মী নৃত্য-গীতের আসর জমেছে—সারারাত চল্‌বে। এ যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে বিচিত্র এক আনন্দ-কানন রচিত হয়েছে; সবাই আনন্দে মগ্ন।

এভাবেই সমগ্র ব্রহ্মদেশব্যাপী বিরাট উৎসব চল্‌ছে। ক্ষাণিক বাদে অগণিত জনগণের মাঝ দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গন প্রদক্ষিণ ক'রে, অপর এক যাত্রীদলের সঙ্গে দেবতাকে স্মরণ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। সেই দিনকার উৎসবের শুভস্মৃতি আমার জীবনে মহা পবিত্র ব'লেই ভুলতে পারি নি।

ইরাবতী বক্ষে

সেবার জুলাই মাস, পুরা মৌসুমী চল্‌ছে। বঙ্গোপসাগরের প্রবল তরঙ্গাঘাতে জাহাজগুলি হাবুডুবু খেয়ে অতি কষ্টে এসে বন্দরে হাজির হচ্ছে। রেঙ্গুন শহরে নিত্যই কাজল মেঘে ঘেরা আকাশের গা হ'তে অবিরল ধারে জল ঝরছে।

এরূপ একটি দুর্য্যোগের দিনেই নিম্ন-ব্রহ্মের ভিতর দিয়ে উপর-ব্রহ্মে আমার ভ্রমণ আরম্ভ হয়েছিল। পূর্ব্বেই খবর নিয়েছি, উপর-ব্রহ্মে আরও দু'মাস পরে বর্ষা আরম্ভ হবে। রাত ন'টার ট্রেনে "প্রুম" রওনা হ'ব স্থির হ'ল। কয়েক-জন বন্ধু আমাকে বিদায় দিতে ট্রেন ছাড়বার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ী একটি বাঙ্গালী যুবক, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে এসে আমার জন্য একটি আসন সম্পূর্ণ দখল ক'রে বসেছিল ; কারণ সারারাত আমাকে গাড়ীতেই কাটাতে হবে। গাড়ীতে এদেশে একটি সুন্দর ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—যাত্রী যে কোন ক্লাসেই পূর্ব্বে এসে যদি শুয়ে বা ব'সে থাকে তবে স্থানাভাবের জন্য তাকে কেউ বিরক্ত করবে না।

গাড়ী ছাড়বার মাত্র পনের মিনিট সময় রয়েছে। দলে দলে যাত্রী এসে গাড়ী ভ'রে দিল। প্রায় সবাই এদেশীয়—দু'চার জন গুজরাটী, ভাটিয়া ও মাদ্রাজী। আমার পাশে অপর বেঞ্চিতে বসে' একটি ব্রহ্মমহিলা, তাঁর ভাষায় আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "ফায়া, বে তোয়া মেলে ?" উত্তর দিলাম, "চুন পিয়ে তোয়ামে।" (মশায় কোথা যাচ্ছেন ?—আমি প্রুম যাচ্ছি।) প্রুমকে এদেশীয়েরা 'পি' অথবা 'পিয়ে' বলে' থাকে। এরূপ এদেশের অনেক জায়গার বর্ম্মী নামে বিভিন্ন উচ্চারণ। আমার সাথী যুবকটি বেশ মিষ্টি গলায় গান ধরলে,—"নিয়ে যাও বিদায় আরতি, হ'ল ম্লান আঁখির জ্যোতি।" ব্রহ্মমহিলাটি অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার মনে হ'ল,—তিনি বাঙলা জানেন

না বটে, কিন্তু ভাষার অনভিজ্ঞতা সঙ্গীতের রস উপভোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারেনি। গান থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি বললেন, "কাউ মারে।" (বেশ, বেশ, ভাল)। পরে জিজ্ঞেস করলেন, যুবকটি কোথায় যাবে। সে তার উত্তরে বললে—"চিমণ্ডাইন।" চিমণ্ডাইন্ পরের ষ্টেশন। মহিলাটি এবার গাড়ীর ভিতর এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দূরে তার পরিচিত একটি যুবক স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে' তাকে নাম ধরে ডাকলেন, "এ মাম্বু দিমা লাবা" (মাম্বু. এখানে এস)। প্লাটফর্ম্মে যাত্রীদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ঘোরা-ফেরা করছে। খাবার ফেরীওয়ালা, কাগজের হকার উচ্চরবে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

গার্ডের বাঁশীর শব্দ ও সবুজ আলোর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই, প্রতিধ্বনি ক'রে গাড়ী কুণ্ডলাকৃতি কালো ধূমরাশি উদ্গীরণ করে' আকাশের গায়ে ছড়াতে ছড়াতে তার চোখ দুটো আরো রাঙিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে আলোকমালা-সজ্জিত ষ্টেশন ছেড়ে নৈশ আঁধারের বুকের উপর দিয়ে ছুটে চল্ল। একটু বাদেই যেন এক নিশ্বাসে গাড়ীখানা "চিমণ্ডাইন" এসে পৌছল। যুবকটি আমার কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে নেমে গেল। এ অবসরে বর্ম্মী যুবক মাম্বু এসে তার স্থান অধিকার ক'রে বস্ল এবং তার মুখের প্রজ্বলিত মোটা একটি চুরুটের ধোঁয়ায় আমাকে ব্যস্ত ক'রে তুল্ল। গাড়ী চার পাঁচ মিনিট থেমেই আবার ছুটে চলেছে। মহিলাটি ঐ বর্ম্মী যুবকের সঙ্গে কত যে কথা ও গল্প ক'রে চলেছেন তার যেন বিরাম নেই। মাঝে মাঝে আমি তাকিয়ে দেখছি। অবশ্য বর্ম্মী জাতিই গল্পপ্রিয়, আমুদে। গাড়ীতে এদেশীয়েরা ছোট ছোট বালকবালিকা হ'তে বৃদ্ধ যুবক সবাই মাঝে মাঝে চুরুট টেনে নিচ্ছে। আবার জ্বালান চুরুটটি নিবিয়ে রাখ্ছে—পরে টান্‌বে বলে। এ সবই কিন্তু ওদের দেশের বা নিজেদের তৈরী। গাড়ীখানা রেঙ্গুন ছেড়ে 'ইন্সিন' জেলা পার হ'য়ে—"থারোয়ার্ডি" জেলার ভিতর দিয়ে চলেছে। লাইনের ধারে দু'দিকেই ধানের জমি; অদূরেই বর্ম্মী-পল্লী ও বৌদ্ধ মন্দিরের সুন্দর চূড়া। আরও দূরে চিরশ্যামল, নিবিড় ঘন বনানীর শান্ত শ্যামলিমা। সবই যেন আঁধারে আব্ছা আব্ছা দেখা যাচ্ছে। গাড়ীখানা মাঝে মাঝে ষ্টেশনে চার পাঁচ মিনিট থেমে,

যাত্রী উঠিয়ে-নামিয়ে আবার ছু:ট চলেছে। রাতের গভীরতার সঙ্গে নিদ্রাতুর যাত্রীরাও ঘুমিয়ে পড়ছে। দু'চারজন জেগে রয়েছে, আমিও তারি মধ্যে একজন। রাত দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হওয়ার পর গাড়ীখানা একটি আলোকমালা-শোভিত বড় ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল। চেয়ে দেখি, ষ্টেশনটির নাম "লেপাডং।" এটি একটি জংশন। এখান হ'তে বেসিন ও প্রুম দুটি লাইন। "বেসিন" যেতে এখানেই গাড়ী বদল করতে হয়। ফেরিওয়ালার হাঁকডাকে যাত্রীরা সব জেগে উঠ্‌ল। বর্ম্মী খাবারওয়ালা ছুটে ছুটে ডেকে যাচ্ছে "থামে থামে," "লাফে, লাফে," (চাই ভাত, চাই চা) ইত্যাদি। ভারতীয় চুলিয়া মুসলমান ডাক্‌ছে—"চাই সোডা, লিমনেড, চা" অথবা "পান, সিগারেট, চুরুট," ইত্যাদি। বর্ম্মী যাত্রীদের ভিতর অনেকেই এত রাতেও দু'চার পয়সার কিনে খেতে লাগল; ঘুমন্ত মুখেও খাবার পুরে দিচ্ছে। এটা হ'ল এদের স্বভাব। গাড়ী এখানে বিশ পঁচিশ মিনিট দাঁড়াবে। আমি নেমে একবার ষ্টেশনটি ঘুরে দেখে এলুম। গাড়ী তার বাঁশী বাজিয়ে, সবাইকে সাবধান ক'রে ঠিক সময়ে ছেড়ে চল্‌ল। এবার গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সারারাত আর বিশেষ কোন খবর রাখিনি। ভোর রাতে চোখ চেয়ে দেখি, প্রুম জেলায় এসে পড়েছি। পল্লীর পাশ কেটে, মাঠের মাঝ দিয়ে গাড়ীখানা এগিয়ে চলেছে; ফর্সা হ'য়ে হ'য়ে আসছে। ভোরের পাখী সবেমাত্র বাসা ছেড়ে ডেকে ডেকে ডালে বস্‌ছে দূরে, কাছে গ্রাম্য বৌদ্ধ মন্দিরের স্বর্ণাভ ও শ্বেত চূড়াগুলি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখনো প্রভাতসূর্য্যের কিরণমালা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েনি। একটু বাদেই ভোর ছ'টায় এ লাইনের শেষ সীমায় প্রুম ষ্টেশনে গাড়ীখানা তার নৈশ-যাত্রা সমাপ্ত ক'রে বিজয় গর্ব্বে শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে এসে উপস্থিত হ'ল। এক রাতেই তিন চারটি জেলা পেরিয়ে এসেছি!

একজন পরিচিত বন্ধু পূর্ব্ব হ'তেই ষ্টেশনে এসে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। গাড়ীতে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে আনন্দে ছুটে এলেন। আমিও নেমে পড়লুম। যাত্রীরা সবাই নেমে আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে বাসায় চলেছে।

আমিও বন্ধুর সঙ্গে এগিয়ে চললুম। মনে হচ্ছে যেন একটা নূতন দেশে এসেছি। এখানে বৃষ্টির নামটিও নেই। প্রখর রোদের তাপ এবং দুপুরে বেশ গরম বোধ হয়। ঘরে এসে চা খেয়ে শহর দেখতে বে'র হ'লুম। এ 'প্রুম' হ'ল এ জেলার সদর। শহরটী নেহাৎ ছোট নয়, পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী ইরাবতী নদী কলনাদে শহরের গা বেয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে চলেছে। নদীর ধারের দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। যেন একখানি ছবি। এ পারে প্রুম শহর, নদীর ধার দিয়ে সোজা সুন্দর প্রশস্ত একটি রাস্তা; অপর পারে নিবিড় ঘন শ্যামল বন। আবার শ্যাম বনানীর উত্তরীয় প'রে উঁচু নীচু পাহাড়ের সারি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে। হিন্দুগণ প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট তিথিতে এখানে ইরাবতীর জলে পুণ্যস্নান করতে আসেন। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে নদীর তীরে একটী স্নানের ঘাট বাঁধিয়ে তার কাছেই একটি বিরাট ধর্ম্মশালা তৈরী ক'রে দিয়েছেন। পুণ্য যোগের সময় এ ধর্ম্মশালায় যথেষ্ট জন-সমাগম হয়। নদীর অতি কাছে একটি কুটীরে একজন ভারতীয় সাধুকেও দেখ্‌লুম। এখান হ'তেও "ইরাবতী ফ্লোটিলার" ষ্টিমারগুলি যাত্রী ও মাল নিয়ে জলপথে নিম্ন-ব্রহ্মে ও উপর-ব্রহ্মে যাওয়া-আসা করছে। এদেশীয় নৌকোয়ও অনেক জিনিষ আমদানী-রপ্তানী হচ্ছে। এ প্রুমই হ'ল এদিক্‌কার বড় রকমের একটি বন্দর। নদীর ধারে প্রায় আধ-মাইলব্যাপী দশ বারোটি বিরাট চালায় এ বাজার চলেছে। প্রত্যেক চালায়ই একটি ছোটখাট বাজার। ক্রেতার বিশেষ সুবিধাই হচ্ছে, তাকে আর ঘুরে মরতে হয় না। নদীর ঘাটে কয়খানা নাপ্পি-বোঝাই নৌকো বাঁধা রয়েছে, তার তীব্র গন্ধেই টের পেলুম। এ নাপ্পি জিনিষটা বর্ম্মীদের একটি নিত্যকার অতি প্রধান ও প্রিয় খাদ্য,—আমাদের তেল-ঘির মত। এর এতই তীব্র গন্ধ যে, অপর দেশীয়েরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই এ পদার্থটী যাত্রী ষ্টিমার বা যাত্রী গাড়ীতে পাঠান নিষেধ; নৌকো অথবা ভিন্ন ষ্টিমারে এর আমদানী-রপ্তানী হয়। বাজারটী ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ব্যবসায়ী সব চীনা, বর্ম্মী, ভারতীয়, ইংরেজ ফার্ম্মও রয়েছে— Row Co., White Away Co., ইত্যাদি। বর্ম্মী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক

না হ'লেও, শাক, সব্জী, মাছ, ফল—এসব দোকান প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ম্মী মেয়েদের একচেটে। বাজার হ'তে বাইরে এসে বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ফিরে স্কুল, অফিস, ডাকবাংলো, হাসপাতাল, জেল—এসব দেখে এলুম। এদেশে সর্ব্বত্রই জেলার সদর সহরটা একই ভাবে তৈরী। ক'জন বাঙালী উকীল, ডাক্তার, কেরাণী, স্কুল-মাষ্টার এখানে আছেন। পুলিশ ট্রেনিংস্কুল ও সার্ভে স্কুলটী এখানকার উল্লেখযোগ্য। শহরে এবং আশেপাশে মনোরম বৌদ্ধ-মন্দির ও বিহার অনেক রয়েছে। রাস্তায় দেখলুম কয়টি বর্ম্মী ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। এরা যেন দিন দিনই সাহেবদের অনুকরণে অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে পড়েছে, বিশেষ ক'রে পোষাক-পরিচ্ছদে। অবশ্য পল্লীতে এখনও এতটা প্রবেশ করেনি। শহরটী প্রায় সবটাই দেখা হ'ল। বিজলীবাতি-সজ্জিত এ শহরের পথগুলিতে মাত্র একটি ব্যতীত অপর পথে মিউনিসিপ্যালিটির শুভদৃষ্টিই পড়েনি। জল সরবরাহের ব্যবস্থা মোটেই সুবিধা-জনক নয়। এ শহর হ'তে স্থলপথে সর্ব্বদা বিভিন্ন স্থানে যাত্রী-বোঝাই বাস যাওয়া-আসা করছে। রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাবার একটি ভাল পথ আছে। রোদ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শ্রান্ত হ'য়ে ঘরে ফিরে এলুম।

দুপুরে স্নানাহার সমাপন ক'রে বেশ আরামে বিশ্রাম করা গেল। আজ বেশ একটু গরমই বোধ হচ্ছে। একেবারে নূতন দেশে এসে পড়েছি, বৃষ্টির কোন লক্ষণই নেই। বৈকালের দিকে বন্ধুর সঙ্গে নিকটেই এখানকার বিখ্যাত সুন্দর বৌদ্ধ-মন্দিরটী দেখতে গেলুম। ষ্টেশন হ'তে খানিকটা গিয়েই এ মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল। মন্দিরের সামনে রাস্তার ধারে মেলা বসে' গেছে। শত শত বর্ম্মী মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো, তরুণ তরুণী, দলে দলে সেজেগুজে মন্দিরে যাচ্ছে, আবার কোন দল দর্শনান্তে ফিরে আসছে। ফুল, বাতি, ও ধূপের দোকানগুলোতে বেশ ভীড় জমেছে। সবই বর্ম্মীদের দোকান। মন্দিরটী একটি উঁচু পাহাড়ের উপর স্থাপিত, কিন্তু প্রধান মন্দিরকে ঘিরে চারদিকেই আরও অনেক ছোট-বড় মন্দির ও বিহার তৈরী হয়েছে। বর্ত্তমানে পাহাড়ের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায় না, শুধু উঁচু দেখে মনে হয় স্থানটী এক কালে পাহাড় ছিল।

আমরাও কারুকার্য্যময় প্রধান তোরণ পার হ'য়ে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে মন্দির দেখ্‌তে উপরে চল্‌লুম। পথে প্রবল জনতা উৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছে। সবার প্রাণেই আনন্দ, মুখে পবিত্র হাসি। একজনকে জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌লুম যে বর্ত্তমানে এদের উৎসব-মাস চল্‌ছে, তাই নিত্য অবসর মত সবাই মন্দিরে এসে প্রণাম প্রার্থনা ক'রে যায়। এবার আমরা মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম ক'রে, চারিদিক্ ঘুরে ছোট-বড় আরও মন্দির এবং ঐ একই ভগবান বুদ্ধ দেবের নানা ভাবের সুশোভন মূর্ত্তি দেখে এগিয়ে চলেছি। মন্দিরের কারুকার্য্য ব্রহ্মের বিখ্যাত শিল্পীদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিচ্ছে। দেবতার সম্মুখে অগণিত দীপশিখা, তারি ধারে শত শত পুষ্পগুচ্ছ, দুইদিকে ধূমায়িত ধূপ-শলাকা। ফুলের সুবাস এবং স্নিগ্ধ ধূপের গন্ধে আজ মন্দিরতল আমোদিত। সবার প্রাণেই যেন একটা পুণ্য ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করছে। মন্দিরের ধারে বসে' ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বা ভক্ত মেয়ে পুরুষ ফুল ও মালা হাতে নিয়ে জপে বা প্রার্থনায় মগ্ন। ঘুরে যতই দেখ্‌ছি, ততই প্রাণে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। এই বিরাট মন্দিরতলে একপাশে বড় একটি হলে আকুল জনতা নীরবে বসে' আছে। আগ্রহে সাম্‌নে এগিয়ে দেখলুম, দু'জন প্রাচীন ভিক্ষু উচ্চ আসনে বসে' শত শত ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তের সম্মুখে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজ ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। সবাই করজোড়ে নিবিষ্টভাবে ধর্ম্মকথা শুন্‌ছে। মেয়ে এবং পুরুষদের জন্য ভিন্ন আসন নির্দ্দিষ্ট। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সত্যই মোহিত হলুম। বেলা পড়ে এল, ধীরে ধীরে দেবতাকে স্মরণ করতে করতে প্রাণে একটা পবিত্র ভাব নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। দু'ধারের দোকানগুলোতে বর্ম্মী তরুণ ও বালকদের হল্লা চল্‌ছে।

ফিরে শহরের বুকের উপর দিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে চল্‌লুম। একটু বাদেই এসে ইরাবতীর তীরে উপস্থিত হ'লুম। পথটী বড়ই সুন্দর, সোজা প্রশস্তভাবে অনেক দূর চলে' গেছে। অনেক লোক সান্ধ্য ভ্রমণে এসেছেন। এটা বেড়াবার স্থানই বটে! আমারও বেশ ভাল লাগ্‌ল। ইরাবতীর স্পর্শ-শীতল মুক্ত

বাতাস ধীরে ধীরে আমাদের দেহ, মন, প্রাণ স্নিগ্ধ ও শান্ত করে' দিচ্ছে। হেঁটে খানিকটা বেড়িয়ে এবার নদীর ধারের কাঠের বাঁধে বসে' বিশ্রাম ও গল্প চল্‌ল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। দিনের আলো ডুবে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই শহরের বিজলীবাতি সব জ্বলে উঠ্‌ল। উজ্জ্বল আলোকে শহরখানা নূতন রূপে সজ্জিত হ'ল। নদীর ধারের পথটীকে দিনের মত আলোকিত করে' সার দিয়ে আলোকমালা জ্বল্‌ছে! ইরাবতী-বক্ষে নৌকোয় ও ষ্টিমারে শত শত প্রদীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। বৌদ্ধ বিহার হ'তে সান্ধ্য-প্রার্থনার সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি, সান্ধ্য-গগন মুখরিত করে' তুল্‌ল। ওপারে পাহাড়ের শ্রেণী যেন উদাসী সন্ধ্যার অন্ধকার-কালিমা গায়ে মেখে আঁধারেই মিলিয়ে গেল। আমার সাথী ফেরবার পথে বললেন, "ঐ বর্ম্মী পল্লীর মোড়ে কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে দুইজন জুয়াচোর গুণ্ডা মিলে এক ভারতীয় পথিককে ভয় দেখিয়ে তার সোনার ঘড়ী, বোতাম ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।" আমি তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বল্‌লুম, "তা আর কি! অতবড় রেঙ্গুন সহরেও হামেসাই বিপথে বেঘোরে এমনিই উৎপাত বিদেশীকে সহ্য করতে হয়। এসব ব্যাপারে কারোও বা প্রাণান্তও ঘট্‌তে দেখা যায়। সমস্ত ব্রহ্মদেশেই এই প্রকৃতির কতকগুলি লোক রয়েছে, তারাই এই সব উৎপাত করে। পুলিশে খবর দিলে বিশেষ কোন ফল হয় না।" সঙ্গী আমার কথা শুনে নীরবে হাস্‌লেন। পরে আবার গল্প করতে করতে ঘরে ফিরে এলুম।

পরদিন আর কোথাও বের হলুম না। দুপুরে ইরাবতীর পবিত্র জলে স্নান করে' পুণ্য সঞ্চয় করা গেল। দু'চারজন বর্ম্মী ও জেরবাদীর সঙ্গে এখানে বেশ আলাপ পরিচয় হ'য়ে গেল। মুসলমান বাবা এবং বর্ম্মী মায়ের সন্তানেরাই এদেশে 'জেরবাদী' বলে' পরিচিত। বর্ত্তমানে এরা বর্ম্মী মুসলমান বলে' পরিচয় দিচ্ছে। বৈকালে বেড়াতে গিয়ে খেলার মাঠে উপস্থিত হলুম। বর্ম্মী বালকদের জোর খেলা হচ্ছে। এখান থেকে আমরা এগিয়ে যেতে পার্শ্বেই দেশীয় একটি বড় ঔষধালয় দেখ্‌লুম,—খাঁটী স্বদেশী। ডাক্তার, বনের গাছগাছড়া, ফল, ছাল,

মূল ইত্যাদি হ'তে ঔষধ তৈরী করে' রোগ আরাম করেন। শুন্‌লুম—বর্ম্মীরা দেশীয় ঔষধই বেশী পছন্দ করে। এ ডাক্তারও নাকি এ দেশে খ্যাতিমান। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ফিরে এলুম, রাতে একটি মুসলমান ফকিরকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। বড় একটি ঘরে ফকির সাহেব বসে' আছেন। তাঁর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখের তলায় সুরমার কালো রেখা, বিচিত্র একটি আলখাল্লা গায়। ফকির আপন ভাবে কত কি বলে' যাচ্ছেন, সামনে ভক্তগণ বসে' আছে। তিনি রোগের ঔষধ দেন, হাত দেখেন, ভাগ্য পরিবর্ত্তন করে' দেন ইত্যাদি। বেশ লোক-সমাগম হচ্ছে—দু'পয়সা আমদানীও হচ্ছে। ফকির আমার সঙ্গে হিন্দিতেই আলাপ করলেন—বেশ ভদ্রভাবে। তাঁর ভক্তদের আমায় দু'একটা গান শুনিয়ে দিতে বল্‌লেন। আদেশমাত্রই গান আরম্ভ হ'ল। আমি গান শুনে একটু পরেই ফকিরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। ফকিরের ভক্তগণ কিন্তু আমার প্রতি তাঁর সদয় ভাব দেখে' আমাকেও একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। ফকির সাহেব দু'এক মাস এভাবে সারা ব্রহ্মমুলুক ঘুরে বেড়ান।

পথে আস্‌তে মনে হল—এই প্রুমেই একদিন অতীত ভারতের সভ্যতা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিকাশ হয়েছিল। তার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান প্রুমের আশে-পাশে কয়টী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এদেশের অনেক স্থানেই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতার কত না স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। আজই আমার এখানকার বিদায়-রজনী, কাল হ'তে ইরাবতীর বক্ষে ভাস্‌ব।

আজ তেইশে জুলাই। পরদিন খুবই ভোরে বন্ধুটী আমাকে ষ্টীমারে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আজ থেকেই ইরাবতীর বক্ষে ভেসে চল্‌লুম। সকাল সাড়ে ছ'টায় প্রুম হতে মান্দালয় অভিমুখে দীর্ঘ যাত্রা সুরু হ'ল। ভোরের সূর্য্য তখন দীপ্ত কিরণে পল্লী-পাহাড় ভেদ করে' ইরাবতীর গা বেয়ে উঠ্‌ছেন,—উজ্জ্বল কিরণমালা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে। দূরে আকাশের গায় দু'এক খণ্ড কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। পাখীর কাকলি জনজাগরণের কল-কোলাহলে মিশে গেছে। ষ্টীমারখানা চল্লিশটী ষ্টেশনে থেমে প্রায় চার দিনে গিয়ে মান্দালয়

শহরে পৌছ্‌বে। আমি প্রথমে পাগান যাব ; শুন্‌লুম তিন দিনে ওখানে পৌছ্‌ব। ঐ প্রাচীন স্থানটী ব্রহ্মদেশে ইতিহাস-বিখ্যাত। মনে স্বাভাবিক একটা আনন্দ নিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছি ; আর এভাবে কয়েকটী বিভিন্ন জেলার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সাথে অনেকগুলো পল্লী ও শহর দেখা যাবে, এতে আরও উৎফুল্ল হ'লুম। একাই বেরিয়েছি। যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি প্রায় সকলেই ব্রহ্মদেশীয়, শুধু ষ্টীমারের খালাসী ও সারেং ভারতবাসী।

ষ্টীমার ইরাবতীর প্রবল জলোচ্ছ্বাস ভেদ করে' উজান ঠেলে চলেছে। নদীটী পদ্মার মত প্রশস্ত। বর্ষায় তার কূলপ্লাবী জলধারা কল কল রবে ছুটেছে। এর উভয় তীরেই পাহাড়, আর নিবিড় বনানীর শ্যামছায়া। মাঝে মাঝে শহর ও পল্লী। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় প্যাগোডার শ্বেত ও স্বর্ণ শীর্ষগুলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ছে। বর্ম্মী যাত্রিগণ করজোড়ে "ফায়ার" অর্থাৎ ঐ মন্দিরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণতি জানাচ্ছে। উভয় পারেই মন্দির রয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটী মিলের চোঙাও দেখা যাচ্ছে। প্রোম হ'তে একঘণ্টা পথ যেতেই দেখ্‌তে পেলুম, নদীর বাঁকে উঁচু পাহাড়ের উপর একটি বিখ্যাত প্যাগোডা গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। শুন্‌লুম, প্রতি বৎসর এখানে এক পূর্ণিমাতে বিরাট বৌদ্ধ উৎসব হয়। ঐ সময় দেশের বিভিন্ন স্থান হ'তে বহু ভক্ত সমাগম হয়। পার্শ্বেই একটি বৌদ্ধ-বিহারে ভিক্ষুগণ থাকেন, ষ্টীমার হ'তে এই দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইরাবতী এঁকেবেঁকে চলেছে, ষ্টীমারখানাও মন্থর গতিতে যেন প্রাণপণ পরিশ্রমে কখনও মাঝে, কখনও ধার দিয়ে, এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় আটটায় আমাদের জলযান 'সিটসারণ' নামক ষ্টেশনে এসে, ষ্টীমারেরই একখানা বোটে যাত্রী নামিয়ে-উঠিয়ে ডাক নিয়ে তার বাঁশী বাজিয়ে আবার গন্তব্য পথে চল্‌ল। খানিক বাদে "থাটমেয়ো" জেলায় "কামা" ষ্টেশনে এসে ষ্টীমার থাম্‌ল। এটী একটি টাউনসিপ ; বর্ষা-ঋতু, তাই ইরাবতীর প্রবল জলস্রোতে ষ্টীমার থাম্‌তে পারছে না, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতি কষ্টে ও চেষ্টায় দশ পনর মিনিট নদীর মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

থেমে, বোটে ক'রে যাত্রী উঠিয়ে-নামিয়ে আবার পূর্ণ উদ্যমে উজিয়ে চল্‌ল। যতই এগিয়ে চলেছি ইরাবতীর উভয় তীরের প্রাকৃতিক পরম রমণীয় শোভায় একেবারে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হচ্ছি। ব্রহ্ম দেশ যে এত সুন্দর, তা আজ যতই দেখ্‌ছি, ততই অনুভব কর্‌ছি। চোখ আর ফিরে আস্‌তে চাইছে না। ওই নিবিড় অরণ্যের আভরণ প'রে, ঘোর কালো পাহাড়ের সারি কাছে ও ও দূরে, দেবতার মন্দির শিরে নিয়ে, সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও উঁচু পাথরের গা বেয়ে জলপ্রপাতের ধারা বইছে। অপর-পারের ঐ পর্ব্বতপুঞ্জই আরাকানের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই পথেই দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরের জাপানী আক্রমণের সময় ভারতীয়েরা পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়েছিলো। মাঝে মাঝে পল্লীর পর্ণকুটীরগুলো দেখা যাচ্ছে। আবার পাহাড়ের গায়ে, নদীতীরে, ছোট ছোট কুটীর তৈরী ক'রে চাষী ও জেলেরা বাস কর্‌ছে। প্রুমের অপর পারেই পাহাড়ের গায়ে এদেশের বিখ্যাত আতার বাগান। এখান হইতে যথেষ্ট আতা রেঙ্গুনে চালান হয়। এদেশের প্রায় 'টাউনসিপ' জেলা বা সাবডিভিসনে ভারতীয় ব্যবসায়ী, কুলী, কেরাণী, ডাক্তার, উকিল এবং চেট্টিদের ব্যাঙ্ক রয়েছে। বহুদিন হ'তে বর্ম্মীদের সাথে এদের মিত্রভাবেই মিলে মিশে কাজকর্ম্ম চলে' আস্‌ছিল। জানি না বর্ত্তমানে কোন্ অজানা কারণে কোন কোনও স্থানে বর্ম্মীরা ভারত-বিদ্বেষী হ'তে চলেছে। এবার বেলা নটায় 'নিওয়াঙ্গনিনজেক' নামক ষ্টেশনে ষ্টীমার থেমে যাত্রী নামিয়ে-উঠিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে চল্‌ল। সমতলে ধানের চারা লাগান হচ্ছে। চাষীরা বড়ই ব্যস্ত। গরুমোষের সাহায্যেই এদেশে চাষ হয়। দু'তিন খানা জেলেডিঙ্গি পাল তুলে' ছুটে যাচ্ছে। তারা বিভিন্নরূপ জাল দিয়ে মাছ ধরে।

আরও এগিয়ে যেতে নদীর উভয় তীরে, পাহাড়ের গায়ে নানাজাতীয় ফসলের গাছ দেখ্‌তে পেলাম ; অবশ্য সমতল বাসীরাই এসব চাষ করেছে। ষ্টীমার তার বাঁশী বাজিয়ে কালো ধোঁয়ায় আকাশখানিকে ছেয়ে ফেলে, পূর্ণ উৎসাহে

এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নদীপথে পাল তুলে' মাল-বোঝাই বর্ম্মী নৌকো শোঁ শোঁ রবে যেন ষ্টীমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। এবার 'পালো' ষ্টেশনে ষ্টীমার থাম্‌ল। তখন বেলা প্রায় এগারটা হবে, রোদের তাপ বেশ বেড়ে উঠেছে। একটু পরেই আবার ছেড়ে চল্‌ল। এপার ওপার ক'রে এভাবেই সব ষ্টেশনে থেমে যেতে হচ্ছে। ষ্টীমারে একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। এবার তাঁদের আহার আরম্ভ হ'ল। বিছানার উপরে সেবকগণ টিফিন-কেরিয়ার হ'তে আহার্য্য ভাত, মাছ-ভাজা, নাপ্পির ঝোল সহ তরকারী এবং নানাবিধ পিঠা খুলে' প্লেটে সাজিয়ে ভিক্ষুদের হাতে তুলে দিচ্ছে, আর তাঁরা আহার কর্‌ছেন। ভিক্ষুগণের নিয়ম হ'ল—বেলা বারোটার পর আর অন্নগ্রহণ করবেন না, এবং যে কোন আহার্য্য জিনিষ কেউ হাতে তুলে না দিলে গ্রহণ করেন না। এজন্যই আশ্রম-পালিত বালক এবং সেবকগণ সর্ব্বদা তাঁদের কাছেই থাকে। অর্থও নিজেরা রাখেন না, ঐ সেবকগণের হাতেই থাকে। এমন ভিক্ষুও দেখেছি, যিনি কখনও পয়সা স্পর্শ করেন না। ভিক্ষুদের আহারের পর সেবকদের আহার হ'ল। আজ যতগুলি পল্লী পাহাড় দেখ্‌তে পাচ্ছি, সর্ব্বত্রই সুন্দর কারু-কার্য্যময় মন্দিরের শোভা। ইরাবতীর উভয় তীরে কত শত শত মন্দির যে সার দিয়ে আমাদের সাথে চলেছে! এদেশে স্বধর্ম্মের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন পেয়ে সত্যি মুগ্ধ হচ্ছি।

বেলা বারোটায় এসে 'থায়েটমিয়ো' জেলা-শহরে একটী ফ্ল্যাটের সাথে আমাদের ষ্টীমার থাম্‌ল। অনেক যাত্রী এখানে নামলেন। বর্ম্মী মেয়ে ও পুরুষ কুলিরা এসে যাত্রীদের জিনিস নামিয়ে নিয়ে গেল। দু'টী বন্দুকধারী গুরখা সেপাই তিন চার জন গ্রাম্য জোয়ান লোককে শিকলে বেঁধে এনেছে। শুন্‌লুম, তারা নিকটেই কোথায় ডাকাতি করেছে। লোকগুলি কিন্তু নির্ভীক ভাবে বসে' বাঁধা হাতে চুরুটের ধোঁয়া টান্‌ছে। সেপাইরা তাদের নিয়ে নেমে গেল। ফেরিওয়ালী বর্ম্মীমেয়েরা বিভিন্ন খাবার জিনিষ নিয়ে এসে ষ্টীমারে বাজার বসিয়ে দিলে,—বেশ দু'চার পয়সা বিক্রি হ'তে লাগ্‌ল। একটু পূর্ব্বেই কিন্তু ষ্টীমারের দোকানে যাত্রীদের

আহার সমাপ্ত হয়েছে। বর্ম্মীদের স্বভাব, একসঙ্গে অধিক আহার করবে না, কিন্তু সারাদিনই হাটে, মাঠে, ষ্টেশনে, দু'চার পয়সার কিনে খাবে।

এ শহরটী নেহাৎ ছোট নয়; পাহাড়ের কোল ঘেঁসে নদীর তীরেই অবস্থিত; কয়েকটী সুন্দর প্যাগোডা শোভিত হ'য়ে শহরটী আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। বাড়ীঘর-গুলো বেশ সাজান। বাজার, স্কুল, কোর্ট, হাসপাতাল, সুরক্ষিত পুলিশ প্রহরী, ডাকবাংলো,—সবই আছে। এখান হ'তে কয়টী রাস্তা ভিতরে অন্যত্র চলে' গেছে। এদিক্‌কার শহর বা পল্লী হ'তে প্রায় জলপথেই অন্যত্র যেতে হয়। ট্রেন চলাচল নেই, দু'একটী পথে 'বাস' যায়। ''ইরাবতী ফ্লোটিলা কোং'-এর ষ্টীমারগুলিই লোকদের যাতায়াতের এবং এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ক'রে দিয়েছে। আধ ঘণ্টার ভিতরই ষ্টীমার ছেড়ে, অপর পারে 'এল্লানমিও' নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হ'ল। এটী একটি ছোট পল্লী-শহর। বাজারটী বেশ বড়। কতকগুলো ষ্টীমার নিত্যই এদিক্‌কার প্রধান প্রধান শহরে যাওয়া-আসা করছে। এবার নদীর এপারের পাহড়গুলো যেন পল্লীর পাশ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে কালো মেঘজালে তাদের ছেয়ে ফেল্‌ল। বেশ এক পসলা বৃষ্টিও হ'য়ে গেল। একটু বাদেই আবার রোদের তাপ।

আমাদের জলযান সমবেগেই চলেছে। নদীর এপারে ওপারে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে —এখানে, সেখানে, শুধু দেখ্‌ছি অগণিত প্যাগোডার গর্ব্বোন্নত চূড়া যেন বিশ্বে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করছে। যেদিকেই চেয়ে দেখি—মন্দির আর মন্দির। যতই এগিয়ে যাচ্ছি পথে ঐ মন্দিররাজিই বিশেষ করে' দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দু'একটি বাজার বা পল্লীর পার্শ্বে চা'ল-কলের উঁচু চিমনিও দেখা যাচ্ছে। বেলাও প'ড়ে আসছে। শরীর ও মনে বেশ আরাম বোধ করছি। প্রত্যেক ষ্টেশনেই কত নূতন নূতন লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি। ষ্টীমারে যাত্রীদের সাথে অল্প সময়েই আলাপ আলোচনায় বেশ ভাব হ'য়ে যাচ্ছে। একটু বাদেই দু'চারটা ষ্টেশন পরে আবার তারা সবিনয়ে বিদায় নিয়ে মুখের সরল হাসির স্মৃতিরেখাটি মনের উপর এঁকে দিয়ে নেমে যাচ্ছে;—আবার নূতন যাত্রীর সমাগম হচ্ছে।

আজ আরও তিনটী ষ্টেশন 'মিওংবিনথা', 'সিমভমগু', 'মিনিওয়া'তে থেমে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই 'মু গিওংগি' নামক ষ্টেশনে এসে ফ্ল্যাটের সাথে আমাদের ষ্টীমার থাম্‌ল। আজ রাতে এখানেই থাকবে, কাল ভোরে আবার গন্তব্য পথে এগিয়ে যাবে। রাতটী সম্পূর্ণ বিশ্রাম। এ ষ্টীমারগুলো এ দেশে কয়লার পরিবর্ত্তে কাঠের আগুনে চলে। তাই মাঝে মাঝে কাঠ তুলে' নিতে হয়। এখানেও তাই রাতে কাঠ বোঝাই ক'রে নিলো। এখনও সূর্য্য অস্ত যায়নি। এই পড়ন্ত বেলায় যাত্রীরা সব নেমে পল্লীতে বেড়াতে গেল। আমিও বের হলুম। ষ্টেশনের কাছেই ছোট দু'চারটী দোকান। কয়েকজন ভারতীয়কে দেখ্‌লুম। নদীর নিকটে গরীব পল্লীটী। তার পার্শ্বে একই স্থানে পাশাপাশি বিশ-পঁচিশটী বৌদ্ধ-স্তূপ ও মন্দির—দু'একটী নূতন, অপরগুলো পুরাতন। দেখ্‌লে মনে হয়, এককালে এ পল্লীটী খুবই বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। এস্থানটী পাহাড়ে দেশের মত উঁচু ও ঢালু। এখান থেকে "মোটর বাস" কয়টী স্থানে যাওয়া-আসা কর্‌ছে। দূরে উঁচু পাহাড়ে আরও মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। সারি সারি পর্ব্বতমালা যেমন দাঁড়িয়ে আছে, এদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ-মন্দিরশ্রেণীও তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে,—দেখে' দেখে' সত্যই বুদ্ধ ভগবানের অসীম মহিমার কথা মনে হয়। কোন সুযোগে যেন অবেলার মেঘমুক্ত আকাশের গায়ে বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশের মাঝে সূর্য্যদেব ডুবে গেলেন। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীর বুকে তিমির জাল ছড়িয়ে দিলে—আমি আঁধারেই পথ দেখে' ফিরে এলুম। অনেক নূতন যাত্রী আসাতে ষ্টীমার ভরে' গেছে। যাত্রীরা আহার সমাপ্ত ক'রে বিশ্রাম আলাপে আসর জমিয়েছে। কাছেই একটি বর্ম্মী পরিবারের বিদায়-ব্যথার করুণ দৃশ্যটি দেখ্‌লুম। একটি বর্দ্ধিষ্ণু বর্ম্মী পরিবার অনেকদিন পরে কোথায় চলেছে—অপর একটি বন্ধুপরিবার তাদের বিদায় দিতে ষ্টীমারে এসেছে। উভয় দলের বাক্যালাপ, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, স্মৃতির জন্য কত উপহার-বিনিময়, তাদের ব্যথাপূর্ণ কাতর চাহনি পরিবেশটিকে অত্যন্ত করুণ ক'রে তুল্‌ল। কেউ কাউকে বিদায় দিতে যেন মোটেই ইচ্ছুক নয়। শেষে অশ্রুজলে বিদায়-পর্ব্বকে আরও মধুময় ক'রে দিয়ে গেল।

রাত নটায় কিছু খেয়ে নিলুম। ষ্টীমারের অপরদিকে আমার দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় এক সঙ্গেই আকৃষ্ট হ'ল। কয়টী বর্ম্মী তরুণ মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধা সুন্দর ঝক্‌ঝকে পোষাক প'রে,—একজন ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে, সঙ্গে একজন ছোট মন্দিরায় টুংটাং রবে তাল দিচ্ছে; অপর দু'জন গান ক'রে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য কর্‌ছে। যাত্রীদের ভিড় জমে গেছে, তাদের ঘিরে মেয়ে-পুরুষের আনন্দের রোল উঠেছে। আমিও দেখে মুগ্ধ হ'লুম। মনে হ'ল—কতদিন কত চাঁদনী রাতে রাস্তায়, নগরে, এদের এরূপ আনন্দ উৎসবে দেখেছি; এরা যেন স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌তে চায় সব সময়। একটু বাদে শুয়ে পড়্‌লুম—সকালে ষ্টীমার ছাড়্‌বে।

পরদিন চব্বিশে জুলাই—ভোরেই ষ্টীমারের শব্দে সহযাত্রীদের সাথে জেগে চোখ চেয়ে দেখ্‌লুম সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। ষ্টীমার রাতের বিশ্রামের পর নূতন উৎসাহে ঘাট ছেড়ে এগিয়ে চল্‌ল। ভোরের আলোর স্বর্ণকিরণ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। ইরাবতীর জল উচ্ছ্বাসভরে প্রভাতী আলোর নবীন স্পর্শে স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের সাথে নেচে নেচে ঢেউ খেলে চলেছে। যাত্রিগণ হাত মুখ ধুয়ে কেউ ত্রিপিটকের মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ছে, কেউ বা প্রার্থনায় মগ্ন, আবার একদল চা'য়ের দোকানে হল্লা লাগিয়েছে। আজ দেখ্‌ছি ইরাবতী ক্রমে যেন বিরাট রূপ ধারণ কর্‌ছে। উভয় তীরে পর্ব্বতমালা দূরে সরে গেছে, সমতলে শস্যক্ষেত্র ও ফুলফলের গাছ। আর সেই উজ্জ্বল সুন্দর মনোমুগ্ধকর শত শত প্যাগোডার উচ্চ চূড়ো উভয় তীরেই দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে দেবতার আশীষ জ্ঞাপন কর্‌ছে। প্রভাত-রবির প্রথম রশ্মি-রেখায় মহিমা-মণ্ডিত কতকগুলো সোনালিরঙের মন্দির তাদের সৌন্দর্য্য গরিমায় ঝলমল কর্‌ছে। এটা যে মন্দিরেরই দেশ, তা প্রাণে প্রাণে বোধ কর্‌ছি। জনপদে, নদীতীরে, পর্ব্বতের নীরবতার মাঝে সর্ব্বত্রই ঐ মন্দির।

ষ্টীমার ভর্ত্তি বর্ম্মী যাত্রী। তাদের আহার আমোদ ভোর হ'তে আরম্ভ হ'য়ে এখনও চল্‌ছে। একদল উড়িয়া কুলি এসে ষ্টীমারে উঠেছে। তারা যাচ্ছে "ইনান্‌জঙ," যেখানে "বি. ও. সি'র বিরাট তেলের খনি। উড়িয়া দলের সাথে আলাপ ক'রে জান্‌লুমঃ—হাজার হাজার উড়িয়া কুলী সেখানে কাজ করে।

বেলা সাড়ে আটটার মধ্যেই ষ্টীমার মিইনগান, ও ইথারতা নামক দু'টী ষ্টেশনে যাত্রী ও ডাক উঠিয়ে-নামিয়ে, আবার চলেছে। নিকটে পল্লীপার্শ্বে ঘন শ্যাম বনানীর শ্যামল শ্রী। দূরের পাহাড় হ'তে কোথাও ধূম উঠ্ছে, কোথাও বা কালো রেখার মত দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই নদীর পশ্চিম পারে একটি দেশী তৈল কোম্পানী পাহাড় খুড়ে তৈল বের করছে। তাদের পাম্প, মেশিন, ট্যাঙ্ক দেখ্‌তে পেলুম। কি আশ্চর্য্য ব্যাপারই না চল্‌ছে সেখানে! এ কোম্পানীর নাম মোল্লা অয়েল কোম্পানী। এদের ভূততত্ত্ববিদ্ একজন বাঙ্গালী। বেলা ন'টায় 'মিনবু' টাউনএ এসে ষ্টীমার থাম্‌ল। যাত্রীরা উঠা-নামা কর্‌ছে, ফেরিওয়ালীগণ ডাকহাঁক করছে —"মাল কাদি" "নেপিয়াদি" ; চেয়ে দেখ্‌লুম পেয়ারা ও কলা ; অবশ্য অন্য খাবার জিনিষও এনেছে। বেশ বিক্রিও হচ্ছে। এ শহরটী বিশেষ বড় নয়, তাহ'লেও এ দেশের জেলা টাউনের সবই আছে—একইভাবে তৈরী। এখানে চেয়ে দেখ্‌লুম একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার,—উঁচু পাহাড় একটিও বাদ যায়নি, প্রত্যেকটির উপরেই প্যাগোডা শ্রেণীবদ্ধভাবে চলেছে। উচ্চে, নিম্নে, দূরে, সম্মুখে—যতদূর চেয়ে দেখা যায়, শুধু বৌদ্ধ-মন্দির। মনে হয়, যতগুলি পাহাড়ের চূড়া, তার চেয়েও অধিক মন্দিরের চূড়া। বর্ম্মীদের অবস্থা যেমনই হউক, মন্দির করতেই হবে—এটি যেন প্রধান ধর্ম্মকার্য্য। কোন স্থানে পাশাপাশি ২০।২৫টি মন্দিরও আছে। ইরাবতীর দু'পারেই চোখ চাইলে ছোট বড় অগণিত মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ষ্টীমার হ'তে ভক্তগণ ঐ সব মন্দির পানে চেয়ে করজোড়ে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন কর্‌ছে। আজ সত্যিই 'প্যাগোডার দেশ' নামটির তাৎপর্য্য উপলব্ধি হ'ল। শুধু তাই নয়, এ দেশটী যে শস্যশ্যামল, নদী-বেষ্টিত, সাগর-চুম্বিত, মনোরম গিরিরাজী পরিবৃত, পরম সৌন্দর্য্যময়, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। এদেশ সত্যিই সোনার দেশ ; মণি, মুক্তা, সোনা, তৈল, কাঠ, টীন, সীসা, ধান, রবার প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ এদেশে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিধাতার রুদ্র বিধানে এরা আজ অর্থহীন, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। ভারতীয় চেট্টিগণ কোটি কোটি টাকা এদেশে ধার দিয়ে আজকাল আর আদায় করতে পারছে না। ঋণ শোধ

দেবার ক্ষমতা বর্ম্মী:দের নেই, তাই জমি-জমা দিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে দায়ী কে? এ দেশ ত পূর্ব্বে এমন গরীব ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বগ্রাসী উৎকট ক্ষুধা আজ ভারতের মত এদেরও ধন-প্রাণ-মন—সর্ব্বস্ব হরণ করেছে, ধ্বংস করেছে।

ষ্টীমারে কয়েকটী যাত্রীর সাথে আলাপ পরিচয়ে বেশ আত্মীয়তা হ'ল। আমি এদের সাথে যতই মিশেছি, ততই সরল ও উদার হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। বেশ ভদ্রতা জানে এরা। যদিও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এদের প্রসিদ্ধি, তাহ'লেও এদের ভিতর মহত্ত্ব ও মমতা যথেষ্ট আছে। আমি এদের পল্লীবাসী হ'তে আরম্ভ ক'রে শহরের শিক্ষিতদের সাথে মিশে দেখেছি; বড়ই অমায়িক অতিথিপরায়ণ জাতি এরা। ভিক্ষুদের সাথে কতদিন কত রাত যে কাটিয়েছি, এরা অন্তরের উদারতায় যেন জগৎকে আপন ক'রে নিয়েছে!

নদীর অপর পারে 'মাণ্ডই' জেলায় এসে ষ্টীমার থাম্‌ল। এখানে ড:ক ও যাত্রী নামিয়ে-উঠিয়ে, স্বচ্ছসলিলা ইরাবতীর প্রবল জলধারাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে ষ্টীমার আবার উজিয়ে চলেছে। এদিকে ভারতীয় কুলি নেই। ষ্টেশনে দেখ্‌ছি বর্ম্মী কুলিরা এসে মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে ফেরিওয়ালীদের ডাক-হাঁকও শুন্‌ছি। বেলা প্রায় দশটা হ'তে চল্‌ল, এবার ষ্টীমার 'ওয়েটমারুট' নামক ষ্টেশনে থেমে আবার চলল। অদূরে দেখা গেল, পাহাড়ের নিকট ছোট একটি ষ্টীমার আট্‌কে রয়েছে। তারা দূর হ'তে নানারূপ বংশীধ্বনি ক'রে সাহায্য চাইছে। আমাদের ষ্টীমার তাকে সাহায্য কর্‌তে এগিয়ে গেল। প্রথম একদল চট্টগ্রামের খালাসী বোট নিয়ে জলের মাপকাঠি সহ ষ্টীমারের আশেপাশে জল মাপতে আরম্ভ কর্‌লে। তাদের ভাষায় উচ্চ চীৎকারে সারেঙকে বলতে লাগল,— "একবাম মিলে না, এক বাম এক হাত, এক বাম দো হাত." ইত্যাদি। পরে সাহেব কাপ্তেনের আদেশে দুই ষ্টীমারে লোহার শিকল লম্বা তারের রশি বেঁধে টানা সুরু হ'ল, দশ মিনিটের চেষ্টায় ছোট ষ্টীমারখানা নেমে এলো। এবার আমাদের ষ্টীমার খানিকটা বিশ্রাম ক'রে প্রায় এগারটায় আবার চল্‌ল।

ইরাবতী কোথাও খুব চঞ্চল, আবার কোথাও সাম্য ভাব ধারণ করেছে। যতই এগিয়ে যাচ্ছি, দু'পারের মন্দির যেন বেড়েই চলেছে। নীরব গম্ভীর পর্ব্বত-ক্রোড়ে অথবা গিরিশিরে মন্দিরের শোভা বড়ই মনোরম। ভোর হ'তেই ইরাবতীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে ভেসে চলেছি। শান্ত স্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চালনে প্রাণমনকে বড়ই তৃপ্ত ও শান্ত ক'রে দিচ্ছে। এ দেশীয় ছোট বড় কয়টী নৌকো পাল তুলে পাহাড়ের গা-বেয়ে সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে চলেছে। বেলা বেড়ে উঠবার সঙ্গেই যাত্রীদের আহার আরম্ভ হয়েছে। এত সময় একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি—এ লাইনে টিকেট ষ্টীমারেই বিক্রয় হয়। তবে টিকেট বিক্রির এমন একটি নিয়ম রয়েছে, যাতে ষ্টীমারের সব যাত্রীকেই বিরক্ত ক'রে তোলে। একটি ঘাট ছেড়ে এলেই একজন খালাসী একটি বিকট ঘণ্টাধ্বনি ক'রে উপরে নীচে সর্ব্বত্র সাড়া দেয়,—যারা নূতন যাত্রী এসেছে, তাদের টিকেট কিনতে সতর্ক করবার জন্য। আবার কোন ষ্টেশনে ষ্টীমার থামবার পূর্ব্বেও ঐরূপ সাড়া দিয়ে যায়। আবার মাঝে মাঝেই চেকারের উৎপাত। এ ঘণ্টাধ্বনি আর টিকেট চেক করা সমস্ত দিন চলেছে। কাছে কাছেই ষ্টেশন, তাই অবিরত ঘণ্টা বাজ্‌ছে। রাত্রিতে ষ্টীমারগুলি চলাফেরা করে না, তাই রক্ষা।

ইরাবতীর জলধারা একদিকেই প্রবাহিত। দু'একটী শাখা নদী ক্ষুদ্র ধারা নিয়ে এসে ইরাবতীর বক্ষে মিশেছে। আমাদের ষ্টীমার বেশ দ্রুতই চলেছে, কারণ পথে ঐ ছোট ষ্টীমারকে নামাতে যতটা সময় দেরী হয়েছে তা এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূরণ ক'রে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাকে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গিয়ে পৌছতে হ'বে। রাত্রি সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ও কাপ্তেন দূরবাণ চোখে লাগিয়ে শুধু দেখ্‌ছে কতটা এল। ষ্টীমার পাড়ের ধার দিয়ে চলেছে। এপারটী উঁচু ও নীচু, অসমতল পাহাড়ে' জায়গার মত; একটু পরেই ইন্দো-বর্ম্মা অয়েল্ কোম্পানীর কতকগুলো ট্যাঙ্ক এবং তৈল ওঠাবার অনেক পাম্প পাহাড়ের উপর দেখ্‌তে পেলুম। কুলী-মজুর, কেরাণী সবাই কর্ম্মে ব্যস্ত। আরও এগিয়ে যেতে দেখ্‌লুম, বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর বিরাট ব্যাপার চল্‌ছে। শত শত পাম্প, মেশিন, ট্যাঙ্ক

ইনান্‌জঙ বর্মা অয়েল কোম্পানির তৈলখনি হইতে তৈল উঠান হইতেছে।
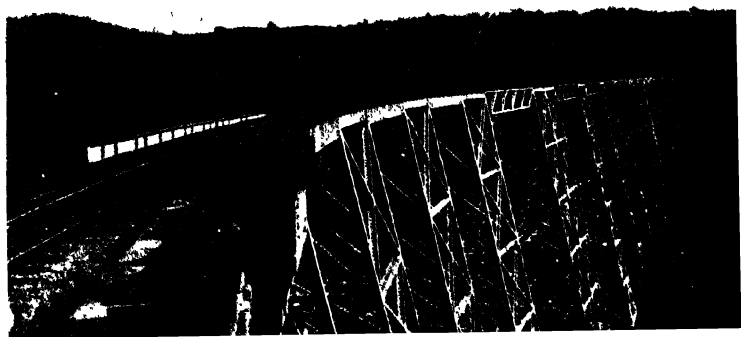
উপরে রেলের সুদৃঢ় পুল, নিচেতে বিখ্যাত 'গটীক গুহা'।

(১১৯ পৃষ্ঠায়

নদীর ধার দিয়ে মাইলের পর মাইল চলেছে। কি আশ্চর্য্য কৌশলে পাহাড়ের কত গভীর তলদেশ হ'তে তৈল চুষে তুলে নিচ্ছে। প্রায় দু'টায় এসে 'ইনান্‌জঙ' ষ্টেশনে ষ্টীমার থাম্‌ল, এখানেই বর্ম্মা অয়েল্‌ কোম্পানীর প্রধান তৈলের খনি। এর আশে পাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে কি অবাক কাণ্ডই না চলেছে। পাহাড় খুঁড়ে মাটীর বুক চিরে তৈল তুলে নিয়ে বিদেশী ধনী হচ্ছে; এদেশবাসী যে তিমিরে সে তিমিরেই। ইনানজঙ একটি জেলা-সহর,—অফিস, স্কুল, পুলিশ, কোর্ট, হাসপাতাল, সবই রয়েছে। দিনরাত কি বিরাট কর্ম্মপ্রবাহ এখানে চল্‌ছে। হাজার হাজার কুলি, নানা দেশীয় ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, ভূতত্ত্ববিদ্‌ আরও কত শত শত কর্ম্মচারী—এরা সকলেই কর্ম্মপ্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছে। এদের থাক্‌বার বাড়ীঘর, রাস্তা, বাজার—সবই এখানে হয়েছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে এখানে লাইনের পর লাইন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে ওঠে। নৈশ আঁধারে যেন আলোর জাল বুনে এক স্বর্গীয় মায়াকানন রচনা ক'রে দেয়। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার—সব ব্যবস্থাই রয়েছে। কোম্পানীর কাজের জন্য মোটর-লরি, ট্রলী, বাস, বোট, এদেশীয় নৌকো—সব কিছুই আছে। সাহেবদের বাংলোগুলো বেশ সাজান গোছান। তার সাথে খেলার মাঠ, ফুলের বাগানও আছে। বর্ম্মা অয়েল্‌ কোম্পানীর জন্য এস্থানটি বিশেষ বিখ্যাত। এই বিরাট তৈল খনির আশেপাশে বহু প্যাগোডা দাঁড়িয়ে আছে। এস্থানে একটি ভারতীয় তৈল কোম্পানীও ছিল। তার নাম "নাথ সিং তৈল কোং।" অপর দু'একটি বর্ম্মী কোম্পানীও আছে; একটির নাম 'নাথুঙ্গা কোং'। 'বি. ও. সি'র তুলনায় এরা অতি নগণ্য হ'লেও চলেছিল মন্দ নয়। আজ তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা জানিনে। সত্যিই 'বি. ও. সি'র কারখানা দেখ্‌লে অবাক হ'তে হয়। ষ্টীমার এখানে একটী ফ্ল্যাটের সাথে প্রায় আধ ঘণ্টা থেমে রইল। সারাদিন ঐ কলগুলো তৈল তুল্‌ছে। তারপর তৈল পরিষ্কার হ'য়ে পেট্রল, কেরোসিন, ভেসলিন, ক্যাণ্ড্‌ল মেটে তৈল প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হ'য়ে জগতের অভাব দূর করছে। এখান হতেই 'বি. ও. সি' নদীর ধার দিয়ে জঙ্গল ও পাহাড়ের মাঝ

দিয়ে মোটা লোহার পাইপ বসিয়ে তার ভিতর দিয়ে তিন চারশত মাইল দূরে রেঙ্গুনের অতি নিকটে 'সিরিয়াম' নামক বন্দরে তৈল পাঠাচ্ছে। সেখানে বিরাট বিরাট ট্যাঙ্কে গিয়ে তৈল জমা হচ্ছে। রাস্তার মাঝে মাঝে আবার ঐ পাইপের লাইনটিকে পাহারা দেবার ব্যবস্থা আছে,—কোথায় ছ্যাঁদা হ'ল বা বন্ধ হ'ল, নিত্যই অনুসন্ধান চল্‌ছে। ষ্টীমার আবার ছেড়ে চল্‌ল। নদীর পার ধ'রে আরও কয়েক মাইল জুড়ে 'বি. ও. সি'র তৈল উঠান চল্‌ছে। তারপর অপর পারে সিনবিউগিউন ষ্টেশনে ষ্টীমার এসে ধর্‌ল। এখানে অনেক যাত্রী নেমে গেল। নদীর ধারেই এখানকার বাড়ী-ঘরগুলো বর্ষার জলে ভাস্‌ছে। ছোট একটি বাজার আছে, ভারতীয় কয়টি ব্যবসায়ীও এখানে আছেন। এধারের পাহাড়গুলি অনেক দূরে সরে গেছে। নদীর পারে অনেক চাষের জমি আছে।

ষ্টীমার ছেড়ে চলল, কোন কোন পল্লীপার্শ্বে দেখ্‌লুম, ঘন তালগাছের সারি। এদিকে তালের গুড় যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশে আরও দু'চার জায়গায় উৎকৃষ্ট তালগুড় প্রচুর পাওয়া যায়। এবার আমরা সেল ষ্টেশনে এসে হাজির হ'লুম। ষ্টীমার ঘাটে লাগ্‌ল, এস্থান তুলার জিনিষের জন্য বিখ্যাত। ফেরিওয়ালীরা রঙ-বেরঙের তাকিয়া, বালিশ, আসন, প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ ষ্টীমারে বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছে; দামও খুব সস্তা। এখান থেকে ছেড়ে অল্প সময় পরেই ষ্টীমারখানা চোক এসে থাম্‌ল। আজ রাত্রি এখানেই সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বর্ম্মী যাত্রীদের আহার আরম্ভ হ'ল। কয়েকজন ভিক্ষু সান্ধ্য প্রার্থনায় মগ্ন; দু'একজন বৃদ্ধ মালা জপ ক'রে মন্ত্র পাঠ কর্‌ছেন। সবাই করজোড়ে আলোকমালা-সজ্জিত শহরের প্যাগোডার পানে তাকিয়ে প্রণতি জানাচ্ছে।

আমি ষ্টীমার হ'তে নেমে শহর দেখ্‌তে বের হ'লুম। এটী মহকুমা শহর। বৈদ্যুতিক বাতিতে নৈশ আঁধারকে দূর ক'রে দিয়েছে। এগিয়ে যেতেই পাশে দেখ্‌লুম—'বি. ও. সি'র মেশিনারী কারখানা, এখানে দিনরাত কাজ চল্‌ছে। রাস্তার অপর ধারে বড় বড় তৈলের ট্যাঙ্ক। আজ দুপুর হ'তেই এসব দেখে, দেখে, চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেছে। এখান হ'তে সর্ব্বদা বি. ও. সির তৈলখনি

"ইলাগ্লঙ্" বাস যাচ্ছে ও আসছে। এশহরটী খুবই জনতাপূর্ণ। কারখানার, মিলের, তৈল-খনির হাজার হাজার কুলি, কেরাণী এখানে বাস করে। কতক ভারতীয় ব্যবসায়ীও আছেন। প্রায় একঘণ্টা ঘুরে বাজার ও শহরটী দেখে ষ্টীমারে ফিরে চল্লুম। পথে একটী গলির মোড়ে দেখ্লুম পর্দ্দা-খাটান একটা ছোট ঘরে কয়েকজন বর্ম্মী মহা উৎসাহে জুয়া খেল্ছে, এরূপ গুপ্ত জুয়ার আড্ডা এদেশে অনেক সহরেই রয়েছে। সারারাত এখেলা চল্বে। এতে অনেক ধনীকেও পথের ভিখারী হ'তে দেখা যায়। মাঝে মাঝে পুলিশ হানা দিয়ে পাকড়াও করে, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় ব'লে মনে হয় না। এসব শহরে যেখানেই বাঙালী বেশী রয়েছে সেখানেই তাদের একটি না একটী ঠাকুরবাড়ীও আছে,—কালীবাড়ী, দুর্গা-বাড়ী অথবা হরিসভা। এখানেও সেরূপ একটি আছে। কোথাও বা ক্লাবঘরও রয়েছে। বিশ্রামান্তে আহার সমাপন ক'রে বর্ম্মী বালকদের সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রে ঘুমিয়ে পড়লুম। জলপথে ঘুরে ঘুরে নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না এবং প্রাণেও প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি।

আবার পরদিন ভোর সকালেই প্রায় ছ'টায় ষ্টীমার ছেড়ে চল্ল। প্রভাতী আলোর নবীন স্পর্শে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। ভোরের পাখী ডালে বসে' সুমধুর স্বরে গান গাইছে। আমাদের জলযানও বিজয় উল্লাসে জলধারাকে তরঙ্গায়িত ক'রে শোঁ শোঁ রবে পাড়ী জমিয়েছে। আজ ষ্টীমারে একজন পরিচিত বাঙালী যাত্রীর দেখা পেলুম। তিনি বিশেষ কি দরকারে এদিকে এসেছিলেন; আজ ফিরে যাচ্ছেন। তার সাথে একটু আলাপ হ'তেই তিনি বল্লেন, "আমিও আপনার সাথী হ'ব, ক'দিন বিশেষ কোন কাজ নেই।" শুনে আমার খুবই আনন্দ হ'ল। এ ভদ্রলোকটির সঙ্গে অনেক গল্প-গুজব আজ হ'ল। আধঘণ্টার মধ্যেই সিঙ্গু ষ্টেশনে এলুম। ষ্টীমার তার কর্ত্তব্যদায় মুক্ত হ'য়ে ছেড়ে চল্ল। নদীর অপর পারে ইন্দো-বর্ম্মা পেট্রল কোং (I. B. P.) অবাক্ কাণ্ড করেছে, দেখে খুবই আশ্চর্য্য হ'তে হ'ল। তারা নদীর মাঝে জলের ভিতরে পাম্প বসিয়ে তৈল

তুল্‌ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নদীকে বাঁধিয়ে তার উপর পাম্পের লাইন বসিয়েছে। শুন্‌লুম, এখানে নাকি তারা প্রচুর তৈলের সন্ধান পেয়েছে। তৈল উঠ্‌ছেও যথেষ্ট। হাজার হাজার কুলী ও অফিসার কর্ম্মব্যস্ত। তাদের যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে পাঠাবার জন্য লাইন বসিয়ে মোটর-ট্রলির ব্যবস্থা আছে। কাছেই অফিসারদের কোয়ার্টার্স্‌ এবং কুলী ব্যারাক। নদীর ধার দিয়ে সীমাহীন পাহাড়ের লাইন চলেছে। ভূতাত্ত্বিকগণ দিনরাত মাটি আর পাথর খুঁড়ে পরীক্ষা কর্‌ছেন,—কোথায় কোন্‌ পাহাড়ে বা সমতলে তৈল রয়েছে। সাগর পাড়ী দিয়ে কোন দূরদেশ হ'তে বিদেশী এখানে এসে মাটির রস চুষে নিয়ে ধনপতি হচ্ছে। যাত্রীদের প্রাতরাশ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। শুন্‌লুম, আজই আমরা দশটায় পাগান নগরীতে পৌঁছব। এর মধ্যে লনিয়া ষ্টেশন পার হ'য়ে এলুম। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা হ'বে। এবার ষ্টীমারখানা শূন্যগাত্র পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলেছে। ধীর গম্ভীরভাবে, খুবই পরিশ্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ্‌লুম, কাছে কোন পল্লী নেই, শুধু আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি। তাই এখানে কোন প্যাগোডার চূড়া দেখছি না—মনে হ'ল এ যেন বিধাতার নির্ম্মম অভিশাপ। কিন্তু খানিক বাদেই আবার দু,তিনটি প্যাগোডা দেখ্‌তে পেলুম।

নদীর পার দিয়ে তৈল সরবরাহের পাইপ ও টেলিগ্রাফের তারের লাইন চলেছে। এবার ষ্টীমার ইনান্‌জেট ষ্টেশনে এসে থাম্‌ল। বি. ও. সি. এদেশে সর্ব্বপ্রথম এখানেই তৈলখনি আবিষ্কার করেছিল। এখানকার পাহাড়গুলোর গা খুঁড়ে শত শত পাম্প বসিয়ে তৈল উঠান হচ্ছে। অসংখ্য কর্ম্মীদল কাজে নিযুক্ত। কি উৎসাহে কর্ম্মপ্রবাহ চলেছে দিনের পর দিন! বর্ম্মী মেয়ে ও পুরুষ কুলীরা যাত্রীদের পানে চেয়ে হাস্‌ছে ও চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছে। তাদের স্বাভাবিক সরল প্রাণের আনন্দে মুখে সর্ব্বদাই যেন হাসি লেগে আছে। ষ্টীমারেও দিনরাত দেখ্‌ছি, এদের আনন্দের উচ্ছ্বাস, হাসির হল্লা, শিশু হ'তে বৃদ্ধ সবারই। এখানে একটি কথা মনে হ'ল, জানি না এই "ইনান্‌জঙ" নাম

হ'তেই কেরোসিনের এক নাম "ইনাঞ্জি" হয়েছে কিনা। ষ্টীমার ছেড়ে চল্ল। এই ষ্টেশন হ'তেই দু'জন পুলিস প্রহরী একটী চীনা ও একটী বর্মীকে হাতকড়ি দিয়ে ষ্টিমারে উঠিয়ে নিয়ে চল্লো। শুন্‌লুম বেচারীরা নাকি গুপ্ত আফিম বিক্রির অপরাধী। মনে হ'ল এদেশের আফিম বিক্রির গুপ্ত আড্ডাগুলি সরকারের চোখে ধুলি দিয়ে দিব্যি চালাচ্ছে। নিয়ম হ'ল সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে যে-সব আফিম-খোঁরদের পাস দেয়, তারাই শুধু নির্দ্ধারিত পরিমাণ আফিম কিনতে পায়। কিন্তু যারা বেশী খায় অথবা পাস পায় নাই তারাই এই সব গুপ্ত দোকানের গুপ্ত গ্রাহক। এ ব্যাপারে একদল পুলিসকে সর্ব্বদা সতর্ক ও ব্যস্ত থাক্‌তে হয়।

অপরাধীদের প্রতি যাত্রীদের অনেকের সহানুভূতির দৃষ্টি পড়ল। তারা নিশ্চিন্তে ব'সে, চুড়ুট টান্‌ছে। চেয়ে দেখ্‌লুম একটু ঘুরে যেতে হচ্ছে। এখানে নদীর মাঝে একটি চূড়া আছে। এবার ইরাবতী আর তত প্রশস্ত নয়। যাত্রীদের ভিতর যাদের সাথে এ কয়দিনে বেশ ভাব জমেছিল, তারা ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল; কারণ পরের ষ্টেশনেই আমাকে নামতে হ'বে। সবাই এক্‌টী আগ্রহপূর্ণ ও ব্যথা-করুণ দৃষ্টিতে আমায় দেখ্‌তে লাগল। একটু বাদেই এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে যাব। আমি যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু হ'য়েও বৌদ্ধতীর্থ দেখ্‌তে এসেছি এতে যেন আমার প্রতি এরা আরও বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছে। একটু বাঁক ঘুরতেই নদীর মাঝ থেকে দেখ্‌তে পেলুম,—অপর পারে ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরময় পাগান নগরীর অপূর্ব্ব শোভা। পাগানের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলুম। যাত্রিগণ যুক্তকরে প্রণাম ও প্রার্থনা করছে। ষ্টীমার আজ তিন দিনে এসে পাগান পৌঁছল। তখন বেলা প্রায় দশটা। মন্দির এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যে দেখে মনে হ'ল যেন কোন্ মুহূর্ত্তে ইরাবতী এদের গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে।

আমি বাঙালী সহযাত্রী বন্ধুটিসহ তীরে নেমে বর্ম্মী একটি কুলীর মাথায় জিনিষ পত্র সব দিয়ে পাগান বাজারে এসে উপস্থিত হ'লুম। গ্রাম্য ক্ষুদ্র বাজার, বেলায়

আরম্ভ হয়, কয় ঘণ্টা বাদেই আবার বন্ধ হয়ে যায়। এখানে অনেক খুঁজে একটি ভারতীয় "কাকার" দোকানে গিয়ে হাজির হ'লুম। আর বিদেশী লোক এখানে নেই। নদীর ধারে সুন্দর ডাক বাংলো রয়েছে; কিন্তু আহারের ব্যবস্থা নেই। তবে বর্ম্মী খাবারে যারা অভ্যস্ত তারা নিশ্চিন্ত। এতদিন এদেশে থেকেও কিন্তু বর্ম্মী খাবারে অভ্যস্ত হ'তে পারি নি। ভারতীয় 'কাকা' এক বর্ম্মী মহিলাকে বিবাহ করেছে। তারা উভয়ে আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করল। আমরা ইরাবতীর জলে অবগাহন ক'রে এসে মহা তৃপ্তিতে আহার সমাপন করলুম। দুপুরে রোদের তাপ, খুবই গরম; নিম্ন বর্ম্মায়, রেঙ্গুনে কিন্তু এখনও বৃষ্টি চল্‌ছে। একটু বিশ্রামান্তে একটী বর্ম্মী গাইড নিয়ে ইতিহাস-বিখ্যাত পাগান নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে বের হ'লুম। গাইডকে তার দেশীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করলুম —"ইংলি দাগা তিরিলা?" সে উত্তর দিলে "ছায়া মুতিবু।" আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "হিন্দি ছাগা?" সে অমনি উৎসাহে উত্তর দিল, "ছায়া, নে, নে, তিরে।" আমি খুশী হয়ে বল্‌লুম,—"কাউণ্ডে?" অর্থাৎ "তুমি ইংলিশ জান?" "না, মশাই।" "হিন্দী জান?" "একটু একটু জানি।" "বেশ ভাল"।

গাইড্ আমাদের নিয়ে প্রথমে লুপ্ত-প্রায় ধ্বংসাবশেষ রাজবাড়ীর ধার দিয়ে মন্দিরের নিকটে নিয়ে গেল। কি আশ্চর্য্য! যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু শত শত মন্দির, স্তূপ, বিহার—ভগ্ন, অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় বনানীর অন্তরালে লুকিয়ে আছে, কতক বা মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। অবশ্য কতকগুলো বিখ্যাত মন্দির আজও এ দীর্ঘ দিন পরে অটুট অবস্থায় পাগানের পূর্ব্ব স্মৃতি বক্ষে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অফুরন্ত এ মন্দির-শ্রেণীর যেন কোন সীমা নেই,—চলেছে ত চলেছেই; চারিদিকেই শুধু মন্দির আর মন্দির। জগতে বোধ হয় কোথাও একস্থানে এত মন্দির নেই, এ যেন মন্দিরের একটি বিরাট পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র। ইংরেজ লেখকগণ এ পাগানকে বলেন "সিটি অব্ রুইণ্ড্ প্যাগোডাস্"। কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ সংসারে মানুষ যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে একটু নিরালায় বিশ্রাম আনন্দ উপভোগ করে, তখন এদেশের পল্লীবাসী বুড়ো বুড়ী গল্পের ছলে পাগানের রাজাদের
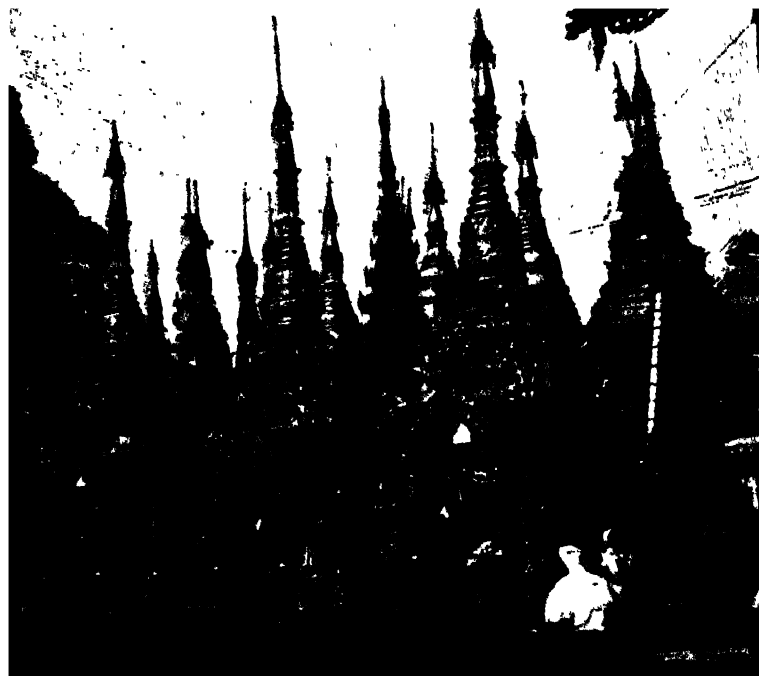
মন্দিরময় ব্রহ্মদেশ। এই সব মন্দিরে দারুশিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের পরিচয় রয়েছে।

পুণ্যকাহিনী বল্‌তে বল্‌তে, পাশের যুবক ও বালকদের উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে! এখানকার কয়টি সুন্দর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ ক'রে ঘুরে ঘুরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাদের নির্ম্মাণ-কৌশল ও বিচিত্র কারুকার্য্য এবং বিভিন্নভাবের শত শত বুদ্ধমূর্ত্তি দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হ'লাম। আজও ভক্তগণ এসব মন্দিরে ধূপ, দীপ জ্বেলে দেবতার কাছে প্রার্থনা ও অঞ্জলি দিয়ে যায়। অত দিনের পুরানো মন্দির, আজও দাঁড়িয়ে থেকে দেবতার গৌরব ঘোষণা করছে এবং তাঁর শুভাশিস্ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। "আনন্দ" মন্দিরের রূপ-সৌন্দর্য্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, ঐ মন্দিরতল হ'তে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। এখানকার পুরানো সব মন্দিরই প্রায় ভারতীয় ভঙ্গীতে তৈরী। ভারতের সাথে যে এদের বেশ একটা যোগ-সম্বন্ধ ছিল, তা এখানকার ধ্বংসপ্রায় বিষ্ণুমন্দিরটিই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্ত্তমানে এখানকার "আনন্দ" প্যাগোডাই সবচেয়ে সুন্দর, বৃহৎ ও উঁচু। তারপর 'তেবিনিয়া', 'গডাপলিন', 'মহাবোধি', 'গো-য়ে গো-জি', 'লোকানন্দা', 'মনুয়া' এরূপ অনেক সুন্দর কারুকার্য্যময় মন্দির রয়েছে। একটি মন্দিরের শতাধিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে' পাগান নগরীর বিশাল মন্দির-রাজির ভগ্নদশা দেখে' সত্যিই প্রাণে কেবল ব্যথা নিয়ে নেমে এলুম। যে দিকেই চাই, যে পথেই যাই, শুধু মন্দির। কত অর্থ ব্যয়ে ও কত আগ্রহে, কত পরিশ্রমে, কত কলা-কৌশলে এমন মন্দির তৈরী হয়েছিল, আজ তার ইতিহাস কিছুই নেই। সবই অতীতের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে। এখানকার ব্রহ্মরাজগণের রাজত্বকালে এদেশ সব দিকেই উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল—ধর্ম্ম, শিক্ষা, জ্ঞান, শৌর্যবীর্য্য। রাজা পিন্‌বিয়া হ'তে আরম্ভ ক'রে ৫৫ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন। এ রাজবংশের ব্রহ্মরাজ "অনারাযাই" প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র দেশকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করেন এবং জনগণের ধর্ম্মের জন্য অকাতরে দান, মন্দির ও বিহার নির্ম্মাণ, ভিক্ষুগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি করেছিলেন। নিকটে বৃটিশ সরকারের রক্ষিত এখানকার প্রাপ্ত জিনিষের যাদুঘরে শিলালিপিতে রাজাদের এসব দান-ধর্ম্ম ও গৌরবের কত কথাই না

ক্ষোদিত রয়েছে। আমার সঙ্গী বন্ধুটী মাঝে মাঝে দু'একটি প্রশ্ন করা'তে গাইড তার যথাযথ উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেছে। গাইড আমাদের নিয়ে অনেকটা ঘুরে' দেখাল। আমরা পরিশ্রান্ত হয়েছি। বেলাও পড়ে' এল, বর্ম্মী রাখাল ছেলেরা গরু-মোষ নিয়ে বাড়ী ফিরে চলেছে। পাপিয়া বনানীর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বেলাশেষের গান গেয়ে বাসার পানে ফির্‌ছে। কয়টী সাঁজের প্রদীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। নিকটে বৌদ্ধ বিহার হ'তে সান্ধ্য আঁধার ভেদ ক'রে গম্ভীর মধুর ঘণ্টানিনাদে দেবতাকে স্মরণ করবার সময় জ্ঞাপন কর্‌ছে। ফেরবার পথে আজ এখানকার কত অতীত স্মৃতিই না মনকে বেদনা ও আনন্দ দিতে লাগ্‌ল। মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নপুরী ঘুরে' এলুম। রাতের আহারের পর 'কাকা'র দোকানেই বিশ্রাম করলুম।

পরদিন প্রত্যূষে আবার বের হ'লুম। মাঠের মাঝ দিয়ে, পল্লীর পাশ দিয়ে, নদীর ধার দিয়ে কত যে মন্দির ও স্তূপ। সব মন্দিরই বহুমূল্য রত্ন শোভিত ছিল, আজও তাদের দু'চারটী স্বর্ণছত্র বা মুকুট মন্দির শীর্ষে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এ যেন স্বপ্নের ঘটনা—কেউ না দেখ্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে না। কত হাজার মন্দির যে এখানে ছিল, তার সংখ্যা নির্দ্দেশ আজও সম্ভব হয়নি। তবে কয়েক হাজার মন্দিরের ধ্বংসপ্রায় চিহ্ন আজ বর্ত্তমান।

আজ এ নগরী যতই অনিসন্ধিৎসু হ'য়ে দেখা যায়, ততই যেন সেই ব্রহ্ম রাজগণের বীরত্ব ও মহত্ত্ব গৌরবে নির্ব্বাক ইতিহাস এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে সজীব বোধ হয়। স্বাধীন ব্রহ্মের কত কথাই না মনে জেগে ওঠে, ভারতের সাথে যে এদেশের কত আপনার ভাব ছিল তা এখানকার কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখ্‌লে স্বাভাবিকই মনে হয়। ভারতের শিক্ষা, ভারতের জ্ঞান, এঁরা যে কি ভাবে আহরণ ক'রে ছিলেন, এবং দানে ধর্ম্মে কত উদার ও স্বধর্ম্ম প্রচারে কেমন বদ্ধপরিকর ছিলেন, তা ভাব্‌লে অবাক হ'তে হয়। এ পাগান যে একদিন ব্রহ্মের শিক্ষা-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল তা' আজ এখানকার ভগ্নপ্রায় প্রত্যেক ইটখানা পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রাণের আবেগে আজ এই ধ্বংস-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বল্‌তে ইচ্ছা হয়, কোথায় হে বৃটিশ-শাসিত নব্য শিক্ষিত ব্রহ্মবাসী বুদ্ধিমান যুবকগণ! এস, দেখে-যাও তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি ও স্মৃতি-স্তম্ভ। তাঁদের বীরত্বের স্মৃতি নিয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোল—তবেই তোমরা প্রকৃত বর্ম্মাদেশবাসী জাতি ব'লে পরিচয় দিতে পারবে। এস আজ এই ধ্বংস-স্তূপকে রক্ষা কর; যেমন খৃষ্ট ভক্তদের জেরুজেলাম, মুসলমানদের মক্কা, হিন্দুদের বারাণসী, সেরূপ তোমাদেরও এ পবিত্র পূণ্যতীর্থ। শুধু ধর্ম্মের নয়—এযে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বীরত্বের স্মৃতি জড়িত পূত-পবিত্র ভূমি। এখানে এলেই সন্ধান পাবে ভারত ও ব্রহ্মের প্রাণ যে একই সূত্রে বাঁধা ছিল। বের কর এখানকার ইতিহাস মাটী খুঁড়ে, আর শোনাও দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবকদের—এখানকার রাজগণের বীরত্ব ও মহত্ত্বগাথা। তবেই মানুষ হবে, শীর্ণ প্রাণ-স্রোতে জীবনের জোয়ার আসবে।

পাঁচ মাইল দূরে নেওগো মহকুমা শহর। এখান হ'তে বাস সর্ব্বদা যায়। আমরা বাসেই সেখানে গিয়ে মন্দিরময় শহরটী দেখ্‌লুম। এ পাগানেই বর্ম্মার সুবিখ্যাত গালার সুন্দর সুন্দর জিনিষগুলো তৈরী হয়। এখানে একটি বর্ম্মী ডাক্তারের সাথে আমাদের আলাপ পরিচয়ে যথেষ্ট ভাব হ'ল। ডাক্তার ইংরেজী জানেন না। তিনি বৈকালে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আশে পাশের আরো অনেকগুলো মন্দির আমাদের দেখালেন। রাতে তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে হ'ল। তিনি আমাদের মত ক'রে খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। রাতভ'র তাঁর সাথে পাগানের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা হ'ল। লোকটি যে কি অমায়িক, আজও তাঁর কথা মনে হয়; আর আজও মনে পড়ে নৈশ আঁধারে ডাক্তারের ভাই 'মংছিনে'র সুমিষ্ট 'ভায়োলিন'-এর সুরে মুগ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। আমাদের আরাম দেবার জন্য তাঁর কতই না আগ্রহ। তিনি এ মহকুমার বিখ্যাত সুরযন্ত্রী!

দু'দিন পাগানে কাটিয়ে ষ্টীমার যোগে 'পক্‌কো' রওনা হ'লুম। নিত্যই দু'দিক থেকে দু'খানা ষ্টীমার আস্‌ছে ও যাচ্ছে। ইরাবতীর বক্ষ হ'তে আজও পাগান নগরীর অপূর্ব্ব সুন্দর মন্দির-শোভার ভিতর "আনন্দ প্যাগোডার"

অমলধবল রূপটী দর্শককে মোহিত ক'রে দেয়। যতই চেয়ে দেখ্‌ছি, পাগানের দৃশ্য প্রাণ ভ'রে দেখেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না, শুধু চেয়েই আছি। ষ্টীমার এবার বেশ জোরে চলেছে। ধীরে ধীরে পাগানের দৃশ্যটী দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। অতীত গৌরবময় পাগান চোখের দৃষ্টি থেকে বিদায় নিয়ে অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে ষ্টীমার দুই ষ্টেশনে যাত্রী উঠিয়ে নামিয়ে এসেছে। পাহাড়গুলো নদীর ধার হ'তে অনেকটা দূরে সরে গেছে। দেখতে দেখতে নদী পাড়ী দিয়ে ষ্টীমার পক্‌কোর কাছে এল। দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ষ্টীমার ঘাটে থাম্‌বে। অপর পারে ঐ আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি দূর হ'তে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। আজকে ষ্টীমারে বন্ধু আমার গান ও কথকতায় বেশ আসর জমিয়ে দিলো। যাত্রীরা আনন্দে অবাক হ'য়ে শুন্‌ছিল। ঠিক বারটায় ষ্টীমার পক্‌কোয় থাম্‌ল। আমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসা জানা নেই বলে তাঁর অফিসেই চল্‌লুম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি মহানন্দে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিকটেই তাঁর বাসায় নিয়ে এলেন এবং আদর-আপ্যায়নে অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লেন। ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই বাঙালীদের অতিথিপরায়ণতার সুখ্যাতি আছে। পরদিনই এ সহরটি ঘুরে' বেড়িয়ে দেখ্‌লুম।

পক্‌কো একটি ডিষ্ট্রিক্ট টাউন। নদীর ধারে বেশ বড় শহর। মান্দালয়ের পরই এখানকার বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় আটাশ তিরিশ হাজার লোকের বাস এ শহরে কয়টি বড় প্যাগোডা এবং কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার আছে। এখানকার একটি বিশেষত্ব, রাস্তার উভয় পার্শ্বে শত শত নিম গাছ দাঁড়িয়ে থেকে শহরটিকে শান্ত শীতল স্বাস্থ্যবান ক'রে রেখেছে। এসব গাছ কাটা নিষেধ। এ স্থানটি গ্রীষ্ম-প্রধান, গরমের সময় প্রায় ১২২°।২৪° উত্তাপ অনুভব হয়। কখনও কখনও বিধাতার আশীর্ব্বাদে বৃষ্টি হয়। এ দেশে অপরাপর শহরের মত ভারতীয় ব্যবসায়ী, কেরাণী, উকীল প্রভৃতি আছেন, কিন্তু ভারতীয় কুলী এখানে নেই। চীনেদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে বেশ চল্‌ছে। শহরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, তাই রাস্তায় বের হ'লেই দলে দলে ভিক্ষু দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের

জমিগুলো বালিপূর্ণ। ধান বড় একটা হয় না। চীনা বাদাম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। তালগাছ যথেষ্ট থাকায় তালগুড়ও প্রচুর হয়। এখানকার লুঙ্গিও বিখ্যাত। আর এখানেই বর্ম্মার বিখ্যাত টাটুঘোড়া পাওয়া যায়। এসব জিনিষ ইরাবতীর ষ্টীমারে 'রেঙ্গুন' শহরে চালান যায়। এখান হ'তে ট্রেনে যাবার কোন ব্যবস্থা নেই।

পক্‌কোয় দু'দিন থেকে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা সাড়ে বারটায় ষ্টীমারে "মিন্‌জাঙ" রওনা হ'লুম। দূরে চোখে পড়ল ব্রহ্মের বিখ্যাত সুউচ্চ পোপা পাহাড়। পোপা এদেশের একটি বিরাট আগ্নেয়গিরি, যদিও বর্ত্তমানে তার অগ্নির উৎপাত নেই। ওখানে পাহাড়ের উপর কয়টী সুশোভন পুরানো প্যাগোডা ও বিহার আছে। পোপা পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মানুষকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ ক'রে দেয়। প্রতি বৎসরই অনেক ভক্ত ও দর্শক তীর্থ কর্‌তে ওখানে যায়। প্রায় চারটায় এসে মিন্‌জাঙে ষ্টীমার পৌঁছল! আজ এখানেই রাত্রিবাস করবে, কাল সকালে ছেড়ে দুপুরের মধ্যেই মান্দালয় পৌঁছবে। আমরা মিঃ গুহ উকীলের বাসায় উপস্থিত হ'লুম। এখানে বাঙালী খুবই কম। তাহ'লেও মিঃ গুহের প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

পরদিন শহর দেখতে বের হ'লুম। এটীও ডিষ্ট্রিক্ট টাউন। এক দিকে নদী, অপর দিকে পর্ব্বত প্রাচীর, মাঝখানে এ শহরটী সুন্দর ছবির মত। অন্য সব জেলার মতই এর সব অফিস, হাসপাতাল, জেল, বাজার,—সবই আছে। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থা পক্‌কো হ'তে অনেক উন্নত। রাস্তাঘাট সব বাঁধান, পরিষ্কার, প্রশস্ত; বিজলী বাতিও আছে। এ শহরটিও নিমগাছের শীতল ছায়ায় ছেয়ে আছে। এখানকার সিভিল লাইনটী বড়ই সুন্দর স্থানে তৈরী। নদীর ধারেই ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের একটী শাখাও আছে। বৃষ্টি এখানে ক্বচিৎ কখনো সামান্য দু'এক পশলা হয়। অন্য শহরের মত বিভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা কর্‌ছে; ভারতীয়ও আছে। জাপানীদের কয়টী তুলার কল এখানে বেশ চল্‌ছে; এদেশীয় দু'একটিও আছে। এ স্থানটী ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। তার বিশেষ কারণ, এখান হ'তে ব্রহ্মের সর্ব্বত্র ট্রেন চলাচল করে।

শহরের পাশেই রেল-ষ্টেশন। জলপথে, স্থলপথে, দু'ভাবেই এখান হ'তে জিনিষপত্র আমদানী রপ্তানি হ'তে পারে, এটা বড়ই সুবিধাজনক। এখানকার জমিতে সব ফসলই জন্মে। এ শহরে লোকসংখ্যা খুব বেশী নয়। বৌদ্ধ প্যাগোডা ও বিহার ত রয়েছেই। পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি বর্ম্মী ও চীনা বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যায় গ্রামোফোন চল্‌ছে! এদেশে সর্ব্বত্রই বর্দ্ধিষ্ণু বাঙ্গালীদের মধ্যেও এর প্রচলন বেশ। একটা হোটেলে একজন চীনার খাওয়া দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম,—ছোট একটী বাটিতে খানিকটা মাংস ও ভাত নিয়ে বাঁ হাতে সেটী মুখের কাছে ধরে' ডান হাতে দু'খানা ছোট পাতলা বাসের চটা আঙ্গুলের ফাঁকে অপূর্ব্ব কৌশলে নেড়ে চেড়ে দিব্যি তার সাহায্যেই অতি সহজে ভাত ও মাংস তাড়া তাড়ি মুখে তুলে দিচ্ছে। অদ্ভুত কৌশলই বটে। এখানে হিন্দুদের একটি কালীবাড়ী আছে এবং একটি ক্লাবঘরও রয়েছে। তাতে দু'তিনটি সংবাদপত্রও দেখ্‌লুম; কয়জন গুজরাটী ব'সে পড়ছে। এখানে হিন্দু-মুসলমানের একটি 'মেস' দেখে' খুবই অবাক হ'লুম। সবাই ভদ্রঘরের ছেলে এবং চাকুরে। বেশ সদ্‌ভাবে বন্ধুর মত মিলেমিশে রয়েছেন। তাঁদের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নই নেই। সহরটী বেশ ভালই লাগ্‌ল। আমরা পরদিনই স্থলপথে মান্দালয় রওনা হ'ব স্থির হ'ল।

মান্দালয়

প্রাণের বড় একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মান্দালয় নগরী দেখবার জন্ত সকালেই মিন্‌জাঙ জেলা হ'তে ট্রেনে রওনা হ'লুম। স্বাধীন ব্রহ্মের গৌরবময় শেষ-রাজধানী মান্দালয় নগরী তার উজ্জ্বল অতীত দিনের ধ্বংসপ্রায় স্মৃতির বোঝা বুকে নিয়ে পুণ্যতোয়া ইরাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীত সমাগমে চ্যুত-পত্র-পল্লব বনস্পতির বিশীর্ণ শ্রী যেমন বিগত বসন্ত দিনের পল্লব-পুষ্পাঢ্যতার সমৃদ্ধ গৌরব স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি দুর্ভাগ্য মান্দালয় নগরী তার বর্ত্তমান জীর্ণ জীবন-কঙ্কাল থেকে অতীতের সমৃদ্ধ জীবনের কথাই আভাসে জাগিয়ে তুলছে।

বোধ হয়, ইং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজা "মিনডন" অমরাপুরা হ'তে তাঁর রাজধানী এই মান্দালয় নগরীতে স্থানান্তরিত করেন। উচ্ছ্বাসময়ী ইরাবতীর তীরে বিস্তৃত জায়গা নিয়ে অকাতরে অর্থব্যয় ক'রে রাজধানীকে এমন সুন্দর ক'রে তিনি গড়ে তুলেছিলেন যে, এক সময়ে সমগ্র ব্রহ্মদেশে এই নগরী সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য গরিমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে খ্যাতি ছিল। ব্রহ্মের একটী আশ্চর্য্য স্থান ব'লেই মান্দালয় প্রতীয়মান হ'ত। শোনা যায়—রাজা ফরাসী দেশের ইঞ্জিনীয়ার আনিয়ে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন। রাজা মিনডনের মৃত্যুর পর থিবো রাজা হন। তাঁর সঙ্গে বৃটিশ-ব্যবসায়ীদের মনোমালিন্য হওয়ায় ইংরেজ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে ব্রহ্মের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। বৃটিশ সরকারের দৃঢ় হস্তে রাজা রাণী রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হ'য়ে ভারতে প্রেরিত হন। এই হ'ল ব্রহ্মের তৃতীয় যুদ্ধের ইতিহাস। বৃটিশ সরকার যে কৌশলে ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন; এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

গাড়ী সিটি বাজিয়ে ছুটে চলেছে। প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণাভ রশ্মির প্রথম স্পর্শে ব্রহ্মের পল্লী ও পাহাড়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য এবং বৌদ্ধ মন্দিরের উজ্জ্বল শোভা,

মনপ্রাণে সেই দেবতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে, সমতলের মাঝ দিয়ে—কোথাও-বা পল্লীর পাশ দিয়ে আমাদের দ্রুতগামী গাড়ী একটীর পর একটি ষ্টেশন পার হয়ে যাত্রী উঠিয়ে-নামিয়ে দিয়ে চলেছে। বেলা একটু বাড়বার সঙ্গেই বর্ম্মীযাত্রীদের আহার আরম্ভ হয়েছে। এই হ'ল এদের রীতি। ট্রেন-যাত্রী ভিক্ষুগণও তাদের নিয়মানুযারী বেলা বারটার পূর্ব্বেই আহার সমাপন ক'রে নিল। মেয়ে-পুরুষের মুখে অবিরত চুরুট জ্বলছে, মাঝে মাঝে তাদের সুন্দর পোষক হ'তে সুমিষ্ট এসেন্সের গন্ধও ভেসে আসছে। দূর হ'তেই সহরের অগণিত বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের সুন্দর শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম—গাড়ীখানা বেলা দু'টোয় এসে মান্দালয় নগরীতে হাজির হ'ল। বেশ বড়রকমের ষ্টেশন, উপর-ব্রহ্ম ও নিম্ন-ব্রহ্মের সব গাড়ীই এখানে যাওয়া-আসা কর্‌ছে। সব লাইনের সঙ্গেই এখানকার সংযোগ আছে। যাত্রীরা আপন আপন পরিচিত স্থানে চল্‌ল। আমি গাড়ী হ'তে নেমে সম্মুখে একটী লোককে এ সহরের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ঠিকানাটী দেখা'তেই, সে অতি আগ্রহে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আমার সামান্য জিনিষ পত্রগুলি তুলে দিল। এ লোকটীর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। এখানে ঘোড়ার গাড়ী বেশ সস্তা, গাড়ী আমায় অল্প সময়েই ষ্টেশন হ'তে নিয়ে এল এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাসায়। তিনি আমায় কখনও দেখেন নি—আমিও না; তবে উভয়েরই পরস্পরের নাম জানা আছে। অতি অল্প সময়েই আলাপ পরিচয় হ'ল। বিশ্রামান্তে স্নান আহার সমাপন ক'রে আবার গল্প চল্‌ল, এই সহর সম্বন্ধে। তিনি বল্‌লেন যে, সহরটী নেহাৎ ছোট নয়, রেঙ্গুনের পরেই এর স্থান; পূর্ব্বে স্বাধীন ব্রহ্মের এইটীই ছিল প্রধান সহর। কয়েক মাইল ব্যাপী এর সীমা, চারদিকেই নিস্তব্ধ বনানীর শ্যামল শোভা। আবার উন্নত গিরিরাজির গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ ক'রে নিশিদিন কলনাদিনী বেগবতী ইরাবতী ব'য়ে যাচ্ছে। পার্শ্বেই শস্য-সম্ভারে পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র এই সব নৈসর্গিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যের মাঝেই এই সহরটী অবস্থিত। এখানে দেখবার কি আছে জিজ্ঞেস করায় তিনি বল্‌লেন, 'আজ আর এ নগরীর পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-সম্পদ কিছুই নেই'। তবে রাজবাড়ী,

স্বাধীন ব্রহ্মের শেষ রাজা 'থিবো' ও তাহার মহিষীদ্বয়।
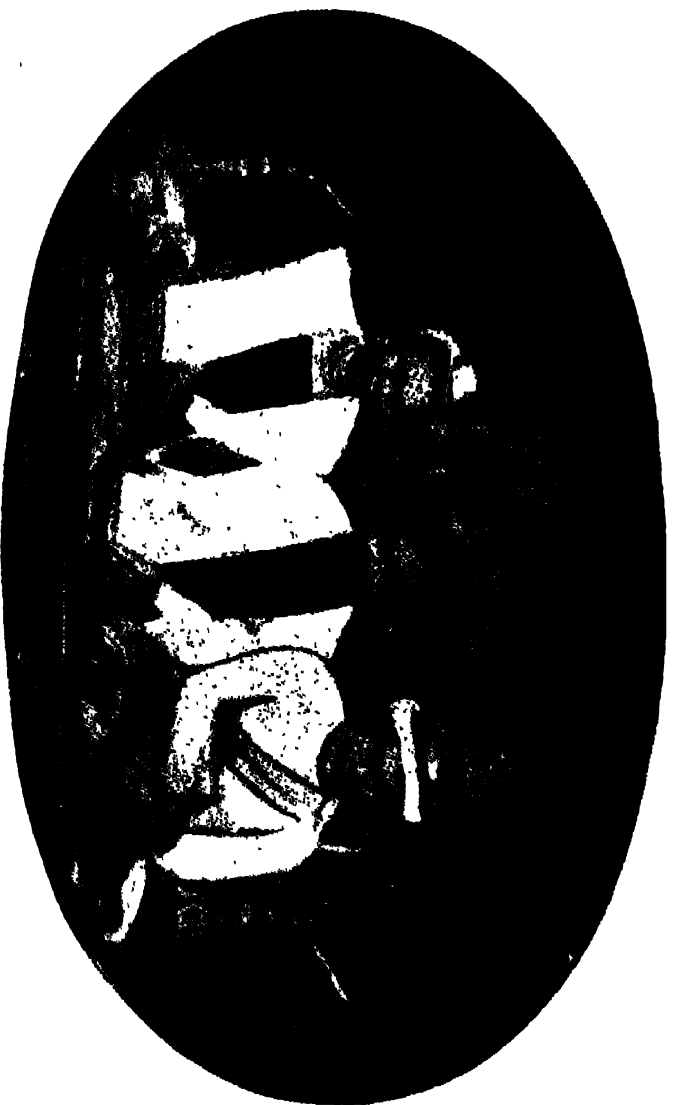
কেল্লা, মান্দালয় পাহাড়, বিখ্যাত বাজার, সাঞ্জু ফায়া এবং আরও অনেক বৌদ্ধমঠ ও মন্দির প্রভৃতি আজও বিগত দিনের স্মৃতিস্বরূপ দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকদের মনে তৃপ্তি দিচ্ছে।

বেলা পাঁচটা বেজে গেল; এখনও ভয়ানক গরম। উপর-বর্ম্মায় বৃষ্টির নামটিও নেই, নিম্ন-ব্রহ্মে কিন্তু এ সময় নিত্য বৃষ্টি ঝর্‌ছে। বৈকালের দিকে আমরা পায়ে হেঁটেই সহর দেখ্‌তে বের হ'লুম।

রাস্তা গুলি বেশ প্রশস্ত—সোজা চলে গেছে। আবার সহরের বুকের উপর দিয়ে ট্রামগাড়ীও যাওয়া-আসা কর্‌ছে। রাস্তার ধারে বাড়ীগুলিও বেশ ফাঁকা, ফাঁকা। এসব কাঠের কারুকার্য্যময় বাড়ীগুলি দেখতে বড়ই সুন্দর। পাকা বাড়ীও আছে। পূর্ব্বে এদেশে কাঠের বাড়ীরই প্রচলন ছিল, যথেষ্ট ভাল কাঠও পাওয়া যায়। রাস্তায় যেতে যেতে সহরের দু'চারজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। সবাই তাঁদের বাসায় যেতে অনুরোধ করলেন। এবার জেলখানাটা ও কোর্টের দিক্‌টা দেখে এলুম। এদিকে উকিলবাবুদের সব বাসা ও অফিস রয়েছে। ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই অনেক বাঙ্গালী উকিল, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার আছেন,—এদেশীয়েরা ত আছেনই। দূর হ'তেই রাজবাড়ীর উচ্চ প্রাচীর বেষ্টনী দেখতে পেলুম। পরে হাসপাতালের পাশ দিয়ে বাঙ্গালীদের ক্লাবে এলুম। বেশ উন্মুক্ত প্রশস্ত জায়গায় ক্লাব-ঘরটী; দুপুরে এখানে বাঙ্গালী ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটী প্রাথমিক স্কুল বসে। পার্শ্বে একটী লাইব্রেরীও আছে,—সাম্‌নের টেবিলে কয়খানা বাংলা, ইংরেজী দৈনিক মাসিক-পত্রিকাও রয়েছে। দু'চার জন ব'সে পড়্‌ছেন। সাম্‌নের খোলা জায়গায় এক পার্শ্বে ছোট ছেলেমেয়েরা খেল্‌ছে, অপর দিকে যুবকগণ 'ভলিবল' খেলা আরম্ভ করেছে—সবারই প্রাণে বেশ স্ফূর্ত্তি! দেখে, আমারও আনন্দ হ'ল। প্রত্যহই পঁচিশ-ত্রিশ জন বাঙ্গালী এখানে একত্রিত হন। বৃদ্ধেরাও গল্প করতে ও বেড়াতে আসেন। শুনলুম, সন্ধ্যার পর এখানে একটী অভিনয়ের মহড়া চল্‌ছে। এখানেই বাঙ্গালীদের উৎসব আমোদ যা কিছু সম্পন্ন হ'য়ে থাকে! বিদেশে এরূপ একটী ক্লাবের কত প্রয়োজন তা বিশেষ ক'রে বোধ

কর্‌লুম। সাহেব এবং বর্ম্মীদের ক্লাব ত আছেই। অনেক বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে আপ্যায়িত হ'লুম। এ সহরে বিভিন্ন দেশীয় লোক অনেক আছেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। নিবিড় ঘন আঁধারের কালিমা সহরের বুকে ছেয়ে গেল। তার সঙ্গেই আবার পথের ধারে বিজলী-বাতির উজ্জ্বল আলোকে সহর উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আমরা ফিরে এলুম; চলার পথে আমাদের অনেক কিছুরই আলোচনা চল্‌ছিল। এখানের মিউনিসিপ্যালিটী তেমন অর্থশালী নয়, তাই সহরের সব রাস্তাগুলি ভালভাবে তৈরী হয়নি। রাস্তাগুলির কতক সংখ্যা, কতক নাম দিয়ে পরিচিত। ঘরে এসে বসতেই শুনলুম পাশের বর্ম্মী উকিলের বাড়ীতে গ্রামোফোন চল্‌ছে আর মাঝে মাঝে শ্রোতাদের হাসির হর্‌রা।

পরদিন ভোরে একাই বেরিয়ে পড়লুম—রাজ-বাড়ী-দুর্গ ও মান্দালয় পাহাড় দেখ্‌তে। ট্রাম লাইন পার হ'য়ে সোজা এগিয়ে চলেছি। পথে দেখলুম, একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু ভিক্ষা সংগ্রহে যাচ্ছেন,—মুণ্ডিত মস্তক, কাষায় বস্ত্র পরিহিত, ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষুগণ নীরবে নতমুখে, একের পর এক শ্রেণীবদ্ধভাবে চলেছেন। কি অপূর্ব্ব সৌম্য শান্ত সুন্দর দৃশ্য! মুগ্ধনয়নে চেয়ে রইলুম, মনে এলো ভগবান তথাগতের কথা। সূর্য্যদেব উদয়াচল হ'তে তখন তাঁর প্রদীপ্ত কিরণ-সম্পদ ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন দিকে দিকে। বিভিন্ন রাস্তায় আরও ভিক্ষুদল আস্‌ছেন; প্রভাত-আলোর উজ্জ্বল রশ্মির দীপ্ত প্রভায় তাঁদের শান্ত সৌন্দর্য্য যেন আরও প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছে। দেখে, প্রাণে পরমশান্তি পেলুম। প্রত্যেক বর্ম্মীর বাড়ীর সামনে গৃহলক্ষ্মীরা অথবা তাঁদের প্রতিনিধি কেউ—অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ে ভিক্ষুদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন। ভিক্ষুরা এলেই চাম্‌চে ক'রে অন্ন-ব্যঞ্জন ভিক্ষাপাত্রে তুলে দিচ্ছেন। শ্রেণীবদ্ধভাবে একের পর এক ভিক্ষু ভিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন, এক মিনিটও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। গৃহিণীরা এভাবে পুণ্যসঞ্চয় করছেন। বর্ম্মী-পল্লীর ছোট বড় সবার বাড়ী হ'তেই নিত্য বিভিন্ন দলে ভিক্ষুদের ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এই মান্দালয়ে অনেক ভিক্ষু আছেন;

পণ্ডিত বিদ্বান ত্যাগী ভিক্ষুও যথেষ্ট। শাস্ত্রচর্চ্চা এখানে খুব হয়; এ স্থানকে ব্রহ্মবাসিগণ হিন্দুদের বারাণসী তীর্থের মতই শ্রদ্ধা করেন। ধর্ম্মের প্রতিনিধি এই সব ভিক্ষুদের গৃহস্থগণ দেব সম্মানে সেবা ক'রে থাকেন, তাঁদের যা কিছু দরকার গৃহীরা স্বেচ্ছায় দান করে ধন্য হন। তাঁরা ভিক্ষুজীবনকেই শ্রেষ্ঠ জীবন ব'লে মনে করেন।

একটু এগিয়ে গিয়ে এবার সাম্‌নেই রাজবাড়ীর উচ্চ প্রাচীর দেখ্‌তে পেলুম। তার ভিতরে দুর্গও রয়েছে,—সওয়া মাইল সমচতুষ্কোণ ভূমি সুদৃঢ় ইটের দেয়ালে বেষ্টিত। তার মাঝে আবার ছোট প্রাচীর ঘিরে ব্রহ্মরাজবাড়ী অবস্থিত। ভিতরের দেয়ালে চার পাশেই চারটি প্রবেশপথ রয়েছে। বাইরের উচ্চ প্রাচীরের চারদিকে বারটী দরজা আছে; তবে চারদিকের চারটীই প্রধান—অপরগুলো বিভিন্ন লোকের অবস্থান ও নানা কাজের জন্য ব্যবহার হ'ত। প্রত্যেক দুয়ারটী সমান ব্যবধানে রয়েছে। বাইরের এই প্রাচীরকে বেষ্টন ক'রে আবার গভীর ও বৃহৎ জলপূর্ণ পরিখা চারদিকেই ঘিরে আছে। এই পরিখা পার হ'বার জন্য প্রত্যেক দুয়ারে একটী ক'রে পুল রয়েছে। ফটকের উপর হ'তেও পাহারা দেবার জন্য চারদিকেই দেয়ালের উপরে প্রহরী সৈনিকের আবাস তৈরী রয়েছে। বর্ত্তমানে বৃটিশ-প্রহরী প্রধান দুয়ারগুলির সাম্‌নে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। অপর দুয়ারগুলি প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেছে। সকাল ৬টা হ'তে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সমাগত দর্শকদের রাজবাড়ী দেখবার সময়।

আমি দক্ষিণদিকের প্রধান দুয়ার পার হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ করলুম—হিন্দুস্থানী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। দুয়ারের সম্মুখভাগ শত্রুহস্ত হ'তে রক্ষার জন্য মাঝখানে এক বিরাট দেয়াল আবরণস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই উভয় পাশ দিয়ে সরু পথে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। ভিতরে এগিয়ে যেতেই দেখ্‌লুম—এই বিরাট্ সুদৃঢ় পরিখা-বেষ্টিত ব্রহ্মরাজবাড়ীর সীমানার ভিতর বর্ত্তমানে বৃটিশ সরকারের কতকগুলি অফিস বসেছে এবং পশ্চিম দিকটায় বৃটিশ সৈনিকদের দুর্গ ও শিবির। এখানে অনেক সৈন্যও আছে। সাম্‌নে কয়েকটী কামান পাতা

রয়েছে ; সশস্ত্র প্রহরী দিনরাত পাহারায় ব্যস্ত। মাঝ দিয়ে কয়টী সুন্দর সোজা পথ চলে গেছে। গাড়ী, মোটর সর্ব্বদা আসছে-যাচ্ছে। উভয় দিকের শ্যামল সুন্দর মাঠে নিত্যই সৈন্যদের কুচকাওয়াজ এবং খেলার ব্যবস্থা হয়। আরও এগিয়ে এসে রাজ-অন্তঃপুরের দক্ষিণ দুয়ারে উপস্থিত হ'লুম। মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই সেই স্বাধীন ব্রহ্মের শেষ রাজা "থিবোর" বাসস্থান! মনটা বড়ই বিষণ্ণ হ'য়ে গেল। নিগূঢ় রহস্যাবৃত ব্রহ্মরাজকাহিনীর অতীত ইতিহাস চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। কত গুপ্তহত্যা ও কূট চক্রান্তের বীভৎস কাহিনী এই রাজ-পরিবারের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আজ এর প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করা বড়ই মুস্কিল। এদেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নভাবে ঘটনা চিত্রিত করেছেন। কোন্‌টী সত্য—কে নির্ণয় কর্‌বে? ধীরে ধীরে পুরনো ইতিহাসও আজ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে।

ভিতরে প্রবেশ কর্‌লুম। একজন বর্ম্মী গাইড আমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখা'তে লাগ্‌ল—রাজ-অন্তঃপুর, দরবার, পদ্ম-সিংহাসন, ময়ূর-সিংহাসন, যুবরাজের দরবার, মন্ত্রীদের বসিবার স্থান, প্রমোদ-ভবন, প্রভৃতি। সে বল্‌লো রাজবাড়ীর বিভিন্ন দরবারে আটটী বহুমূল্য সিংহাসন ছিল, এবং ঐ সব দরবারের বিভিন্ন প্রবেশপথে মেয়ে-পুরুষ রাজ-অতিথি বা রাজ-পরিবারের লোকেরা প্রবেশ করতেন। এবার রাজা যেখানে বন্দী হয়েছিলেন, সেই স্থানটি দেখে, মনে বড়ই বেদনা জাগ্‌ল। এই সেই স্মরণীয় স্থান ; স্বাধীন ব্রহ্মের গৌরব-রবি জানি না কত কালের জন্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অস্তমিত হয়েছে, ব্রহ্মের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হ'য়ে গেছেন। একেই বলে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। বৃটিশ বণিক সর্ব্বত্র—কি ব্রহ্ম, কি ভারত—একই উপায়ে রাজ্য হস্তগত করেছে। বিশাল রাজপুরীর যে কয়খানা প্রাসাদ আজও অতীতের স্মৃতি ও পরাধীনতার বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা আজ সৌন্দর্য্যহীন, নিরাভরণ ; যেন প্রাণহীন কায়া কোথাও স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে কোথাও স্বচ্ছ কাচের দ্বারা আচ্ছাদিত হ'য়ে মাটির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আজও কিন্তু
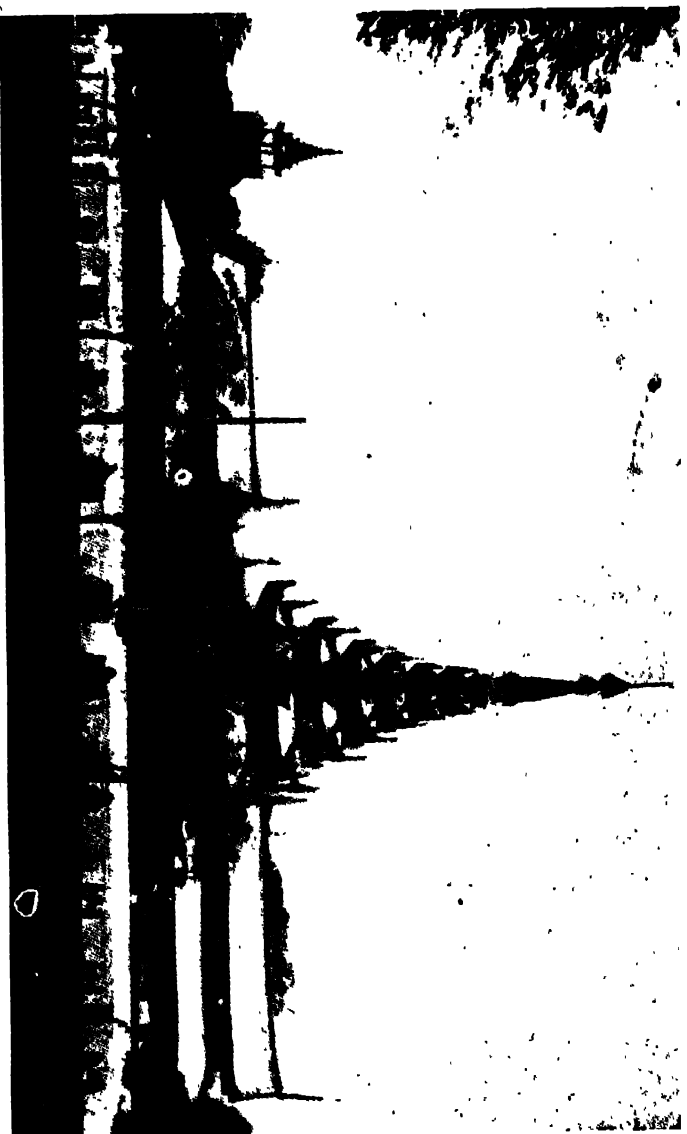
মান্দালয় রাজবাড়ীর প্রধান প্রবেশদ্বার, উভয় পার্শ্বেই কামান সাজানো রহিয়াছে।

বর্ম্মী দারুশিল্পীদের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে ঐ জীর্ণ শীর্ণ প্রাসাদগুলি। কতকগুলি গৃহ একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়েছে। রাজবাড়ীর সব প্রাসাদই ছিল কাঠের তৈরী। তার ভিতর, বাহির দারু-শিল্পের শোভাময় সৌন্দর্য্যের সাথে, সোনা রূপার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শোভিত ছিল। ভিতরে চারদিকে কয়টী উঁচু 'টাওয়ার'ও ছিল। আজ মাত্র একটী উচ্চ টাওয়ার দেখ্‌লুম। এর উপর হ'তে রক্ষী-সৈন্য দূরাগত শত্রুপক্ষের গতিবিধি নির্দ্দেশ করত।

এবার ঘুরে এসে রাজপরিবারের পোষাক পরিচ্ছদ রক্ষিত 'যাদুঘরে' প্রবেশ ক'রে হাসি সম্বরণ করতে পারলুম না। অতি দুঃখের উপরও মানুষের হাসি পায়,—আমারও হ'ল তাই। কতকগুলি আলমারী-বোঝাই রাজারাণীর, সৈন্য, মন্ত্রী, যুবরাজ, সবারই ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ সাজান রয়েছে। আবার ছাতা-জুতো, তরোয়াল, তাম্বুলদানী এসবও রয়েছে দেখে খুবই অবাক্ হ'লুম ;—অতবড় একজন প্রতাপশালী, ঐশ্বর্য্যবান সৌখীন রাজার পোষাক-পরিচ্ছদগুলি কি না যাত্রাওয়ালাদের চুমকী লাগান পোষাকের মত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যে দেশে সোনা-মণি, হীরার অভাব নেই, রাজাই যার একমাত্র মালিক ছিলেন, যে দেশের সাধারণ লোক পর্য্যন্ত বহুমূল্য জিনিষ ব্যবহার কর্‌ত, সে দেশের রাজা কি না ঐ রকম অতি খেলো জিনিষ ব্যবহার করতেন !

বেলা প্রায় ৯টা হ'য়ে গেল। এসব দেখে শুনে বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজ-বাড়ীর উত্তর দিকটার ভিতরের দুয়ার পার হ'য়ে বাইরের প্রধান দুয়ারের দিকে এগিয়ে চল্লুম। রাজবাড়ীর সীমানার ভিতরেই রাজপরিবারের কয়টী সমাধি রয়েছে। পশ্চিমধারে একটী রেল লাইন চলে গেছে ; আমার মনে হ'ল—বৃটিশ সরকারের সৈন্যদের দরকারেই এইটী তৈরী রয়েছে। সশস্ত্র প্রহরীর সাম্‌নে দিয়ে রাজবাড়ীর পরিখা পার হ'য়ে এলুম। বাইরে এসে উত্তরদিক হ'তে পূর্ব্বদিকের পথে এগিয়ে গিয়ে প্রায় আধ মাইল হেঁটে, মান্দালয় পাহাড়ের গোড়ায় সিংহদ্বারে উপস্থিত হ'লুম। দূর হ'তেই দিবালোকের উজ্জ্বল আলোকে

উপরের সোনালী ও শ্বেতবর্ণের মন্দিরশ্রেণীর শান্ত উজ্জ্বল শোভায় প্রাণকে মোহিত ক'রে দিচ্ছিল, যেন কোন এক অজ্ঞাত বিচিত্র ভুবনের আকর্ষণে এগিয়ে এসেছি। পূর্ব্ব চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে মন হ'তে চলে যাচ্ছে—কি অপূর্ব্ব সুন্দর শোভা! সমগ্র পাহাড়টী জুড়ে, নিচু হ'তেই সার দিয়ে মন্দিরশ্রেণী তৈরী হয়েছে। এই মন্দিরময় পাহাড়টীর রূপ বড়ই চিত্তাকর্ষক, যদিও উচ্চতা খুববেশী নয়। পাহাড়ের উঠ্‌বার সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে দুইটী সিংহ বা ড্রাগন প্রহরীরূপে রয়েছে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠ্‌ছি। সিঁড়িগুলি বেশ মজবুত,—পাহাড় কেটে পাথর বা ইট দিয়ে তৈরী। সিঁড়ির উপরে ধাপে ধাপে মন্দিরের মত চূড়াবিশিষ্ট ছাউনি উঠেছে, দূর হ'তে বড়ই সুন্দর দেখায়, যেন সারিবদ্ধ মন্দিরশ্রেণী। মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রশস্ত স্থান ও পানীয় জল আছে। তা'রি পাশে আবার ব্রহ্ম-মহিলাদের দু'একটা দোকান রয়েছে; দেবতার জন্য মঙ্গলঘট, ধূপ, বাতি, ফুল এবং দর্শকের আহার্য্য সবই পাওয়া যায়। নিত্যই যথেষ্ট লোকসমাগম হয়। সিঁড়ি বেয়ে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লুম। আরও খানিকটা উঠে সামনেই একটি মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের দণ্ডায়মান অভয় মুদ্রা শোভিত বিরাট্ এক মূর্ত্তি দেখতে পেয়ে তাঁর চরণে প্রণত হ'লুম। এ মূর্ত্তি রাজা 'মিনগুনমিনের' স্থাপিত। অনেক ভক্তও এসেছেন; দেবতার সামনে ধূপ দীপ জেলে দিয়ে পুষ্পগুচ্ছ সাজিয়ে সবাই যুক্তকরে প্রার্থনা কর্‌ছেন। এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আবার ঘুরে ফিরে সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগলুম। পথে আরও কয়টি মন্দির ও দেবতা দেখে প্রণাম প্রার্থনা ক'রে, একেবারে পাহাড়ের উচ্চ শিখরে মন্দির ও বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হ'লুম। মন প্রাণ আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে গেল, দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম ক'রে এখানকার প্রাচীন ও প্রধান ভিক্ষু 'উকান্তি'র সঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে একটু আলাপ পরিচয় হ'ল—তিনিই এ পাহাড়ে দেবতা প্রতিষ্ঠা ও মন্দির তৈরীর জন্য এখনও আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌ছেন। তাঁর এ অমর কীর্ত্তি ব্রহ্ম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাক্‌বে। এই পাহাড়টি জুড়ে, আজ কত যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হচ্ছে—তার ইয়ত্তা নেই।

সমগ্র ব্রহ্মদেশ হ'তে এই ভিক্ষুর নিকট অর্থ ও প্রাণের প্রার্থনা আস্‌ছে—মন্দির, দেবতা ও পান্থশালা তৈরীর জন্য কোনটির স্থান নির্দ্দেশ হচ্ছে, পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে—বারমাস কাজ চল্‌ছে। নীচু হ'তে বিজলী বাতি এবং জলের পাইপ পাহাড় বেয়ে উঠেছে। এ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখে, খুবই বিস্মিত হ'লুম। এই পাহাড়েই একটী পুরোনো মন্দিরে বুদ্ধদেবের দণ্ড-পেটিকা দেখেছিলুম। এখান হ'তে নিম্নে চারদিকে চেয়ে আরও মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'লুম। এই নগরী কি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেই না শোভিত—উপর হ'তে যেন একটী ছবির মতই দেখাচ্ছে! দূরে মেমিও পাহাড়ের গম্ভীর ঘন শ্যামরূপ, মাঝখানে এঁকে বেঁকে ইরাবতী ব'য়ে যাচ্ছে, অপর পারে সেগাইন পাহাড়ে মন্দিরের সুন্দর শোভা। এই স্বভাব-সৌন্দর্য্যের মাঝে দাঁড়িয়ে মান্দালয় নগরী।

এবার অপর একটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আস্‌ছি। পথে আরও দু'একটা মন্দির দেখ্‌লুম এখানে যে কোন জিনিষটি যিনি দিয়েছেন তাঁরই নাম লেখা রয়েছে। একটু বাদে, নামবার পথটি এসে একই পথে মিশেছে। অল্প সময়েই সমতলে এসে পড়েছি। ধারেই কয়টি দোকান, পান্থশালা এবং গাড়ী মোটর-যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি এগিয়ে চলেছি। অদূরে দেখ্‌লুম এক স্থানে এক হাজার চূড়া সমন্বিত এক অপূর্ব্ব সুন্দর বিরাট্ মন্দির শোভা পাচ্ছে। বেলা অনেকটা হয়েছে, রৌদ্রের তাপ বেশ লাগ্‌ছে। একখানা গাড়ীতে উঠে, ফিরে চল্লুম। আবার সেই পরিখা প্রাচীর, আবার সেই রাজ-বাড়ীর স্মৃতি। প্রায় বারটায় এসে বাসায় হাজির হ'লুম। এ সহরেও জলের বড়ই দুর্ভিক্ষ চল্‌ছে, মিউনিসিপ্যালিটি তেমন প্রচুর জলের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তাই সবাইকেই তোলা জলে সব কিছু করতে হয়। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলো লোক ঠেলা গাড়ী অথবা বাঁকে ব'য়ে সহরশুদ্ধ সবাইকে জল সরবরাহ করে। খানিক বিশ্রামান্তে ঐ তোলা জলেই স্নান ক'রে, এ দারুণ গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ হ'তে হ'ল।

বৈকালে দু'টায় ট্রামে চল্‌লুম 'সাঞ্জু ফায়া' অথবা আরাকান প্যাগোডা দেখতে। ট্রামের কর্ম্মচারী সবাই বর্ম্মী, যাত্রীও অধিকাংশ তারাই। সহরের বুকের

উপর দিয়ে ট্রাম বেশ দ্রুতই চলেছে। ইতিমধ্যে একজন চেকার এসে সব যাত্রীদের টিকিট মার্ক দিয়ে গেল। ট্রাম বাজারের ক্লক টাওয়ারের কাছ হ'তে মোড় ঘুরে সোজা দক্ষিণ দিকে চল্‌ল। আধঘণ্টা চলার পর মিউনিসিপ্যালিটীর শেষ সীমা ছাড়িয়ে ট্রাম লাইনের শেষ প্রান্তে সাঞ্জু প্যাগোডার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। এই স্থানের নামই 'সাঞ্জু' একটু পূর্ব্বে ট্রাম হ'তেই অতি সুন্দর কারুকার্য্যময় বিরাট্ প্যাগোডাটী দেখতে পেয়েছি। ট্রাম হ'তে নামতেই একটী "পৌনা" গাইড এসে আমায় পাকড়াও কর্‌ল। এই পৌনারা জাতিতে বর্ম্মী নয়, ব্রহ্মরাজ এদের জ্যোতিষীভাবেই এনেছিলেন—মণিপুর হ'তে। এরা মণিপুরী ব্রাহ্মণ এবং রাজসরকার হ'তে যথেষ্ট বৃত্তি দেওয়া হ'ত। বর্ত্তমানে এরা এদেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবধি নেই। এখনো এরা জ্যোতিষচর্চ্চা এবং নানা উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। এ সহরে এদের একটী পল্লী আছে। বর্ম্মীদের মত চালচলন হ'লেও এদের বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণ এবং এদের দু'চারজন অবস্থাশালীর বাড়ীতে প্রতিবৎসর দুর্গা-পূজাও হয়। এরা বাংলা ভাষাও জানে। আমি তাকে বিদায় দিয়ে নিজেই মন্দির দুয়ারে প্রবেশ ক'রে এগিয়ে চল্‌লুম। সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মরমণীদের সুসজ্জিত অনেক দোকান,—নিজেরাও সেজেগুজে ব'সে আছে—যাত্রী দেখলেই ডাকছে দু'একটী মেয়ে ইংরেজীতেও কথা বলছে। কোন দোকানে ধূপ, বাতি ফুল কোথাও মনোহারী বা লেকারের জিনিষ, তা ছাড়া গৃহস্থদের নিত্যব্যবহার্য্য অনেক কিছু এখানে পাওয়া যায়। হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম শিল্প, বুদ্ধমূর্ত্তি এবং আরও সব সুন্দর দেবতা মূর্ত্তি ও খেলনা পাওয়া যায় এবং পাথরের তৈরী অনেক কিছু এখানে বিক্রী হয়। আমি সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে যাচ্ছি—উপরে দেয়ালের গায় ভগবান তথাগতের জীবনী অবলম্বনে বর্ম্মী চিত্রশিল্পীদের অনেক সুন্দর চিত্র রয়েছে। এবার গিয়ে দেবতার সম্মুখে প্রণত হ'লুম। স্বস্তিকাসনে বিরাট্ সুবর্ণময় ভগবান বুদ্ধদেব। দেখে, প্রাণ-মন ভক্তিতে ভরে গেল। দলে দলে ভক্তগণ দেবতার সাম্‌নে

ধূপ দীপ জ্বেলে পুষ্পস্তবক সাজিয়ে দিয়ে "সিকো" বা বারত্রয় প্রণাম ক'রে, যুক্তকরে প্রার্থনায় মগ্ন হচ্ছেন। পার্শ্বে ভিক্ষুগণ 'ত্রিপিটক' আবৃত্তি করছেন, অজস্র ফুলের সৌরভ এবং ধূপের সুগন্ধ মন্দিরতল আমোদিত ক'রে এক স্বর্গীয় সুষমার সৃষ্টি করেছে। আমি মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে ভাবাচ্ছন্ন মনে অপর একটী পথে বাইরের দিকে এলুম। মন্দিরের বাইরে কয়টী বড় ঘণ্টা ঝোলান রয়েছে—কয়টী পিত্তল মূর্ত্তিও দেখলুম। মন্দিরের চারদিকেই প্রবেশ পথ আছে। এ পথেও ঐরূপ অনেক দোকান সাজান। বিক্রীও হচ্ছে বেশ। বাইরের দুয়ারে এসে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল, এখানে বিশ্রাম আসন ও পানীয় জল রয়েছে। উপরে দেয়ালের গায়ে—ব্রহ্মরাজ আরাকান বিজয় ক'রে কি ভাবে এই দেবতাকে সেদেশ হ'তে এনেছিলেন—তারই পরিচয় জ্ঞাপক কতকগুলি চিত্র, শিল্পী সুদক্ষ তুলিতে এঁকে রেখেছেন। এই দেবতা সম্বন্ধে প্রবাদ—ব্রহ্মরাজ আরাকান বিজয় করার পর স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে, আরাকানের রাজধানী হ'তে এই মূর্ত্তি নিয়ে এসে প্রথমে 'অমরাপুরী' এবং পরে এই সাঞ্জতে স্থাপিত করেন। তাই এই মন্দিরের নাম 'আরাকান প্যাগোডা'। এই মন্দিরাভ্যন্তরে ঐ একটী মূর্ত্তি ব্যতীত অপর কোন দেবতা নেই। এ দেশে এই দেবতা খুবই জাগ্রত তাই নিত্য শত শত ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্য এবং পুষ্পাঞ্জলি দেবতার চরণে অর্পিত হয়। মন্দিরটী যেমন প্রাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে, তেমনি ব্রহ্মরাজের বীরত্ব মহিমার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই প্যাগোডার আশে-পাশে অনেক বৌদ্ধবিহার রয়েছে—এতে কয়েক হাজার ভিক্ষু বাস করেন। প্রায় বিহারেই বিদ্বান এবং উপলব্ধিসম্পন্ন প্রাচীন ভিক্ষু আছেন বিভিন্ন স্থান হ'তে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করতে অনেক ভিক্ষু এসে এখানে বাস করেন। সাঞ্জুর নিকটে ব্রহ্ম ভাস্করগণ শ্বেতপাথরে নানা ভাবের ও আকারের বুদ্ধদেবের সুন্দর মূর্ত্তি তৈরী ক'রে বিক্রী করে। রাস্তার ধারেই দেখলুম—নিরেট পাথর খোদাই ক'রে শিল্পিগণ দেবতার রূপ দিচ্ছে।

পরদিন প্রভাতে ট্রামে উঠে সোজা 'ম্যাণ্ডেলে সোর' দেখতে গেলুম। ইরাবতীর এই ধারটী বড়ই মনোমুগ্ধকর। নদীতে 'ইরাবতী ফ্লোটিলা কোং'র' অনেক ষ্টীমার নিত্যই দ্রব্যসম্ভার ও যাত্রী নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে আসছে। ইরাবতীর অপর পারে মন্দিরময় উঁচু নীচু পাহাড়ের দৃশ্য মুগ্ধ ক'রে দেয়। একটু বাদে ওখান হ'তে ফিরবার পথে এ সহরের আরও কয়টী বিখ্যাত পুরাতন বৌদ্ধ-মঠ ও মন্দির চোখে পড়ল। এ সবই রাজ-পরিবারের বিভিন্ন রাজা বা রাণীদের দ্বারা তৈরী। এ সব মন্দিরে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উৎকীর্ণ হয়েছিল—তা আজও বর্ম্মী শিল্পীদের বিগত দিনের শিল্পচাতুর্য্যের শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে বর্ত্তমান রয়েছে। এই সহরে অগণিত বৌদ্ধ-মন্দির এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আরও খানিকটা ঘুরে এসে—এখানকার বিখ্যাত বাজার দেখতে এলুম। শুনেছি, এরূপ সুন্দর বাজার নাকি, পূর্ব্ব এশিয়ায় নিতান্ত বিরল—সত্যি তাই! এর অপর্য্যাপ্ত বিভিন্ন জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন বাজারগুলি পাশাপাশিভাবে একই স্থানে বিরাট্ জায়গা নিয়ে সুরক্ষিতভাবে সুন্দর সুসজ্জিত রয়েছে এবং প্রত্যেক জিনিষটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিক্রী হচ্ছে। মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত বর্ম্মী রমণীগণ কেনা-বেচা করছে। ব্যবসা করা এদেশের মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ। বিদেশী দোকানীও অনেক আছেন। মানুষের দরকারী সৌখীন বা সাধারণ সব জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। বিদেশী বাজারে যে বিলাসী সৌখীন জিনিষ নিত্য নূতন বেরুচ্ছে তা এখানে প্রচুর আমদানী ও বিক্রী হচ্ছে। এদেশ বিলাসিতার জন্য খ্যাত। বেলা প্রায় এগারটায় ঘরে ফিরে এলুম—এ নগরীর প্রায় সব দিকটাই দেখা হয়েছে, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মরাজাদের স্মৃতি বিজড়িত কীর্ত্তিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে থেকে আজও স্বাধীন ব্রহ্মের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজ কোথায় যাব ভাবছি, এমনি সময় পূর্ব্বপরিচিত একটী বর্ম্মী ছেলে এসে আমায় নিয়ে গেল তাদের একটী ফুঙিচঙ অথবা বৌদ্ধবিহার দেখাতে। সহরের একধারে প্রশস্ত জায়গায় কাঠের সুন্দর একটী বিরাট্ বাড়ীতেই এই বৌদ্ধবিহার। এখানে প্রায় ৩০ জন ভিক্ষু বাস করেন আর কয়টী বালকও

আশ্রমবাসী হ'য়ে রয়েছে। গৃহীরাই আশ্রমের যা কিছু ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। আমরা ভিতরে প্রবেশ কর্‌তেই একজন ভিক্ষু আমাদের আশ্রম অধ্যক্ষ "সায়াডোর" কাছে নিয়ে গেলেন, সৌম্য শান্ত প্রাচীন ভিক্ষু একটি উঁচু আসনে বসে আরাম করছিলেন, আমাদের দেখেই উঠে বসলেন এবং সাম্‌নের আসনে আমাদের বসতে অনুরোধ করলেন, আমার সঙ্গী ছাত্রটি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তিনবার প্রণাম ক'রে, একটু দূরে বসল এবং আমার পরিচয় তাঁকে দিল। প্রাচীন ভিক্ষু আমার সাথে বেস ধীর শান্ত ভাবে আলাপ আরম্ভ করলেন, তাঁদের আশ্রমজীবন ধর্ম, নীতি-শীল সম্বন্ধেও অনেক কথা হ'ল, দেখ্‌লুম তিনি খুবই পণ্ডিত এবং প্রাণে তাঁর একটা প্রশান্তির ভাব এসেছে। বেশ ভাল লাগ্‌ল, শেষে ব্রহ্মের রাজনীতি সম্বন্ধেও কিছু আলাপ হ'ল, দেখ্‌লুম তিনি অনেক খবরই জানেন।

ফিরে আসবার পূর্ব্বে একজন ভিক্ষুকে আদেশ করলেন আমাদের আশ্রমটি সব দেখিয়ে দিতে, সে ভিক্ষুটি নতমুখে—আমাদের সঙ্গে ক'রে ঘুরে সব দেখিয়ে দিলেন—তাদের ঠাকুর ঘর অথবা প্রার্থনা গৃহে তিনটি সুন্দর সুসজ্জিত বুদ্ধ বিগ্রহ রয়েছে। তার সাম্‌নের হলে দেখ্‌লুম কতক ভিক্ষু একজন প্রবীন পণ্ডিত ভিক্ষুর নিকট অধ্যয়ন করছেন। বড় বড় বিহারে সর্ব্বত্র এ ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দ্ধারিত একটি ধারায় এদের ধর্মগ্রন্থ পড়ান হয়: নিচুতে পাড়ার ছেলেদের জন্য একটি পাঠশালা আছে। ওখানেও ভিক্ষুগণই শিক্ষা দেন, ঘুরে দেখে মনে হ'তে লাগ্‌ল সত্যি ভিক্ষুদের ত্যাগ বৈরাগ্যপূর্ণ কঠোর জীবন কি শান্ত কি শান্তিপূর্ণ। বিহারে এতগুলো লোক থাকা সত্ত্বেও একেবারে নীরব শান্তিময়। এখানে আশ্রম অধ্যক্ষের আদেশই সকল ভিক্ষুকে শ্রদ্ধানত অন্তরে পালন করতে হয়। এঁদের আশ্রমজীবন বেশ সুন্দর ভাবে কতকগুলো নিয়ম নির্দেশের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠ্‌ছে।

আমরা এখান থেকে বেড়িয়ে এবার কলেজের দিকে চল্‌লুম। রেঙ্গুনের পর এদেশে এখানেই একটিমাত্র ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে। ছেলেটির সাথে গল্প কর্‌তে কর্‌তে কলেজে গিয়ে হাজির হ'লুম। কলেজটি তেমন বড় নয়।

পরে বর্ম্মী ছাত্রদের হোষ্টেলে গিয়ে খুব গল্প আমোদে খানিকক্ষণ কাটান গেল। আমার চেনা ছেলেটিও এখানে থাকে, তাই আমি অল্প সময়ের মধ্যেই এদের পরিচিত হ'য়ে পড়লুম, এরা খুব হাসি খুসী ও সাহসী সর্ব্বদাই স্ফুর্ত্তি আমোদে কাটাতে চায়। ফেরবার মুখে এদের অতি প্রিয় 'ব্যাঞ্জোর' বাজনার সাথে একটি ছেলের সুমিষ্ট গানের সুর সত্যি প্রাণে একটা মনোজ্ঞ তৃপ্তি জাগিয়ে দিল। ছেলেদের ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে চল্লুম। কাছেই দেখ্‌লুম খেলার মাঠে ছাত্রদল মহা উৎসাহে ফুটবল খেলছে। এদের স্বভাবতঃই বেশ শক্ত সবল চেহারা—কেউবা আবার নিয়মিত ব্যায়াম ক'রে শরীরকে আরো সুন্দর তৈরী কর্‌ছে, প্রাণে সাহসও অদম্য। আমার পরিচিত ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পথ এল এবং আমাকে আরো কয়টি বিখ্যাত স্থান দেখ্‌বার জন্য বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে বল্লে—ব্রহ্মের পুরাতন রাজধানী অমরাপুরা, আভা এবং মিঙ্গুলের বিখ্যাত ঘণ্টা ইত্যাদি জায়গাগুলি নিকটেই—যেতেও বিশেষ অসুবিধা নেই। আমি তার কাছ থেকে বিদায় হ'য়ে বাজারের নিকটে এসেই অমরাপুরা যাওয়ার বাসে উঠে পড়লুম। অবশ্য পূর্ব্বেই পথের সন্ধান নিয়েছিলুম। বাস সাঞ্জু পর্য্যন্ত এক রাস্তায় এসে, পরে বনবীথিকার মাঝ দিয়ে উঁচু-নীচু সর্পিল কাঁচা পথে চলল, বাস বেশ ঝাঁকুনী দিচ্ছিল। তবে সুবিধা ছিল এই—যাত্রী মাত্র তিন চারজন। এক ঘণ্টার মধ্যে ব্রহ্মের পুরাতন রাজধানী অমরাপুরায় এসে নাম্‌লুম। চারদিক ঘুরে দেখ্‌লুম বর্ত্তমানে রাজবাড়ীর ধ্বংসপ্রায় ইটের দেয়াল, বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র সাক্ষীরূপে অবশিষ্ট রয়েছে। নদী এখানে শুকিয়ে গিয়ে হ্রদের মত হয়েছে—তাতে নৌকায় বেড়ান যায়। পার্শ্বেই ইরাবতী ব'য়ে যাচ্ছে. তার সাথে সংযোগ আছে, এখানে আর কিছুই নেই—শূন্য শ্মশান পড়ে আছে। ক্ষুদ্র পল্লীটির পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে, একটি ষ্টেশনও আছে। বর্ত্তমানে এ স্থান রেশমী লুঙ্গী তৈরীর জন্য বিখ্যাত। তাঁতের শব্দ শুন্‌তে পেলুম। রেশমী লুঙ্গী তৈরীর একটি সরকারী স্কুলও এখানে আছে। রেল ষ্টেশনের ধারে ছোট একটি বাজার। বাস চালকের সঙ্গে এসব দেখে শুনে গল্প করতে

কর্‌তে ঐ বাসে ক'রেই ফিরে এলুম। 'আভা' নগরীর অবস্থাও একই প্রকার, ইরাবতীর তীরেই সেই বিখ্যাত রাজধানী ছিল, আজ সেখানেও দুর্গ, রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত কিছুই নেই। মঠ মন্দিরের অনেক স্মৃতিও সেখানে মাটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে।

ফেরবার পথে আমার রাত হ'য়ে গেল, বাজারে রাস্তার ধারে দোকানগুলি আলোর মালায় সুন্দর সজ্জিত—দু'চারজন গ্রাহকও আসছে-যাচ্ছে। চায়ের দোকানে বর্ম্মীদের ভিড় জমেছে ; আরও সামনে আসতে দেখ্‌লুম—সিনেমা গৃহের সম্মুখে যথেষ্ট লোক সমাগম হচ্ছে। চীনা খাবারওয়ালা কাঁধে বাঁক নিয়ে পথে বেরিয়েছে দু'দিকে আহার্য্য আছে এবং চলতি পথেই উনুন জ্বলছে—রান্নাও হচ্ছে। সে গ্রাহককে ডাকছে না—দু'খানা বাঁশের চটায় খট্ খট্ শব্দ কর্‌ছে, বহুদূর সে শব্দ গিয়ে ক্রেতাদের তার খাবার দোকানের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। আরও এগিয়ে দেখ্‌লুম—একটি তাড়ির দোকানে ভারতীয় রিক্‌সাওয়ালা এবং কুলীদের ভিড়—এই হ'ল এদের আরামের সময়। তরল আনন্দে রাস্তায় লুটাচ্ছে। এই ভাবে বহুবিধ দৃশ্য চোখের সাম্‌নে দেখে মনে বিচিত্র ভাবনা জেগেছে।

এখানে একদিন বৈকালে স্থানীয় একজন বর্মী উকিলের বাসায় গিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে প্রাণখোলা আলাপ আলোচনা ক'রে এলুম, লোকটি বড়ই ভালমানুষ এবং খুবই স্বাধীনতা প্রয়াসী। কথায় কথায় রাজনীতি সম্বন্ধে আলাপ হ'তেই তিনি বল্লেন—মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌ছেন বটে—আমরা তাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি কিন্তু তার "নন্‌ভায়লেণ্ট নন্‌কোয়াপারেশন"—মতটি কিছুই বুঝতে পারি না। তার বক্তৃতাও শুনেছি—আমাদের দেশের অনেকেই—এবিষয় আমার মত কিছুই বুঝতে পারে না।

উকীল বাবু আবার বল্লেন সেদিন ভিক্ষু উত্তমকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে আমাদের একটা মিটিং হ'ল, সেখানেই আমাদের কথা হচ্ছিল—বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা তু'লে—

স্বাধীনতার পথে সর্ব্বদা বাধা দিচ্ছে। আমাদের দেশেও সেরূপই একটি সমস্যা তুলেছে অর্থাৎ বিদেশীদের এদেশে বাস—বৃটিশ সরকার না থাক্‌লে নাকি এদেশে ভারতীয় এবং অন্য সব বিদেশীর সাথে আমাদের সর্ব্বদা একটা বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকবে। এর জন্যই এদেশে নাকি সদাশয় বৃটিশ শাসনের বিশেষ প্রয়োজন। উকীল বাবুর কথা শুনে আমরা সবাই হাস্‌লুম, তিনি আবার বল্লেন দেখুন কি আশ্চর্য্য কথা আমাদের দেশত আর বেশিদিন পরাধীন হয়নি। পূর্ব্বে এদেশের রাজাই দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা কর্‌তেন। শুধু তাই কি, মনিপুর, আরাকানও এই বর্ম্মী রাজারাই মহা বীরত্বে জয় করেছিলেন। তখনোত এদেশে বিদেশীরা ছিল কিন্তু কৈ কোন কিছু বিসম্বাদ হয়নি ত! উকীল এবার আরো উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—বৃটিশ কুটনীতি যতই চক্রজাল বিস্তার করুক, দিন দিনই কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রহ্মের যুবশক্তি জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিশ্চয় তারা একদিন সফলকাম হ'বে।

হঠাৎ আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, একদিন রেঙ্গুনে এক মিটিংএ এদেশের একজন নেতা খুবই জোর দিয়ে বল্‌ছিলেন—আমাদের একজাত, এক ধর্ম; এক ভাষা, কাজেই ভারতের পূর্ব্বেই আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন কর্‌ব।

আমাদের এসব গল্প-গুজবের ভিতর কখন যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে—ঘরে বাতিগুলিও জ্বলে উঠ্‌ছে। উকীল বাবুর অনুরোধে তার ওখানেই চা খেয়ে একটু বাদে বাসায় ফিরে চল্লুম। পথে পথে মনে হ'ল—যা চোখে দেখেছি সত্যি এরা খুব সাহসী জাত বটে, যে কোন কাজ বা বিপদ বাধায় এরা মেয়ে-পুরুষ নিশঙ্ক ভাবেই সমান সাহস-শক্তিতে এগিয়ে যায়। কয়টি রাজনৈতিক সভা-সমিতিতেও দেখেছি, এদের সবারই প্রাণের কি উৎসাহ ও উদ্দীপনা। জানিনা ভগবান কবে এদের মুক্তিপথে মুখতুলে চাইবেন।

মিঙ্গুন ঘণ্টা ও গটিক-গুহা

উপর ব্রহ্মে অনেক দিন অনাবৃষ্টি হেতু দারুণ রোদের তাপে মানুষ যখন একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়্‌ছিল, ঠিক তেমনি সময় একদিন গভীর রাতে বিধাতার শুভ-আশীর্ব্বাদ-ধারার মত হঠাৎ মেঘ ক'রে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। মানুষের মন বেশ একটু তৃপ্ত হ'ল। ভোর বেলা উঠে দেখি মান্দালয় সহরের চারদিককার পাহাড়গুলো ধূম উদ্গীরণ করছে, মেঘের ঘোর এখনও কাটেনি। একটু বেলায় খানিকটা ফরসা হ'ল, উঁচু পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘগুলো ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবছিলাম আজই বিখ্যাত মিঙ্গুন ঘণ্টাটী দেখতে যাব। কিন্তু দিনের অবস্থা দেখে আর ভরসা হ'ল না। তবে ওখানে যাবার সুবিধাও ছিল। এখানকার একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্রহ্ম মহিলা চা'ল-কলের মালিক। তার একখানা লঞ্চ সপ্তাহে দু'দিন বহু যাত্রীকে ঐ মিঙ্গুনের বিখ্যাত ঘণ্টা ও মন্দির দেখিয়ে নিয়ে আসে। এতে যাত্রীদের কোন পয়সা খরচা নেই, তিনি তাঁর সহৃদয়তা ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই এটি করছেন। লঞ্চ ছাড়বার পূর্ব্বদিনেই তাঁর আফিস হ'তে একখানা পাশ যোগাড় করতে হয়। কারণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীই মাত্র যেতে পারে, আমার জন্য পাশও যোগাড় হয়েছিল, কিন্তু আজ আর যাওয়া হ'বে না।

পরদিন প্রভাতে মেঘান্তরিত সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে ; আজ নির্ম্মল নীল আকাশের গায়ে মেঘের ক্ষীণ রেখাটীও নেই। ভোরেই মহানন্দে একজন সঙ্গী নিয়ে ট্রামে উঠে অতি অল্প সময়েই মান্দালয় সোরে এলুম। আজ যেভাবেই হোক মিঙ্গুন যাবই। বেগবতী ইরাবতী বেশ তর্ তর্ বয়ে যাচ্ছে। সন্ধান নিয়ে জানলুম এখন কোন ষ্টীমার বা লঞ্চ ওখানে যাবে না। তাই একখানা নৌকাই ভাড়া করা হ'ল, মাঝিটী এদেশীয় বেশ শক্ত সবল জোয়ান, লুঙ্গী পরা, আদুড় গা, মাথায় লম্বা চুলগুলি গুটানো, তার উপর রেশমী রুমাল বাঁধা, মুখে একটী ধূমায়িত চুরুট। সে তার আপন ভাষা বর্ম্মী ব্যতীত অপর কোন

ভাষাই জানে না, অবশ্য তাতে আমাদের কোনই অসুবিধা নেই। সে আমাদের ইরাবতীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে প্রতিরোধ ক'রে উজিয়ে চল্‌ল মিঙ্গুনের দিকে। মান্দালয় সহর হ'তে ঐ স্থানটী খুব দূরে নয়। নদীর অপর পার ঘেঁসে একটী চড়া পড়েছে, তার ধার দিয়ে একটী জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। মাঝি নৌকাখানা খানিকটা উজান পথে নিয়ে, পরে ঐ সাম্‌নের চড়াটীর অপর ধারে একটু বাঁক ঘুরে এবার সহযোগী বাতাসে পাল তু'লে দিয়ে নিশ্চিন্তে আনন্দে হালটী ধরে নদীর পাড়ি জমাতে লাগল, এবং নির্ব্বাপিত চুরুটটীর মুখে আগুন জ্বালিয়ে টেনে টেনে ধোঁয়া ছেড়ে মহোৎসাহে এগিয়ে চলেছে। তরঙ্গায়িত ইরাবতীর বক্ষে নৌকাখানা মাঝে মাঝে দোল খেতে লাগ্‌ল। মাঝি কিন্তু নির্ভীক, তার ভাষায় "কেইসা মুসিবু" ব'লে আমাদের ভরসা দিতে লাগলো। একটু এগিয়ে বহুদূর হ'তেই রাজা 'বডোফায়ার' পরিকল্পিত মিঙ্গুনের বিরাট্ মন্দিরের উচ্চ ভিত্তিসৌধ দেখ্‌তে পেলুম। মনে বড়ই আনন্দ হ'ল। বোধ হ'ল যেন খুবই কাছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, মান্দালয় হ'তে ইরাবতীর অপর পারে সাত মাইল ব্যবধানে এই মিঙ্গুন। যতই এগিয়ে চলেছি—চেয়ে দেখছি ইরাবতীর অপর পারে নিবিড় ঘন বনানীর শ্যামল শোভায় উঁচুনীচু পাহাড়গুলো সারি সারি নদীর ধার দিয়ে অনির্দ্দেশভাবে চলে গেছে। তাদের শীর্ষদেশ ঐ বৌদ্ধ-মন্দিরগুলো আরও শোভাময় ক'রে তুলেছে। ইরাবতীর স্বচ্ছ সলিলে মন্দিরের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হ'য়ে কি যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে যেন সৃষ্টির কোন এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে চলেছি, প্রাকৃতিক এত শোভা-সৌন্দর্য্যে সত্যই মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে দেয়। শুধু চেয়ে আছি, নয়ন-মন মুগ্ধ ও তৃপ্ত! নদীতে জেলেরা মাছ ধরছে, পাহাড়ের তলায় গরু-মহিষ চরে' বেড়াচ্ছে, দূর হ'তেই পাখীর কাকলীও ভেসে আস্‌ছে। কতকগুলো পাহাড় আবার জলের ধার হ'তেই যেন উঠেছে। তাদের গা বেয়ে লতানে গাছগুলো এলিয়ে পড়েছে, ঐ ইরাবতীর জলস্রোতে যেন স্নাত হ'বার দারুণ আকাঙ্ক্ষা তাদের। একটু ভেসে গিয়েই আর যেতে পারছে না, হেলে দুলে ডুবে ভেসে শিরশাখাগুলো মর্ম্মবেদনা জানাচ্ছে।

এই সব শোভা-সৌন্দর্য্যের মাঝ দিয়ে কয়েক ঘণ্টার পর আমাদের নৌকাখানা মিঙ্গুনের ঘাটে লাগ্‌ল। নদীর ধারেই দু'টী বিরাট্ আকৃতি ইটের তৈরী ড্রাগন, ভগ্নদেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা নেমে পড়লুম। এই স্থানটী হ'ল একটী পার্ব্বত্য উন্মুক্ত উপত্যকা—বনবীথিকার নির্ব্বাক সৌন্দর্য্য ঘিরে রয়েছে সব দিকটায়। এ স্থানটীর নীরব ভাব-গাম্ভীর্য্য সত্যই উপভোগ্য।

রাজা 'বডোফায়ারের' আদেশে বোধ হয় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত ঘণ্টা তৈরী হয়েছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটী প্রশস্ত সুন্দর গৃহের মধ্যে দুইটী উঁচু লৌহ-স্তম্ভের উপর অপর একটী লৌহ-দণ্ডের সাথে দোলায়িত অবস্থায় আছে। ওজনে ১০৩,৭৫ টন, উচ্চতা ১৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। ইহাকে জগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘণ্টা বলে বোধ হয় অভিহিত করা যায়। সব চেয়ে বড়টী রাশিয়ার মস্কো শহরে রয়েছে, তার ওজন ২০০ টন উঁচু ১৬ ফিট মাত্র।

আমি সঙ্গীকে নিয়ে ঘণ্টাটীর কাছে গিয়ে তার বিরাট্ রূপটী দেখে নির্ব্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। পরে ঘণ্টার গৃহে প্রবেশ ক'রে একেবারে কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখলুম। পুরু পিতলে এটী তৈরী, জানি না এর ভিতর অন্য কোন ধাতুদ্রব্য মিশ্রিত আছে কি-না। উপরে দুইধারে মুখোমুখীভাবে দু'টী সিংহ-মূর্ত্তি আছে, সে দু'টীও পিতলের তৈরী, নেহাৎ ছোট আকারের নয়। এ বিরাট্ ঘণ্টাটী বাজাবার কোন উপায় নেই, তবে একটী মোটা কাষ্ঠখণ্ড সাম্‌নেই পড়েছিল—তা দিয়ে ঘণ্টার গায় দু'চার ঘা দিতে গুরুগম্ভীর শব্দ হ'তে লাগল। মাটি হ'তে দু'তিন হাত উঁচুতে ঘণ্টাটী দোলায়মান। আমরা নীচু হ'য়ে তার অন্তর-গহ্বরে প্রবেশ করলুম। বহু দর্শক ভিতরে ঘণ্টার গায় নাম-ধাম কতকিছু লিখে রেখে গেছে। খানিকবাদে বিরাট্ ঘণ্টাটী দেখে বেরিয়ে এলুম। মনে বেশ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি হ'ল, সত্যিই এই আশ্চর্য্য ঘণ্টাটী জগতে একটী দেখবার জিনিষই বটে।

এখান হ'তে সাম্‌নে এগিয়ে রাজা 'বডোফায়ারের অপর একটী কীর্ত্তি দেখলুম। তাঁর কামনা ছিল এই স্থানটীকে ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্মরণীয়

কেন্দ্ররূপে পরিণত করা—তাই তিনি, চার শ' ছিয়াশী ফুট সমচতুষ্কোণ ভিত্তির উপর পাঁচশত ফুট উচ্চ এক বিশাল মন্দির তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলেন। এ বিরাট্ মন্দিরের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ এক শ' আটষট্টি ফুট তৈরী হ'বার পরই অনিবার্য্য কারণে নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ হয়। এ মন্দিরের ভিত্তি-গর্ভে রাজবংশের স্ত্রী-পুরুষ সবার স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী ক'রে দেওয়া হয়েছিল। মন্দির তৈরী সম্পূর্ণ হ'লে তাঁর বংশের সব মারা যাবে, তাই তিনি অমঙ্গল ভেবে ঐ মন্দির তৈরী করতে বিরত হন। আজও জগৎ সমক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত কীর্ত্তি-স্তম্ভ ঐ ভগ্নপ্রায় মন্দির-ভিত্তি রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে এ মন্দিরের কতকটা ক্ষতি হয়েছে। সত্যিই দূর হ'তেও অসম্পূর্ণ এই বিশাল মন্দিরের রূপ দেখে অবাক্ হ'তে হয়। এক পার্শ্বে বুদ্ধ মূর্ত্তিও স্থাপিত রয়েছে, আমরা ঘুরে ঘুরে কাছে গিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলুম। এ বিরাট্-বপু মন্দিরের সুউচ্চ ভিত্তির কাছে নিজেদের অতি ক্ষুদ্র মনে হ'তে লাগল। আমার মনে হ'তে লাগল সেদিনের কথা, যেদিন রাজা বডোফায়ার ধর্ম্মের প্রবল প্রেরণা হ'তে এ মন্দির তৈরী আরম্ভ করেছিলেন—কতই শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল এর ভিত্তিমূলে। সেদিন কত শত ভক্তই না শ্রদ্ধাপূত অন্তরে এখানে এ দেবতার পায়ে তাঁদের হৃদয়ের ভক্তি-অঞ্জলি দিতে আস্তেন। আজ এ স্থানটী বন-বীথিকায় আচ্ছাদিত হ'য়ে সেদিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে।

আমরা ঘুরে এসে নির্ব্বাক-বিস্মিত অন্তরে, অপর একটী পাহাড়ের উপরে উঠে এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য দেখে আত্মবিস্মৃতের মত শুধু তাকিয়ে রইলুম। নীরব গম্ভীর এ স্থানটীর স্বভাব-সৌন্দর্য্য এত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। সাম্‌নে দূরে চেয়ে মনে হ'চ্ছে দেবতার অপূর্ব্ব সৃষ্টির উৎসারিত সৌন্দর্য্যরাশি যেন ছড়িয়ে পড়েছে। আজ এ পারের বনানীশোভিত মন্দিরময় পর্ব্বতপুঞ্জ সত্যই ঐ রাজ-ঐশ্বর্য্যভূষিত শিল্প-সম্ভারে শোভিত মান্দালয় নগরীকে উপহাস করছে। এ যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন, দূরে ঐ মেমিওর আকাশ ছোঁয়া

পাহাড়ের রূপ-গাম্ভীর্য্য, সাম্‌নে মান্দালয় পাহাড়ের মন্দির শোভা, কাছেই সেগাইন পাহাড়ের শ্যাম-সৌন্দর্য্য, আর এর মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে কুল কুল রবে চলেছে ইরাবতী। এরূপ সৌন্দর্য্যের বিচিত্র মিলন স্থান আর জগতে কোথায় আছে জানি না, মনে প্রাণে খুবই একটা মনোজ্ঞ তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে নীচে নেমে এলুম।

নদীর ধারে ক্ষুদ্র এ পল্লীটিতে আজ আর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই, কয়েকটি মঠ ও মন্দিরে কতকগুলি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাস করেন। গরীব পল্লীবাসীরাই তাঁদের ভরণ-পোষণ করেন। সরকারী একটি ডাকবাংলোও আছে। আর একটি প্রতিষ্ঠান দেখে খুবই সুখী হয়েছিলুম, সেটি হ'চ্ছে বৃদ্ধদের থাকবার আশ্রম। অচল, অক্ষম, রুগ্ন, এদের জন্য একজন সহৃদয়া ব্রহ্ম মহিলা এটী স্থাপন করেছেন। দানশীল ব্যক্তিরা এতে সাহায্য করছেন, বেশ চলছে। এখানে অক্ষম ও শেষ-পথের যাত্রী আশ্রয়ও নিয়েছে অনেক।

এই মিঙ্গুন বর্ত্তমানে সেগাইন জেলারই অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্মরণীয় বৌদ্ধ তীর্থ। হাজার হাজার দর্শক ভক্ত প্রতি বৎসর এখানে আসেন—ধন্য হ'তে, পুণ্য করতে। আমরা এ-সব দেখে একান্ত মুগ্ধচিত্তে নৌকায় ফিরে এলুম। এখানকার স্বভাব গাম্ভীর্য্যে স্থানটি বড়ই নীরব। নৌকা আমাদের ফিরে চল্‌ল মান্দালয়ের দিকে। এই পাহাড়ের কোলে নীরব সৌন্দর্য্যের মাঝে বিশ্বের আশ্চর্য্য এই জিনিষ দুইটি দেখে' সত্যিই প্রাণে আনন্দ হয়েছিল। ফিরে যাবার পথে বার বার চেয়ে দেখতে লাগলুম, ঐ পুরান দিনের আশ্চর্য্য স্মৃতি। এই অমর কীর্ত্তি দেখবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক কত আগ্রহে এখানে এসে উপস্থিত হয়।

মিঙ্গুন হ'তে ফিরে এসে মনে হচ্ছিল গটিক-গুহায় যাওয়ার কথা। ব্রহ্মদেশে যে-সব আশ্চর্য্য সুন্দর বা প্রসিদ্ধ জিনিষ রয়েছে, তার ভিতর গটিক-গুহা অন্যতম। নর্দার্ন সান ষ্টেট রেলওয়ে লাইন তৈরী হ'বার সময়েই এই গুহা আবিষ্কার হয়। পূর্ব্বে ইহা যেন লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে ছিল, বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশের লোকের নিকট এটি বিশেষ পরিচিত। সমগ্র এসিয়াখণ্ডে এই শ্রেণীর গুহার ভিতর এটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাহাড়ের অতি নিম্নে এ বৃহৎ গুহা, তার উপর সুদৃঢ়

লৌহ স্তম্ভোপরি রেলের বিরাট্ পুল তৈরী হয়েছে। এখানে আসতে হ'লে মান্দালয় হ'তে ট্রেনে অথবা মোটরে মেমিও হ'য়ে গাড়ীতে আসতে হয়। গটিক-গুহার কাছেই একটি ষ্টেশন এবং ডাকবাংলো আছে। প্রতি বৎসর জগতের বিভিন্ন স্থান হ'তে অগণিত দর্শক এখানে আসে—এ বিখ্যাত গুহার নীরব রূপ সৌন্দর্য্য দেখে, মুগ্ধ হ'তে।

পরে একদিন আমরাও ঐ আকর্ষণেই মান্দালয় হ'তে রওনা হ'য়ে প্রথমে মেমিও এসে হাজির হ'লুম। মান্দালয় হ'তে কয়েক হাজার ফুট উচ্চে এ পাহাড়ী সহরটি দার্জ্জিলিং শিলংএর মতই শীতপ্রধান ও স্বাস্থ্যকর। সাজান গোছান ছোট সহরটি, রাস্তাঘাট পরিষ্কার—ডাকবাংলো, অফিস, স্কুল, বাজার, ক্লাব, হাসপাতাল সবই আছে। এদেশের লাটসাহেব গরমের সময় সদলবলে এসে কিছুদিন এখানে বাস করেন, তাই সব ব্যবস্থাই রয়েছে। বাঙ্গালী কেরাণীর দলও কতক আছেন এখানে। এ সহরের চারদিককার বনময় পাহাড়ের শ্যাম-শোভা বড়ই মনোমুগ্ধকর। মান্দালয় হ'তে এখানে আসতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগে, গাড়ী বা মোটর নীচু হ'তে আঁকা-বাঁকা পথে বেশ জোরেই উপরে চলে আসে।

আমরা মেমিও ছেড়ে চল্লুম, ট্রেনখানা পাহাড়ের ধার দিয়ে বনানীর মাঝ দিয়ে চিরগম্ভীর নীরবতাকে ভঙ্গ ক'রে ভূমিকম্পের মত শো শো রবে এগিয়ে চল্ল। খানিক বাদে নিবিড় পাহাড়ী অঞ্চলে গটিক ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্ল, আমরা নেমে পড়লুম। পরে রেলওয়ে পুলের পশ্চিম দিককার অপ্রশস্ত জংলি পথটি বেয়ে এঁকে-বেঁকে গিয়ে অতি নিচে গুহার দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে, তার বিরাট্ রূপটি দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলুম। মনে হ'ল যেন, এক স্তব্ধতার রাজ্যে এসে পড়েছি, চারদিকই নীরব গম্ভীর, প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের শোভা যেন উপচে পড়ছে। এই সৌন্দর্য্য মানুষের মারফতে তৈরী নয়, বিধাতার নিজ হাতে এর রূপসৃষ্টি, তাই মানুষ এখানে এলেই নির্ব্বাক-বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। চারদিকেই নীরব বনানীর ঘন শ্যামরূপ-রেখায় নয়নের তৃপ্তি আনে—আর ঐ দূরে অদূরে নিশ্চল পাহাড়ের গাম্ভীর্য্যে মনকে শান্ত ও স্থির ক'রে দেয়। সত্যিই এ

স্থানটি সভাব-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের চিত্রিত। দেখে প্রাণে শান্তি জাগে এবং সেই বিশ্বস্রষ্টার কথা স্মরণ হ'য়ে মস্তক অবনত হ'য়ে আসে।

গুহার মাঝ দিয়ে একটি প্রবল জলস্রোত দিনরাত কল কল রবে বয়ে গিয়ে শেষ সীমায় গভীর গর্জ্জনে একটি গহ্বরে পড়ছে। তার এ জলরাশি কোথায় কোন পথ দিয়ে যে প্রবাহিত হ'চ্ছে আজ পর্য্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। রেল কোম্পানী দর্শকদের জন্য গুহার ভিতরে ঐ জলধারার উপর খানিকটা পর্য্যন্ত একটি ছোট পুল তৈরী ক'রে দিয়েছে। আমরা তার উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলুম। গুহা মুখে দু'একটি প্রস্তরের উপর গুহার ছাদ হ'তে অবিরত জলধারা প'ড়ে প'ড়ে আপনিই যেন এক একটি স্তম্ভের মত তৈরী হয়েছে। কতকগুলো ছোট গাছ ঐ পাহাড়ের গায় মিশে পাথর হ'য়ে গেছে। ভিতরে আরও কয়েকটি ঝরণা হ'তে অবিরল জল ঝরছে, ধারেই জল জমে একটি স্থানে চৌবাচ্চার মত হ'য়ে আছে। গুহার ছাদ হ'তে অবিরাম চুণ মিশ্রিত জল পড়ায় একরূপ কুয়াসার মত সূক্ষ্ম জলের ধারা উৎপন্ন হয়েছে, এতে গুহার রূপটি আরও সুন্দর হয়েছে। ভিতরে ঐ জলধারা ও ঝরণার শব্দ ব্যতীত একেবারে গাঢ় নিঝুম শান্ত নীরবতা বিরাজ করছে। যে দিকেই চাওয়া যায় গুহার অভ্যন্তরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর ও গম্ভীর। এর স্বাভাবিকতাই আরও রমণীয় ক'রে রেখেছে। গুহার উচ্চতা ২৫০ ফুট এবং প্রস্থ ১৭৫ ফুট। বিশ্বের বিচিত্রতার এ একটি আশ্চর্য্য নিদর্শন। ধীরে ধীরে নীরব-গম্ভীর এই বনানীর অন্তরালের গুপ্ত গুহা হ'তে বাইরে এসে উপরের বিরাট্ রেলওয়ে পুলটি দেখতে চল্‌লুম। এইটিও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, মানুষের কর্ম্ম-কৌশলে নির্ম্মিত। এর সম্বন্ধে জেনেছি উচ্চতায় এ পুলটি নাকি জগতে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে। এই দৈর্ঘ্য ২১৩৫ ফুট, উচ্চতা ৩২০ ফুট, ওজন ৪২৪১ টন। নিম্নে ঐ গহন বনে মাঝে মাঝে বাঘ-ভালুক দেখতে পাওয়া যায়। একটু বাদে ষ্টেশনের কাছে ডাকবাংলায় এলুম। ভিজিটার্স বুকে এই গুহা দর্শনকারীদের নামের তালিকা ও অভিমত দেখলুম। জগতের কত দূর দেশ হ'তে যে হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর এ গুহা দেখতে আসে,

তা দেখে অবাক্ হলুম। আমরাও একটি নাম লিখে দিলুম। এখানে বসে কিছু জলযোগও হ'ল। পরে ফেরৎ গাড়ীতেই নিবিড় ঘন বনানীর রাজ্য হ'তে মান্দালয়ের পানে রওনা হ'লুম, রেঙ্গুন হ'তে এ স্থানটি প্রায় ৫০০ মাইল দূর। এই নীরব পাহাড়ী অঞ্চলে যে এরূপ একটি বিশ্ববিখ্যাত গুহা রয়েছে, ইহা না দেখলে সত্যি ব্রহ্মদেশ দেখা ব্যর্থ মনে হয়। এর কিছু দিন বাদেই আমাকে মান্দালয় হ'তে রেঙ্গুন ফিরে আসতে হ'ল।

জল-পথে বেসিন

বড়দিনের ছুটিতে এক সঙ্গীর সাথে নিম্ন-ব্রহ্মের জলপথে "বেসিনে"র উদ্দেশ্যে বের হওয়া গেল। বিকেল ৬টায় রেঙ্গুন সহরের পশ্চিমদিকে ফুঙ্গী ষ্ট্রীট ষ্টীমার ঘাটে ইরাবতী ফ্লোটিলা কোং-র 'ইয়োমা' নামক দোতালা ষ্টীমারখানা বেসিনে যাবার জন্য তৈরী হ'য়ে তীব্রস্বরে যাত্রীদের আহ্বান করছে। আমরাও ঠিক সেই সময় ষ্টীমারের বারংবার আকুল আহ্বানে ব্যস্ত হ'য়ে দু'একবার এদিক ওদিক ঘুরে টিকিট ঘরটি খুঁজে যখন শুনলুম যে, ষ্টীমারের ভিতরেই টিকিট বিক্রী হয়, তখন 'জয় দুর্গা' বলে ষ্টীমারে উঠে পড়লুম। ষ্টীমারে গিয়ে জানলুম, দশ মিনিট পরেই ছেড়ে যাবে। ভিতরে কি ভিড়, কি ভয়ানক হট্টগোল, সহরের সমস্ত কোলাহল যেন এখানে এসে জমা হয়েছে। কেউ মাল উঠাচ্ছে, কেউ জিনিষ ফিরি করছে, কেউ টিকিট কিনছে, কেউ নিজের বস্‌বার স্থানের ব্যবস্থা দেখছে, কেউ বা ঐ অবসরে খাবারওয়ালার দোকানে বসে খেয়েও নিচ্ছে। আবার কেউ বা সঙ্গের বোঝা বুঁচকি এবং লোকজন গুণে দেখছে সব ঠিক আছে কিনা। কুলির চীৎকার, ফেরিওয়ালার ডাক, হকারের কাগজ বিক্রীর চেষ্টা, ষ্টীমারের ঘনঘন বংশী ধ্বনি এক বিষম হট্টগোল সৃষ্টি করেছে। সবাই তাড়াতাড়ি করছে, সিঁড়ির উপরও

ভিড় জমে গেছে। আমরা অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে দু'খানা টিকিট কিনে একপাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখছি। বিছানাপত্র যা সঙ্গে ছিল এক কোণে ফেলে রেখেছি। কারণ, এত যাত্রী হয়েছে যে এতটুকুও স্থান নেই। যাত্রীদের ভিতর বর্মীই বেশী, বাকী সব চীনা, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, ভাটিয়া, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দু'এক জন এংলোইণ্ডিয়ানও আছেন। এই সব বিভিন্ন ভাষাভাষীর সমবেত কলরব এক অপূর্ব্ব সুরের সৃষ্টি করছে। কেউ আপন পরিজনদের বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছে, কেউ বা কুলির পয়সা নিয়ে এক প্রলয় কাণ্ড বাঁধিয়েছে—কুলিও নাছোড়বান্দা, বাবুও একটি পয়সা বেশী দিয়ে গোল মিটাতে নারাজ। এত সব গোলমালের ভিতর ষ্টীমারখানি শেষবার তার বিদায়সূচক গুরুগম্ভীর ধ্বনি ক'রে উঠলো, চট্টগ্রামের সারেঙ তার জাতীয় ভাষায় খালাসীদের সিঁড়ি তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া মাত্রই তা কার্য্যে পরিণত হ'লো। ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেরাণী ও মেথর ব্যতীত সবাই চট্টগ্রামের মুসলমান। জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি প্রায় সব জলযানের কাজ এদের একচেটে।

টুং টাং ক'রে দু'একটি শব্দ হওয়া মাত্র হুস্‌হাস্ শব্দে ষ্টীমারখানা ঘাট ছেড়ে তার গন্তব্য পথে চল্‌লো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাতটা বাজতে চলেছে। ষ্টীমারের বাতিগুলো মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে। এরি মধ্যে কখন যে আলোর দেবতা ঐ পশ্চিম আকাশের আঙিনায় রাঙা আলোর মায়াজাল ছড়িয়ে নদীর জলকেও রাঙিয়ে তুলে তারি ভিতর ডুবে গেছেন—তা এত সময় খেয়ালই হয়নি। শুধু ভাবছিলাম, ষ্টীমারখানা যাতে শীঘ্র ছেড়ে যায়, কারণ তাহ'লেই এই গোলমাল হৈ চৈ অনেকটা অবসান হ'বে। ঠিক হ'লোও তাই। ষ্টীমার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেউ শুয়ে, কেউ ব'সে আরাম করতে লাগলো।

এবার আমরাও একটু বসবার স্থান অনুসন্ধান করতে লাগলুম, কিন্তু অকৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরে এলুম। এত ভিড় যে চলবার রাস্তা নেই, দরজার সাম্‌নেও লোক বসে আছে, কাউকে বলবার কিছু নেই, দাঁড়িয়ে সমস্ত রাত

কাটান বড়ই কষ্টকর বোধ হ'তে লাগলো কিন্তু উপায়ও নেই। অবশ্য যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হতুম তাহ'লে এতটা কষ্ট সহ্য করতে হ'তো না। এসব নানা চিন্তার পর আমার সঙ্গী বন্ধুটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা চট্টগ্রামের ভাষায় খালাসীদের সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন এবং ষ্টীমারের পেছন দিকে যেয়ে তাদের আহার ও বিশ্রামের যে সামান্য একটু উঁচু স্থান আছে, সেখানে বসে তাদের সঙ্গে পান তামাক খেয়ে তাদের কাজকর্ম্ম ও সুখ দুঃখের কথা নিয়ে অনেক আলোচনা করতে লাগলেন। আলাপে তিনি ওদের সাথে একেবারে মিশে গেলেন। সরল প্রাণ খালাসীরাও বাবুকে খুব যত্ন করতে লাগলো। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে বন্ধুর উদ্দেশ্য বুঝে মনে মনে হাস্‌ছি। একটু পরেই তিনি আমাকে ডেকে তার ধারেই বস্‌তে বল্‌লেন। আমি নিশ্চিন্তে বসে পড়লুম এবং মনে মনে বুঝে নিলুম, এভাবেই আজ রাত কাটাতে হ'বে, তবে এ স্থানটুকু যে পেয়েছি এও আমাদের ভাগ্যের জোর বলতে হ'বে। আমাকে খালাসীরা গড়গড়াটা এগিয়ে দিয়ে তামাক সেবনের জন্য অনুরোধ করলো, আমি এ বিষয়ে একেবারে অনভ্যস্ত, তাই ধন্যবাদ দিয়ে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলুম। মনে মনে ভাবলুম, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে রাস্তায় চলতে গেলে এরূপ দু'একটা নেশা অভ্যাস থাকলে বেশ হয়। কারণ, এতে অল্প সময়ের মধ্যেই সহযাত্রীদের সাথে বেশ ভাব করা যায়, নেশার এইটি বিশেষ মাহাত্ম্য। বন্ধুটী ওদের বেশ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, আমিও তাই স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ব'সে ব'সে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমাদের সাম্‌নে একদল বর্মী ছেলে আনাগোনা করছে, বুঝলুম ওদেরও এই একই অবস্থা। বস্‌বার স্থানের অভাব, এরা সব বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে সহর হ'তে গ্রামে ফিরছে। সবাই স্কুল কলেজে পড়ে। ওদের দেখে অনেক কথা মনে হ'তে লাগলো, পোষাক পরিচ্ছদ ও চালচলন দেখে গরীব ধনী বুঝা যায় না, বিশেষ ক'রে ছেলেদের। এরা বিলাসিতায় এমন ভাবে ডুবে আছে যে, দেখলে মনে হয় যেন এই তাদের স্বাভাবিক স্বভাব। সুন্দর রকমারি

বিদেশী সিল্কের লুঙ্গি বা বাম্বি, সুন্দর জামা, জুতা, রিষ্টওয়াচ্, এসেন্স, পাউডার এসব আবার নিত্য নূতন চাই। বিখ্যাত বর্মা চুরট ছেড়ে দিয়ে এরা বিলেতী সিগারেট ধরেছে, প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া চাই। সহরে পড়তে আসলে এরা সর্বদাই বিদেশীদের অনুকরণ ক'রে বিলাসিতায় ডুবে থাকে। তবে এদের জাতীয় পোষাকটির প্রতি যথেষ্ট দরদ আছে। এরা চায় অনাবিল তরল স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে। যদিও এরাই বর্মার ভবিষ্যৎ ভরসা, কিন্তু দেখলে মনে হয় যে, এদের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে। গরীব বাপ-মা টাকা ধার ক'রে, জমি বাঁধা দিয়ে ছেলেকে সহরে পড়তে পাঠিয়েছে, ছেলে সেই টাকা যথেচ্ছভাবে বিলাস ব্যসনে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে। দরিদ্র পিতা পল্লীর কুঁড়েঘরে বসে স্বপ্ন দেখছে—ছেলে আমার বিদ্বান হচ্ছে, কিন্তু কি যে হচ্ছে তা বুঝতে তাদের খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না।

ওদের একটি ছেলের সঙ্গে আমার বর্মী ভাষায় সামান্য আলাপ হ'লো; জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় যাচ্ছ?' উত্তর দিল, 'ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছি।' আরও দু'চারটি কথা বলে সে অন্য দিকে চলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এসেন্সের সুবাসে এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় স্থানটি গুলজার হ'য়ে উঠলো।

ষ্টীমারখানি গভীর জলরাশিকে আলোড়িত ক'রে দ্রুত চলেছে। আমরা পিছনে বসে নদীর স্পর্শ-শীতল স্নিগ্ধ হাওয়ায় বেশ আরাম অনুভব করতে লাগলুম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার নিবিড় আঁধার ঝেঁপে এলো নদীর বুকে। আমাদের দু'-ধারের বড় বড় নৌকা ও সাম্পানগুলো তরঙ্গাঘাতে হেলে দুলে হাবু ডুবু খাচ্ছে। ছোট বড় ষ্টীমারগুলো নঙ্গর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নদীটি এখন সোজা ভাবেই চলেছে। দু'ধারের বন্দরে বড় বড় মিল ও গুদাম সব আলোকমালায় সজ্জিত। বন্দরের শেষপ্রান্তটি বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। একটু এগিয়ে যাওয়ার পরই আর ঐ সব আলো দেখা গেল না। শুধু দূরে বৌদ্ধ-মন্দিরের উচ্চ চূড়া হ'তে লাল নীল নানাবিধ বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছিল এবং মন্দিরের দোলায়িত ছোট ছোট ঘণ্টাগুলোর টুং টাং শব্দ বাতাসের সাথে ভেসে এসে ভগবান বুদ্ধ-

দেবের কথা স্মরণ করিয়ে শ্রবণকেও জুড়িয়ে দিচ্ছিল। আমরা ষ্টীমারের পিছনে বসে এই স্থানটির পরম রমণীয় নৈশ শোভা উপভোগ করতে লাগ্‌লুম।

রাত প্রায় ৮টা হ'তে চল্‌লো। ষ্টীমারের ভিতরে আলোগুলি যেন ক্রমেই ক্ষীণপ্রভ হ'য়ে আসছে। বাহিরের দিকে চেয়ে দেখি সব যেন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে। ব্যাপার কি জানবার জন্য যখনই মনে হ'ল, অমনি বন্ধুটি আমায় ইঙ্গিত ক'রে পিছন ফিরে হাত নির্দ্দেশ ক'রে আকাশের দিকে দেখালেন নদীর অপর পারের গ্রামটি আলোকিত ক'রে আকাশে চাঁদ উঠছে। তার শান্ত স্নিগ্ধ রূপালী আলোর ঝলক জগতের বুকে নেমে এসেছে। আমি উদাসীর মত অপলক চোখে চেয়ে রইলুম, চোখ আর ফিরে আসতে চায় না; শুধু চেয়ে আছি। আহা, কি সুন্দর, কি মাধুর্য্য মণ্ডিত এখানকার চাঁদের আলো!

ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠবার সঙ্গেই তার সম্মুখের বিরাট্ বৈদ্যুতিক আলোটি ঘুরিয়ে দিয়ে নদীর পারে ষ্টেশনের উপর প্রতিফলিত করতে লাগলো। পার হ'তেও লাল একটি বাতি দেখান হ'লো, ষ্টীমার ঠিক জায়গায় এসে থামলো, দু'এক জন যাত্রী সেখান হ'তে ষ্টীমারে এলো। একজন সহযাত্রী বললেন, এইটি টুয়ান্‌টির ক্যানেল অর্থাৎ কাটা নদী, এটি কেটে রেঙ্গুন নদী এবং ইরাবতীর সাথে সংযোগ ক'রে দিয়েছে। এখন সহজেই নিম্ন-বর্মার নানা স্থানে জলপথে যাওয়ার সুবিধা হয়েছে। অনেক দূরের পথ অতি সহজেই অল্প সময়ে যাওয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে, সব চেয়ে সুবিধা হয়েছে সরকারের শাসন সংরক্ষণের। পূর্ব্বে এই কাটা নদীতে মাল বোঝাই নৌকা যেতে-আসতে প্রত্যেক নৌকার একটা নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্স দিতে হ'তো, কারণ বহু অর্থব্যয়ে খালটি কাটা হয়েছে, তাই কতকটা আদায় করবার জন্যই সরকারের এই ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে আর কাউকে ট্যাক্স দিতে হয় না, কয় বৎসরেই অনেক টাকা উঠে গেছে। আমি একবার ষ্টেশনটি দেখলুম। নদীর ধার ইট দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধানো। অদূরে ষ্টেশন ঘরটী দেখা গেল। ১০।১৫ মিনিট পরেই আমাদের ষ্টীমার ছেড়ে চললো। এবার তার সাম্‌নের আলো নিবে গেল, জ্যোৎস্না রাতে

আলো জ্বালাবার নিয়ম নাই, শুধু ঘাটে ভিড়াবার সময় ব্যবহার করা হয়।

ষ্টীমার তার সমান গতিতেই চলেছে, রাত্রিও প্রথম যাম উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। নদীপথে ব্রহ্মের নৈশ সৌন্দর্য্য জ্যোৎস্নালোকে এমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে, তার তুলনা বোধ হয় জগতে বিরল।

এবার রেঙ্গুন নদী অতিক্রম ক'রে ইরাবতীর মাঝ দিয়ে চলেছি। এদেশের প্রধান তিনটী নদীই নানাভাবে এঁকে বেঁকে নানা পথে প্রবল জলপ্রবাহে দেশটীকে উর্ব্বর ক'রে শ্যামল শস্যপূর্ণ গৌরবশালী ক'রে রেখেছে। অবশ্য এই নদীগুলির ভিতর ইরাবতীই প্রধান। তার নামানুসারেই "ইরাবতী ফ্লোটিলা কোং"র নাম। এই কোম্পানী উপর ও নিম্ন-ব্রহ্মের নানা বন্দর হ'তে বাণিজ্য জিনিষ আমদানি-রপ্তানি ও যাত্রী আনা-নেওয়া করে। ষ্টীমারখানা এঁকে-বেঁকে ইরাবতীর গা বেয়ে চলেছে। সম্মুখে ঐ রৌপ্যধারার ন্যায় ইরাবতীর জলোচ্ছ্বাসে শত শত চাঁদ প্রতিবিম্বিত হ'য়ে প্রকৃতই যেন অপূর্ব্ব এক চিত্রশিল্পীর সুদক্ষ তুলি সম্পাতে মায়া-কানন রচনা করেছে। আজ এই জ্যোৎস্না যামিনীতে যেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় সর্ব্বত্রই কি যেন এক আনন্দ ও তৃপ্তির আভাস পাওয়া যায়। আমাদের সহযাত্রীরাও এ আনন্দ হ'তে বঞ্চিত নয়। বিশেষ ক'রে বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ী যারা, তারা ত একেবারে বিভোর চিত্তে আনন্দ উপভোগ করছে। আর মাঝে মাঝে ভগবান বুদ্ধদেবকে স্মরণ করছে। বৌদ্ধমন্দিরের প্রধান প্রধান উৎসবগুলিও পূর্ণিমা তিথিতে হ'য়ে থাকে, তাই চাঁদিনী রাত দেখলেই এই বর্মী বৌদ্ধদের আনন্দ-স্মৃতিগুলি প্রাণে জেগে উঠে, বালক বালিকা তরুণ তরুণী প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলের প্রাণে এক অপূর্ব্বভাবের প্রস্রবণ বয়ে যায়।

অদূরে একটী সুমধুর স্বর শুনেই ফিরে চেয়ে দেখলুম, একটী বর্মী যুবক তার ব্যাঞ্জোটীর সুমিষ্ট সুর লহরীতে পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুবান্ধবীদের মুগ্ধ করতে চেষ্টা করছে। তরুণীরা হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, তরুণরাও তাদের কি বলে যেন ঠাট্টা করছে। মনে হ'ল, ঐ ব্যাঞ্জোর সুর ওদের মন আকুল ক'রে

দিচ্ছে। তাই ওরা উভয় পক্ষই নানারূপ হাবভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে। ওদের ঐরূপ আনন্দ-উল্লাস দেখে আরও সব ছেলে মেয়েরা নিকটে এসে ভিড় জমিয়ে দিলো। এদের মধ্যে একটী ছেলে আবার সুরের সাথে তাল রেখে নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে দেশীয় নাচের কসরৎ দেখাচ্ছিল। তরুণরা ত হেসেই অস্থির। কেউ আজ এই চাঁদনী রাতে আর এই মধুর সুরের ঝঙ্কারে প্রাণের আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। বৃদ্ধেরা দূরে বসে চুরুট টেনে ধোঁয়া ছাড়ছে। আর বোধ হয় তাদের ঐ বয়সের স্মৃতির সাগরে ডুব দিয়ে আনন্দে মগ্ন হচ্ছে।

ষ্টীমারের নানারূপ বিকট শব্দ ছাপিয়ে ঐ যন্ত্রের সুর সকলের মন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে। ষ্টীমারখানা কখনও ইরাবতীর বিশাল বক্ষে কখনও তাহার ক্ষুদ্র শাখা পথে দুলে দুলে চলেছে। মাঝে মাঝে বংশীধ্বনি করে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার ও উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এদেশে ষ্টীমারের সাথে প্রায়ই একখানা ছোট 'সাম্পান' নৌকা থাকে, এ দ্বারা যাত্রিগণকে ষ্টীমার হ'তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দেওয়া ও উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা ষ্টীমার হ'তেই হয়ে থাকে। কারণ, এই ষ্টীমারগুলি নির্দ্ধারিত কয়েকটী বড় ষ্টেশন ব্যতীত ঘাটে থামতে পারে না, তাই এরূপ ব্যবস্থা।

রাত্রি অনেক হ'য়ে চললো কিন্তু কারো চোখে নিদ্রার লেশ নেই। এবার আমি ষ্টীমারের চারদিকটা ঘুরে আসবার জন্য উঠ্‌লুম। যাবার পথ মোটেই নেই, তবুও একজনের পাশ দিয়ে, অপরকে ডিঙিয়ে চলতে লাগ্‌লুম। অবশ্য এ অবস্থায় কেউ একটা কিছু মনে করে না। কারণ সবারই অবস্থা সমান। উপর তলায় গিয়ে দেখি সেখানেও একই অবস্থা। চা-র দোকানটীতে খুব ভিড় জমেছে। বর্মী ছেলেরা চা খাচ্ছে আর গল্প করছে। খুবই স্ফূর্ত্তির মোহরা চল্‌ছে তাদের। একটু দূরে একটী বর্মা যুবক ও একজন প্রৌঢ় দু'টী কাচের গ্লাসে খানিকটা ক'রে (ব্রাণ্ডি) লাল জল, সোডাওয়াটার সহযোগে মুখ বিকৃত ক'রে পান করছে। ষ্টীমারের 'বয়ের' নিকট এসব চাইলেই পাওয়া যায়—তবে একটু বেশী মূল্য দিতে হয়। এ অভ্যাসটী বর্ত্তমানে বর্মীদের সভ্যতার একটী লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষতঃ চাকুরে ও নূতন শিক্ষিতদের ভিতর বেশ চল্‌ছে। আমার আর এগুতে ভরসা হলো না, এখানেও ছেলে মেয়েরা দল পাকিয়ে হাসি ঠাট্টা তামাসায় ব্যস্ত। একটী ছেলের দল তাদের জিনিষ পত্র গুছাচ্ছে দেখে মনে হ'লো যেন তাদের নামবার স্থান নিকটে। সবারই মুখে একটী করে সিগারেট, হাতে সুগন্ধি রুমাল, কারও বা ষ্টিক্। অল্প সময়ের মধ্যেই এরা পোষাক পরিচ্ছদ বদ্‌লিয়ে হাত মুখ ঘসে মেজে সুন্দর মুখগুলিতে পাউডার মেখে পকেট হ'তে চিরুণিখানা বের ক'রে চুলগুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে দিব্যি ফিট্‌ফাট্ হয়ে তৈরী হ'লো। ১৫ মিনিট পরেই ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠলো। এখানে ষ্টীমার ঘাটে লাগবে, তাই পূর্ব্ব থেকে নদীর পাড়ে ষ্টেশন হ'তে একটী লাল বাতি স্থানটী নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছে। ষ্টীমার ঘাটে ভিড়ে তার কাঠের সিঁড়ি বেঁধে দিলো। অমনি দু'চার জন তেলেগু কুলি এবং এদেশীয় দুই তিন জন ফেরিওয়ালা বর্মী মেয়ে ষ্টীমারে এসে তাদের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে সকলকে সাদর আহ্বান করতে লাগলো। এবার নেমে এসে ষ্টেশনটী একবার দেখে নিলুম। যাত্রীরা সব নেমে গেলো, সঙ্গে সেই বর্মী ছেলে কয়টীও,—কারও হাতে সুটকেস, কারও হাতে বর্মী ব্যাগ, কেউ বা ষ্টীক্ ঘুরাতে ঘুরাতে সবাই এখানেই নামলো। যারা এই ষ্টীমারে আসবে তারাও উঠে এলো। ফেরিওয়ালী বর্মীণীদের দোকানে বেশ ভিড় জমেছে। তারা এর মধ্যে দু'চারখানা বাসন খুলে দোকান সাজিয়ে বসেছে। আগ্রহ আকুল দৃষ্টিতে একটু সাম্‌নে গিয়ে দেখলুম, দোকানগুলোতে নানারূপ আহার্য্য বিক্রী হচ্ছে। দাম খুব কম, বর্মী ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই কিনে খাচ্ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দোকানের দু'একটী খাবার জিনিষ চিনলুম, কিন্তু খেতে ইচ্ছা হ'ল না। লাল রংয়ের ভাত পাতায় ক'রে বাধা, ছোট এক পোটলার দাম দু'পয়সা, চিংড়ি মাছ ভাজা ১টী এক পয়সা। আর ডিম সিদ্ধ প্রত্যেকটী ১ আনা। আরও অনেক জিনিষ ছিল—ভাজা ও সিদ্ধ, নাপ্পির ঝোলত আছেই। ঐ সব খাবার একটী প্লেটে সাজিয়ে খানিকটা মসলার গুঁড়ো, পেঁয়াজ-কুঁচানো দিয়ে একখানা চাম্‌চে সহ গ্রাহককে দেয়। একজনের খাওয়া হ'তেই ঐ প্লেটখানা ধুয়ে পুছে অপরকে

খাবার দেওয়া হয়। এদের বেশ দু'পয়সা বিক্রী হ'তে লাগল। অবশ্য একজন ক্রেতা দু'আনার বেশী নেয় না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই চেয়ে দেখি দেড়টা বেজে গেছে। কিন্তু এরা এত রাত্রিতেও দিব্যি ব'সে খাচ্ছে। সঙ্গী বন্ধুটীর নিকট শুনলুম, রাস্তায় ঘাটে, ষ্টীমারে গাড়ীতে, রাত্রি কি দিনে খাবার দোকান দেখলেই এরা কিছু কিনে খাবে। অবশ্য বেশী নয়, দু'চার পয়সায়ই যথেষ্ট। আমি তো শুনে অবাক্। ষ্টীমার ছাড়বার বাঁশী বেজে উঠ্‌লো। দোকানীরা তাড়াতাড়ি তাদের দোকান গুছিয়ে পয়সা নিয়ে নেমে গেলো। ষ্টীমারখানা ঘাট ছেড়ে ঘুরে ফিরে আবার সোজাভাবে চল্‌তে লাগ্‌লো।

এবার আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসলুম। শরীর এলিয়ে পড়লো কিন্তু শোবার স্থান নেই, তবুও কাত্ হয়ে পাশ ফিরে বস্‌লুম। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে আসলো, ষ্টীমারের যাত্রীরাও যেন এবার একটু নীরব নিস্তব্ধভাবে যে যেখানে ছিল ঘুমিয়ে পড়লো। আমার চোখে নিদ্রার লেশমাত্র নেই, কিন্তু শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে উঠে বয়লারের নিকট গিয়ে কলকব্জার ব্যাপারটা নিবিষ্ট হ'য়ে দেখ্‌ছি। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা পরেই দু'জন খালাসী বয়লারের মুখ খুলে কাঠ ও কয়লা ভিতরে দিচ্ছে। এদেশে যথেষ্ট কাঠ পাওয়া যায় ব'লে অনেক ষ্টীমারে কয়লার পরিবর্ত্তে কাঠই ব্যবহার হয়। বেচারীদের অবস্থা দেখে মনে হ'লো, ঐরূপ উত্তাপে কাজ ক'রে বোধ হয় ওদের জীবনীশক্তি শীঘ্রই কমে যায়। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, ঐ কাজটী খালাসীদের সবাইকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য করতে হয়। বয়লারের সম্মুখে ফাঁকা জায়গাটীতে একটী লোক সর্ব্বদা বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে। তার উপরেই ষ্টীমারের গতিবিধি নির্ভর করছে। উপর হ'তে প্রধান কর্ম্মচারী সারেঙ ঘণ্টাধ্বনি ক'রে যেমন ইঙ্গিত করে, ঐ লোকটী তৎক্ষণাৎ তা সমাধা করছে। আমাদের ষ্টীমারখানা তার উপরের চোঙা হ'তে কাল ধোঁয়া উদ্গীরণ ক'রে আকাশের গায়ে মেঘের মত ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে ইরাবতীর গভীর জলরাশিকে আলোড়িত ক'রে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে নদীতে নৌকা বা সাম্পান দেখে দূর হ'তেই উচ্চকণ্ঠে বাঁশী বাজিয়ে মাঝিমাল্লাদের সতর্ক ক'রে দিচ্ছে।

এবার নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিবার চেষ্টা করতে লাগলুম। চোখে তন্দ্রার ভাব জড়িয়ে এল, চুপ ক'রে পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ এ জগতের আর কোন খবরই জানি না, কি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছি কিছুই না, ঘুমিয়ে পড়লুম! হঠাৎ ষ্টীমারের বংশীধ্বনি শুনে জেগে উঠলুম। অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, ষ্টীমারখানা ঘাটে লেগেছে, সম্মুখে বৈদ্যুতিক আলোমালা সজ্জিত একটী ছোট সহর, অদূরে একটী বৌদ্ধ মন্দিরশীর্ষের সুন্দর আলোগুলো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বেশ সাজানো গোছান সহরটী, নাম 'ওয়াকামা'। এস্থানটী নিম্ন-বর্মার একটী জেলাসহর নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল কিন্তু খুব অস্বাস্থ্যকর বলে সরকার এস্থান ত্যাগ ক'রে ২০।২৫ মাইল দূরবর্ত্তী 'মিয়ংমিয়া' নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে জেলাসহর স্থাপন করেছেন। এই পরিত্যক্ত সহরটী সেভাবেই প'ড়ে আছে। বর্ত্তমানে এটি এ জেলার একটী ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান হ'য়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। চাঁদ কখন যে তার গুপ্ত অন্তরালে লুকিয়ে পড়েছে, তা জানতেই পারি নি। চারিদিকে প্রভাতের দূত কাকগুলো কা—কা ক'রে ডাকছে। পূবদিক অরুণরাগে রঞ্জিত হ'য়ে সূর্য্য উঠ্‌বার আভাস জানিয়ে দিচ্ছে। ষ্টীমারের যাত্রীরা ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। জলের কলের কাছে ভয়ানক ভিড় জমে গেছে।

যাত্রীদের উঠা-নামার শেষ হওয়ার বোধ হয় ১০।১৫ মিনিট পরেই ষ্টীমার হু হু রবে ছেড়ে চল্‌লো। এবার প্রভাতী আলোর স্বর্ণাভ কিরণ-সম্পাতে ইরাবতীর অপর একটী রূপ আমাদের নয়ন মনকে মোহিত করতে লাগলো। নদীর উভয় তীরের বিশাল প্রান্তরগুলো পাকা ধানে পরিপূর্ণ, দিনের আলো ও বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হ'তেই দেখা গেল সুবর্ণ তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত একটী প্রান্তর। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কবির কথাটী মনে হ'ল—'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়' ইত্যাদি। স্থানে স্থানে বর্মাচাষীরা ধান কেটে জড় করেছে। পল্লীর এই সব সুন্দর ছবি দেখতে দেখতে ষ্টিমারের খাবারের দোকানে ব'সে দু' কাপ্ চা নিঃশেষ করা গেল, এর মধ্যে অপর একটী ষ্টেশনে এলুম। এইটী এখানকার নূতন জেলা, বেশ ছোট

খাটো সাজানো গোছনো একটী সহর। এখান হ’তেও ভিন্ন ভিন্ন পথে দু’একখানা ষ্টীমার যাতায়াত করে। ফেরবার পথে এই স্থানটী দেখবার ইচ্ছা রহিল। চেয়ে দেখি ষ্টীমারের ভিতর বর্মা ও চীনাদের খাবারের দোকানে ভিড় লেগেছে। যাত্রীরা মহানন্দে দু’চার পয়সার কিনে খাচ্ছে। পনর মিনিট পরেই আবার আমাদের ষ্টীমার ছেড়ে চললো। এদেশে দেখ্‌ছি প্রায় সর্ব্বত্রই চীনারা নানারূপ কাজকর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য করে বেশ পয়সা উপায় কর’ছে। যাবার পথে নদীর জলে ‘কচুরি পানার’ প্রাচুর্য্য দেখে আশ্চর্য্য হ’লুম। ভাবলুম, বাংলা দেশের শস্যক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করে এখন এসেছ বর্মায়। বিশ্বজুড়ে এর বীজ ছড়িয়ে রয়েছে ? অদূরে পার্শ্ববর্ত্তী দু’একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ভিতর চাল-কলের উচ্চ চুঙা হ’তে কাল ধোঁয়া উঠ্‌ছে। ব্রহ্ম দেশ যে ধান চাউলের জন্য বিখ্যাত, তা এর বিশাল ধান্যক্ষেত্র ও বহু চালের কল দেখ্‌লেই মনে হয়।

আমাদের ষ্টীমার খুব দ্রুতগতিতে জলপথ অতিক্রম করে চলেছে। বেলা প্রায় ১২ টার সময় দূর হ’তে ‘বেসিন’ সহরের সুন্দর ঘর বাড়ী দেখ্‌তে পেলুম। এটী ব্রহ্মের বানিজ্যপ্রধান একটী বন্দর। আমাদের ষ্টীমার সহরের অতি নিকটে এলো। সহরটী একেবারে নদীর উপরেই। নদীর উভয় পারেই অনেক ‘মিল’ ও ‘রাইস মিল রয়েছে। শত শত কুলি হৈ চৈ ক’রে মহা উৎসাহে কাজ করুছে। অধিক সংখ্যক কুলিই ভারতীয়। নদীর মধ্যে বিদেশী দু’খানা সমুদ্রগামী জাহাজ মালপত্র নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এরা ফিরে যাবার সময় এদেশীয় বিভিন্ন জিনিষ বোঝাই করে নিয়ে যায়। এখান হ’তে ‘ইরাবতী ফ্লোটিলা কোং’র অনেক ষ্টীমার নানা লাইনে নদীপথে যাতায়াত করে। এ নদীটী খুবই গভীর। আমাদের ষ্টীমার প্রায় ১ টার সময় বেসিন সহরের গায় তার নির্দ্দিষ্ট ঘাটে লাগলো।

ষ্টীমার হ’তে নেমে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে এখানকার একজন বিশিষ্ট ও বর্দ্ধিষ্ণু বাঙ্গালী বাবুর নাম ঠিকানা ব’লতেই গাড়োয়ান ১৫ মিনিটের ভিতর আমাদের সে বাসায় নিয়ে এলো। ভদ্রলোক বাসায়ই ছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে আনন্দে আদর আপ্যায়ন ক’রে তাঁর কাঠের বাড়ীর উপর তলায় নিয়ে

গেলেন। এদেশের প্রায় সহরেই অবস্থাশালী লোকদের বাড়ীগুলো অতি সুন্দর দ্বিতল কারুকার্য্যময় কাঠের তৈরা। দেখতে একটী মন্দিরের মত। এ বাড়ীখানাও সেইরূপ। আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম আলাপে কাটিয়ে স্নান আহার সমাপন করলুম। টেবিল চেয়ারেই আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল, যদিও এরা পূর্ব্ব বাংলার লোক, তা হ'লেও এদেশে এভাবেই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন। আহারের পরও আবার নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার বড় রাস্তায় ও বাজারে ঘুরে আসা গেল। এখানে গুজ্‌রাটী, ভাটীয়া, মোপ্‌লা, চেট্টা, চুলিয়া এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ী অনেক আছে। দু'চারজন বাঙ্গালী মিলওয়ালাও আছেন। তাঁদের অবস্থা ভালই। বাজারে সব জিনিষই পাওয়া যায়। আর এদেশের বিশেষত্ব—রাস্তায় রাস্তায় চা-কাফির দোকান—তা-ও অনেক আছে। প্রায় সাতটায় ঘরে ফিরে এলুম।

পরদিন সকালে একজন ভদ্রলোকের সাথে বেড়াতে গিয়ে এখানকার দু'চার জন বাঙ্গালী, মাদ্রাজী ও গুজরাটীর সাথে আলাপ পরিচয় হ'ল। তারাও খুব অমায়িকভাবে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। প্রায় ১০টায় ফিরে এলুম। আজ বাসার সবাই মিলে আনন্দ ক'রে অনেক প্রকার সুপাচ্য খাদ্যে উদর পূর্ত্তি করা গেল।

বৈকালে বাঙ্গালীদের ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। সম্পাদক ও অনেক সদস্যের সাথে দেখা হ'ল। তারা আমাদের যথেষ্ট খাতির যত্ন করলেন। শুনলাম, এ সহরে নাকি বহু বাঙ্গালীর বাস। তবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী নয়। উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরাণী কয়েকজন আছেন। এ ছাড়া ব্যবসায়ী, ধোপা এবং নাথ শ্রেণীর লোকই বেশী। এরা প্রায়ই চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার লোক। 'নাথ'রা মিলে কুলির কাজ করে। আর কয়েক শ' ধোপা এ সহর এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে কাজ করে। বাঙ্গালী হিন্দুকুলি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এদের দেখে অবাক্ই হয়েছিলুম। এ ক্লাবটীতে অনেক বই এবং খবরের কাগজ আছে। বিভিন্ন রকম খেলারও বন্দোবস্ত আছে। মেম্বরগণ যে কোনটায় যোগ

দিতে পারেন। দেখলুম, একটী ঘরে থিয়েটারের রিহিয়ারস্তাল চল্‌ছে। দেখে খুসীই হ'লুম। এখানে যে এত বাঙ্গালীর সাথে দেখা হবে পূর্ব্বে তা ভাবি নাই। বাঙ্গালীর উপর বিধাতার অভিশাপস্বরূপ দলাদলির বিষ এখানেও ছড়িয়ে আছে। শুনলুম, চট্টগ্রামবাসীদের ভিন্ন একটী ক্লাব রয়েছে। অবশ্য আমি তাদের সাথেও দেখাশুনা করে প্রীতিলাভ করেছিলুম। মোটের উপর এখানে আমার একটি কথা মনে হ'ল, জনৈকবিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন, "বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রীতি যথেষ্ট আছে, কিন্তু নিজ জাতিপ্রীতি তেমন নাই।" মোটের উপর এখানকার বাঙ্গালীদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই। পূর্ব্বে নাকি আরও ভাল ছিল, কেউবা বিশ বাইশ বৎসর যাবৎ ঘর বাড়ী করে এদেশে বাস করছেন। তাদের ছেলেরা এদেশের আবহাওয়ায় মানুষ হচ্ছে। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কেউবা ছেলেমেয়েদের বাংলা দেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

রাত প্রায় দশটায় ফিরে এলুম। পরদিন অতি প্রত্যুষে বেড়াবার ছলে এখানকার জেলখানাটী দেখ্‌তে চল্‌লুম। একটু এগুতেই জেলের বিরাট্ উচ্চ ফটক দেখা গেল। চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত অর্গলবদ্ধ বন্দিশালা—যেন যমপুরী। সম্মুখে উন্মুক্ত অসিহস্তে প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। তবে আলো বাতাসের অবাধ গতি আছে। জেলের বড়বাবু বাঙ্গালী, তিনি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে লাগ্‌লেন। এখানে বহু অপরাধী থাকে, প্রায়ই এদেশীয়। এদের পোষাক হাফ্‌প্যাণ্ট, গায়ে হাত কাটা বেটে জামা—পায়ে লোহার কড়ার সাথে শিকলগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দ করছে। জোয়ান জোয়ান লোকগুলো কাজ করবার ফাঁকে করুণ ভাবে আমাদের পানে চাইছিল। দেখে এদের প্রতি আপনি দয়ার ভাব আসে। জেলার বাবুর সহকারী কয়েদীদের তৈরী অনেক রকম জিনিষ আমাদের দেখালেন। বেশ শক্ত মজবুত জিনিষগুলো দামও বেশ কম, আমরা অনেক বেলায় ওখান হ'তে ফিরে এলুম।

বিকেলের দিকে একজন স্থানীয় সঙ্গীসহ মোটরযোগে বেড়াতে বেরু হ'লুম। মোটরখানা ধীরে ধীরে বাজারের ভিতর দিয়ে এলো নদীর পারে—কতকটা

গিয়ে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চল্‌লো। সহরটি দেখতে বড়ই সুন্দর, নদীর জলের সাথে যেন ভেসে আছে, অর্থাৎ জল হ'তে সহরটি খুব বেশী উঁচু নয়। বর্মীভক্তগণ মেয়ে পুরুষ দলে দলে ধূপবাতি ও পুষ্পগুচ্ছ হাতে মন্দিরে দেবদর্শনে চলেছে। একটু ঘুরে কোর্ট, স্কুল ও পোষ্ট অফিসের মাঝের রাস্তা দিয়ে আমাদের মোটর এগিয়ে চল্‌লো। সঙ্গী ভদ্রলোক এদিককার যা-কিছু দেখবার মত সবই আমাদের দেখিয়ে দিলেন। পরে একটি সোজা রাস্তা ধরে দু'চারটি সাহেবী বাংলো পার হ'য়ে অদূরে ফাঁকা জায়গায় কয়েকটি লম্বা সামরিক ব্যারাক দেখা গেলো। সঙ্গী বললেন, বর্মাবিদ্রোহীদের আতঙ্কে সরকার হ'তে নূতন সৈন্য রাখবার জন্যই ঐ ঘরগুলো তৈরী হয়েছিল, বর্ত্তমানে এ সব খালি পড়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানেও কোন বিদ্রোহী ছিল নাকি? তিনি বললেন, এই বেসিনের সাথেই হেন্‌জাদা জেলা, সেখান হ'তে প্রায়ই বিদ্রোহীদের অত্যাচারের খবর আসতো। এই জেলা হ'তেও ঐরূপ দু'একটি সংবাদ এসেছিলো, তাই পূর্ব্ব হ'তেই সরকার এখানে এত সতর্ক হয়েছিলেন। মোটরখানা আরও এগিয়ে এখানকার লেকের পাশ দিয়ে ছুটলো, সামনে বিশাল মুক্ত ময়দান, চারপাশে তার লোহার তারের বেড়া দেওয়া। শুনলুম, এটি 'এরোপ্লেন' নামবার স্থান। ধীরে ধীরে মৌন সন্ধ্যা নেমে এলো। আমরা পিছন ফিরে লেকের পারে এসে খানিকক্ষণ পায়ে হেঁটে স্নিগ্ধ শীতল মুক্ত বাতাসের স্পর্শে তৃপ্ত হ'লুম, এবং খানিক পরে গাড়ীতে উঠে বাসার দিকে রওনা হ'লুম। এবার গাড়ীখানা বৈদ্যুতিক আলোসজ্জিত নৈশ সৌন্দর্য্যময় সহরটির মাঝখান দিয়ে ফিরে এলো, রাত তখন আটটা হবে।

ফেরবার পথে হিন্দুকুলি নাথদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দিরটি দেখে এলুম। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নিত্য পূজিত হয়। বেশ সুন্দর ঠাকুরবাড়ীটি; অবসর সময়ে সবাই মিলে পাঠ কীর্ত্তন ইত্যাদি করে। দেখে বেশ ভালই লাগলো। এদেশেও যে এরা নিজেদের ধর্ম্মভাবটিকে জাগিয়ে রেখেছে এজন্য এদের প্রশংসাই করলুম। আসবার পথে আমাদের বর্মা ড্রাইভার একটি জন-কোলাহলপূর্ণ স্থান দেখিয়ে বললে—বাবুজী, ওখানে 'পোয়ে' হচ্ছে। তাকিয়ে দেখলুম, আলোমালা-

সজ্জিত একটি স্থানে বহু বর্মী-বর্মিণীর সমাগম হয়েছে। এদেশীয় নাচ গান চল্‌ছে, দর্শকের হাসি তামাসা মুখরিত উচ্চধ্বনি মাঝে মাঝে দিক্‌ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে তুল্‌ছে। রাস্তার ধারে বহু খাবারের দোকান বসেছে, তাদের বিক্রীও বেশ হচ্ছে। রাত ভোর এই নাচগান চলবে, গ্রাহকরাও সারা রাত খাবারের দোকানে ভিড় করবে। যারা এই নৃত্যগীত উপভোগ করতে আসে, তারা পরিবারের সকল স্ত্রী পুরুষ—এমন কি শিশু সন্তানটিও সঙ্গে নিয়ে আসে ঘরে আর কেউ থাকে না। সঙ্গে আসনও নিয়ে আসে এবং ঐ গানের আসরেই তাদের শোয়া বসা সব চলে। নৃত্যগীত শেষ হ'লে দর্শকেরা ফিরে যায়।

বর্মীদের এই 'পোয়ে' নৃত্য সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। এদের নাচের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট গান ও বাজনা খুবই রুচিমার্জ্জিত। নর্ত্তকী এমন সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'ন যে দেখলে মনে হয় যেন স্বর্গের অপ্সরা মর্ত্ত্যধামে নৃত্যকলার নূতন ভঙ্গিমা দেখাবার জন্যই নেমে এসেছেন। এই নৃত্যগীত যেখানেই হবে আশপাশের পল্লী হ'তে শত শত বর্মী ও বর্মিণী মহা উল্লাসে সেখানে সমবেত হবে। পোয়ে এদের এতই প্রিয় যে দুঃখ শোকও ভুলিয়ে দেয়। ড্রাইভার খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ঐ আনন্দে যোগ দিতে চল্‌লো। রাতও অনেক হয়েছে—এবার আমাদের বিশ্রামের পালা।

ভোর হ'তেই নিত্যকার মত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে বাইরে এসে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লুম। সহরটি যে খুব বড় তা নয়, তবে ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। সহরে ভারতীয়েরাই প্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য দখল ক'রে আছে, চৈনিকও কিছু আছে, বর্মী ত আছেই।

সহরে চা'র দোকানগুলিতে সর্ব্বদা বর্মী প্রৌঢ় ও যুবকদের ভিড় জমে আছে। নিকটস্থ পল্লীর মেয়েরা বাজারে ছোট ছোট দোকান ক'রে ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্যবসা এদের জাতীয় জীবনের একটি প্রধান অবলম্বন। সহরটি ছোট হ'লেও এতে দুটি সিনেমা বেশ চলেছে, সেখানেও বর্মীদের বেশ ভিড়। এদের অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল তা নয়—তবে হাতে পয়সা

ব্রহ্মের সুখ্যাত 'পোয়ে' নৃত্য।

পাওয়া মাত্রই আমোদে-আনন্দে সব খরচ করা চাই। সঞ্চয় করবার অভ্যাস এদের নাই—ভিক্ষা করাও তেমন পছন্দ করে না, আর এদের পোষাক-পরিচ্ছদেও গরীব ধনী বোঝা যায় না।

আজকের সকালটি স্থানীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করতে করতে সহরের একটি ছবিঘরের পাশ দিয়ে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঘুরে ফিরে আসা গেল। এখান হ'তে স্থলপথে ও ট্রেনে রেঙ্গুন পৌছা যায়। আসবার পথে শুনলুম, আজ মানবকল্যাণ শ্রীবুদ্ধদেবের পুত্র রাহুলের সন্ন্যাস গ্রহণের শুভতিথি। তাই ধর্ম্মপ্রাণ বর্মীদের মহা আনন্দ উৎসবের দিন। বৈকালে দু'টার সময় একটি শোভাযাত্রা বের হ'য়ে সহর প্রদক্ষিণ ক'রে তারা মন্দিরে যাবে।

আমরা ঘরে ফিরে এসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে স্নান আহার শেষ করলুম। এবার আরাম কেদারায় শুয়ে দু'চারটি বাঙ্গালী ছেলের সাথে এদেশের নানা কথা আরম্ভ করে দিলুম। এরা বেশ বর্মা ভাষায় কথা বলতে পারে এবং এখানকার আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে উঠ্ছে। খানিক বাদে ঝুম্ ঝাম্ টুঙ্ টাঙ্ প্রভৃতি নানারূপ শব্দে সহরখানা মুখরিত হ'য়ে উঠলো। ছেলেরা অমনি আনন্দে কোলাহল ক'রে ব'লে উঠ্লো,—শোভাযাত্রা বের হয়েছে, চলুন দেখবেন। দলে দলে লোক মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো তরুণ তরুণী ছুটে চলেছে রাস্তার ধারে শোভা-যাত্রা দেখবার জন্য।

আমাদের মন বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, ভাবলুম এ সহরে এসেছি এদের আমোদ প্রমোদটা দেখে যাওয়া মন্দ কি! নিকটে যে সব ছেলেরা বসে কথা বলছিলো তাদের তখনই পাঠিয়ে দিলুম। আমরা একটু পরে যে রাস্তার উপর দিয়ে ঐ শোভাযাত্রা যাচ্ছিল তারই পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। এর মধ্যে রাস্তায় ভারতীয় বর্মা ও চীনা দর্শকদের আগ্রহ-আকুল জনতার ভিড় জমে গেছে। ঐ আসছে, ঐ আসছে করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু কৈ শোভাযাত্রা ত এখনও আসছে না, তবে গান বাজনার শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী যে হচ্ছে, তা বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ পরেই শোভাযাত্রার প্রথম ভাগ দেখতে পেলুম।

প্রথম দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর মানিয়েছে, একদিকে বর্মী মেয়েরা মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে হাতে একটি ক'রে নানাবর্ণের পতাকা নিয়ে চলেছে, অপর ধারে বর্মী ছেলেরাও জাঁকালো পরিচ্ছদে সেজেগুজে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে একটি বর্মা যন্ত্রিদল তাদের সুমধুর যন্ত্রধ্বনিতে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে চলেছে। সাথে দু'একটি গান গাইবার লোকও আছে। তারাই প্রথম সুরটা ধরে দেয় তারপর দেখা গেল অপর একটি দৃশ্য—দক্ষিণ-ভারতের তেলেগু কুলিরা এদেশে থেকে যেরূপ নাচগান ও আনন্দ করে, ঠিক তাদের অনুকরণে সেজেগুজে তাদেরই ভাষার গান গাইতে গাইতে নেচে চলেছে একদল বর্মী যুবক। দেখে সবাই অবাক্ হ'লুম, যুবকরা তাদের সুন্দর মুখে ও গায়ে খানিকটা কালি ও রং মেখে মাদ্রাজী কাপড় প'রে ঐরূপ সেজেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং হাবভাব এতটা ঠিক হয়েছে যে প্রথমে ভ্রমই হয়, প্রকৃতই এরা তেলেগু কিনা। এইটি দেখে চারদিকে খুব হাসির রোল পড়ে গেলো। তারপর বর্মীদের একটি সুসজ্জিত নৃত্যশিল্পীর দল খুবই চাকচিক্যময় পোষাকে মেয়েদের মত সুসজ্জিত হ'য়ে ঠিক পোয়ে'র মতই অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গিমায় ও গানে সকলকে মোহিত করে চল্‌লো। এদের ঐক্যতান বাদনও খুব মধুর। এরপর এলো একদল সাপুড়ে। এরা ঠিক পাঞ্জাবীদের মত মাথায় পাগড়ি পরে গাল ফুলিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলা করতে করতে চললো। আমরা এই সব দেখে বিস্মিত, চারদিকে হাসির হৈ চৈ পড়ে গেছে। প্রায় আধ মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রাটি নানাভাবে লোকের মনে একটা বিমল আনন্দ দিয়ে মন্দির পানে চলেছে। আমরা প্রায় শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে দেখে ফিরে এলুম। পথে আমাদের আলোচনা হ'ল ঐ শোভাযাত্রা সম্বন্ধে—এতে বর্মীদের সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচিজ্ঞানের প্রশংসা না করে পারা যায় না। এরা যে সৌন্দর্য্যপ্রিয় তারই সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেল। আমরাও এই নূতন সহরে নূতনত্ব মনে প্রাণে বেশ অনুভব করলুম।

ঘরে ফিরে এসে খানিকক্ষণ পরেই আবার বেরিয়ে পড়লুম। কারণ কালই আমরা এ সহরের মায়া কাটিয়ে ফিরে যাবো, তাই দু'চার দিনে যাদের সাথে

আলাপ পরিচয়ে বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের সাথে বিদায়ের শেষ করতে হ'বে। সবার সাথেই দেখা সাক্ষাৎ হ'ল—তাঁরাও হৃদয়ের আন্তরিকতা জ্ঞাপন করতে একটুকুও কার্পণ্য করলেন না। বাসায় ফিরতে রাত হ'য়ে গেল। ষ্টীমার কোংর টাইম টেবিলটা একবার দেখে নিলুম, সকাল ছটায় আমাদের ষ্টীমার ছাড়বে। এবার আমরা 'মিয়ংমিয়া' হ'য়ে রেঙ্গুন ফিরবো।

রাত্রির আহারাদি শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লুম। ভোর না হতেই বাসার লোকেরা রাত প্রায় পাঁচটায় আমাদের জন্য চা রুটী তৈরী করে অপেক্ষা করছিলেন। সত্যিই এ পরিবারের আন্তরিক আতিথেয়তার কথা লিখে শেষ করা যায় না। আমরা মুখ হাত ধুয়ে জলযোগে মনোযোগ দিলুম। এসময় বাসার সবার সাথেই আবার দেখাশুনা হ'ল। আমরা বাসা হ'তে বিদায় হ'য়ে রিক্সায় উঠে ষ্টীমার ঘাটে এসে দু'খানা 'মিয়ংমিয়া'র টিকিট কিনে ষ্টীমারে গিয়ে বসবার ব্যবস্থা করে নিলুম। বাসার ছেলেরা ষ্টীমার পর্য্যন্ত এসে সজল চোখে আমাদের বিদায় দিয়ে গেল।

ষ্টীমারের চোঙ হ'তে কালো ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে পড়ে আকাশখানাকে মেঘাচ্ছন্ন করে দিচ্ছিলো। আর মাঝে মাঝেই সুচিক্কণ বাঁশীটি উচ্চরোলে যাত্রীদের আহ্বান করছে। ঠিক ছটা বাজবার তিন চার মিনিট পূর্ব্বেই ষ্টীমারের খালাসীরা সব বন্ধনরজ্জু মুক্ত করে সিঁড়িখানা উঠিয়ে নিল। উপর হ'তে সারেঙ টুং টাং করে শব্দ করতেই কর্ম্মকর্ত্তা অমনি কল টিপে' ষ্টীমার চালিয়ে দিলেন।

আমাদের এই চার দিনের পরিচিত সুন্দর সহরটি ত্যাগ করে ষ্টীমারখানা ঝক্ ঝক শব্দে গভীর জলস্রোতকে ভেদ করে আমাদের নিয়ে চলল। ঘাটে আরও দু'তিনখানা ষ্টীমার ভিন্ন ভিন্ন পথে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিয়ে যাত্রীদের সতর্ক করে দিচ্ছিলো। আমাদের ষ্টীমারখানা খুব বড় না হ'লেও মাঝারী রকমের। যাত্রী বেশী নেই। গ্রামের ধার দিয়ে ছোট নদীপথে এই ষ্টীমারখানা যায়-আসে। আমরা এবার অন্য একটি নূতন পথে

চলেছি। ষ্টীমার ঘাট ছেড়ে নদীর মাঝে এসে, ঘুরে সোজা পথে চললো। নদীর উভয় তীরেই কলকারখানা, ঘর বাড়ী ও ভগবান তথাগতের সুবর্ণময় মন্দির চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। সুন্দর কারুকার্য্যময় ঘরগুলি প্রভাতের স্বর্ণাভ কিরণরশ্মিতে মনোহর দেখাচ্ছিলো। সুসজ্জিত একটি চিত্রপটের মত বেসিন সহরটি ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। আমরা আগ্রহে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলুম। এবার সবই অদৃশ্য হ'য়ে গেলো—শুধু সোণালী ধানক্ষেত আর আম নারিকেল সুপারি বাগানবেষ্টিত ছোট ছোট গ্রামগুলি নদীর উভয় তীরে দেখা যেতে লাগলো। শব্দ শুনেই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ষ্টীমার দেখছে আর হাসি তামাসায় হল্লা জুড়ে দিচ্ছে। সামনে নদীর মোহানায় দু'খানা সমুদ্রগামী জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের নাম "জলদূত" ও "জলবালা"। দেখেই বুঝলুম, সিন্ধিয়া কোম্পানীর জাহাজ। খুবই আনন্দ হ'ল। ভারতীয় মূলধনে এই একমাত্র 'দেশী জাহাজ কোম্পানী আছে। মালপত্র নিয়ে এসব জাহাজ ভারতের প্রায় সব বন্দরে যাতায়াত করে। এই কোম্পানীর কতকগুলো জাহাজ আছে। ঐ জাহাজ দু'টি বোধ হয় এখান হইতে ধান বোঝাই করে অপর কোন বন্দরে নিয়ে যাবে।

আমাদের ক্ষুদ্র ষ্টীমার বেশ চলেছে, মাঝে মাঝে যাত্রী উঠিয়ে এবং নমিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। প্রায় আটটা বেজে গেলো, আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছাবো। বর্মাপল্লীর ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা নদীপথে কুণ্ডলাকৃতি কাল ধোঁয়ায় আকাশখানাকে ছেয়ে ষ্টীমার ছুটে চলেছে, বর্মীরা ষ্টীমারে বসে' কেউ খাচ্ছে, কেউ বা নিজেদের তৈরী মোটা চুরুট মুখে দিয়ে খুব ধোঁয়া ছাড়ছে। ষ্টীমারের উভয় পার্শ্বে প্রবল জলরাশি উঁচু হ'য়ে প্লাবনে পার ভাসিয়ে দিচ্ছে।

একটু বাদে ষ্টীমারটি তীব্র বংশীধ্বনি করার সঙ্গেই যাত্রীদের কেউ কেউ বলে যে, ষ্টেশন অতি নিকটে। আমরা এতক্ষণ উভয় তীরে তাকিয়ে দেখছিলুম এদেশের পল্লীশোভা আর নির্ব্বাক অরণ্যানী। পল্লীর পাশ দিয়ে ছোট ছোট জলস্রোত প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে ধারেই তার শ্যামল প্রান্তরসমূহ, সর্ব্বত্রই যেন

ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রূপটি পরিস্ফুট হ'য়ে রয়েছে। আসবার পথে সব দেখতে দেখতে প্রাণে প্রকৃতই একটা আনন্দস্রোত ব'য়ে যাচ্ছিলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, প্রায় দশটা বাজ্‌তে চলেছে। যাত্রীরা তাদের সব বিছানা গাঁঠুরি বেঁধে নামবার জন্য তৈরী হয়েছে। আমরাও ষ্টীমারের পাশে দাঁড়িয়ে অদূরে নদীতীরে "মিয়ংমিয়া" সহরটি দেখতে লাগলুম। ষ্টীমারের গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হ'য়ে আসছে আর তার বংশী ধ্বনি জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে সহরের অতি নিকটে এসেছে। সহরের গায়ে নদীর ভিতর একখানি ফ্ল্যাটের সাথে ষ্টীমার লাগলো; সিঁড়ি বাঁধাই আছে, খালাসীরা শুধু টেনে দিলো।

ষ্টীমার হ'তে সহরের কারুকার্য্যমণ্ডিত বৌদ্ধ প্যাগোডার উঁচু চূড়া এবং কাঠের সুন্দর বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে। নদীর উভয় তীরে ব্যবসায়ীদের অনেক বড় বড় নৌকা বাঁধা রয়েছে। যাত্রী সব ষ্টীমার হতে নেমে গেলো। আমরাও নেমে একটি কুলিকে এখানকার একজন বাঙ্গালী বিশিষ্ট উকিলের নাম জিজ্ঞেস করলুম। সে ইতস্ততঃ করছে দেখে একজন রিক্সাওয়ালা এসে আমাদের জিনিস পত্র নিয়ে বল্‌লো—বাবু, আমি তাঁর বাসা চিনি এবং আপনাদের শীঘ্রই পৌছে দেবো। আমরা রিক্সাওয়ালার সাথে চল্‌লুম। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে যদিও আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই কিন্তু তাঁর নাম অনেকদিন হ'তেই শুনেছি। রিক্সা বাজারের ভিতর দিয়ে সোজা এগিয়ে চললো। পথের দুইদিকে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীর দোকান দেখলুম; মারোয়ারী, হিন্দুস্থানী, ভাটীয়া চেট্টি বেশ আছে। রিক্সাওয়ালা সহর ছাড়িয়ে একটা লাল কাঁকরের সুন্দর ঢালু রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চললো। এ স্থানটিও সহর সংলগ্ন, উভয় পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর কাঠের দোতালা বাড়ীগুলো ফাঁকা ফাঁকা অনেকটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—বেশ নীরব নির্জ্জন। প্রায় এগারটায় এসে বাঙ্গালী উকিল বাবুর বাসায় পৌছলুম। সুন্দর দ্বিতল বাড়ীটি, সম্মুখে ফুলের বাগান আরও শোভা বাড়িয়েছে। খবর পেয়ে উকিলবাবু নিজে এসে খুবই পরিচিতের মত আমাদের আদর আপ্যায়ন করলেন এবং চাকর ডেকে আমাদের জিনিষপত্রগুলো একটা ঘরে রেখে নীচে বসে বিশ্রাম

আলাপ করতে লাগলেন। একটু পরেই আমাদের স্নান আহারের পালা শেষ করলুম। উকিল বাবু সামনে বসে খুব বিনীতভাবে বলিতে লাগলেন— আপনাদের খুবই কষ্ট হ'ল। আমরা শুধু হেসে বললুম, এই যদি কষ্ট হয় তা'হলে আরাম কা'কে বলে। তারপর এখানকার নানা বিষয়ের আলাপ তাঁর সাথে বেশ জমে উঠলো। তিনিও পরিচিতের মত বসে বসে গল্প করতে লাগলেন, তাঁর বিশ্রামও আজ আমাদের সাথেই।

বৈকালের দিকে উকিলবাবুর সাথে আমরা বেড়াতে বের হ'লুম, বাড়ীর সামনের সেই লাল কাঁকুরের পথটির উপর দিয়ে খানিকটা গিয়ে অপর একটি পথে চললুম। পথগুলো বেশ পরিষ্কার, দু'দিকে সুন্দর কাঠের বাড়ীগুলোর সামনের খোলা জায়গায় ফল ফুল ও সাক-সব্জার বাগানের শোভা। কাছেই একটি খোলা মাঠ পার হ'য়ে যেতে দেখলুম, একখানা সুন্দর প্রশস্ত বাড়ী। জিজ্ঞেস করে জানলুম, এটী সাহেবদের ক্লাবঘর। এখানে মুষ্টিমেয় সাহেব থাকে, তা'হলেও তাদের সুখ সুবিধার সকল রকম ব্যবস্থার কণামাত্র ত্রুটি নেই। বেলা নেমে এলো, আমরা এখানকার সিভিল সার্জ্জন বাঙ্গালী এক ভদ্রলোকের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত, পূর্ব্বে জানতুম না যে তিনি এখানে আছেন। এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ায় আমরা উভয় পক্ষই বিশেষ আনন্দিত হ'লুম। খানিক পরে ওখান হতে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে অপর এক বাসায় গিয়ে হাজির হ'লুম। সেখানে বসে প্রায় সব বাঙ্গালী উকিল বাবুদের সাথে আলাপ পরিচয় হ'ল। সকলেরই বাসা অতি নিকটে। কেউ পাঁচ বৎসর কেউ দশ বৎসর হয় এদেশে এসেছেন। মিষ্টার চাটার্জ্জির সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি বহুকাল পূর্ব্বে— যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের জাহাজ যাতায়াত ছিল না, সেই সময় পালের জাহাজে উঠে' এদেশে এসেছিলেন। সে প্রায় ৪৫।৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তাঁর কাছে এদেশের নূতন পুরাতন অনেক রকম গল্প শুনলুম—বেশ আনন্দ হ'ল।

প্রায় আধ ঘণ্টার পর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে চললুম এ সহরের বাড়ীঘর, মন্দির, পথ, উদ্যান, মাঠ ও বনানীর শোভা দেখে ঠিক পল্লীর

নীরব সৌন্দর্য্যের কথাই মনে হ'ল। আমরা আরও খানিকটা গিয়ে এখানকার বাঙ্গালীদের স্থাপিত, মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই শুনলুম, সন্ধ্যা আরতির ঘন্টাধ্বনি। আমরা মন্দিরের সামনে এসে দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিনত প্রাণে প্রণত হ'লুম, এবং মনে যে কি এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করলুম তা ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। দিনের আলো অনেক পূর্ব্বেই নিভে গেছে, এখন সাঁঝের মৌন আঁধার নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। দেবতার আরতি সমাপ্ত হ'ল, আমরাও বেরিয়ে চললুম। উকিলবাবু বললেন, আমাদের দোল, দুর্গোৎসব, পূজা-পার্ব্বণ যা কিছু সবই এখানে হয়। মাইনে করা পুরোহিত রয়েছে। দুর্গোৎসবের সময় নাটমন্দিরে গান, বাজনা এবং প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। সহরের সব হিন্দুরাই সে সময় একসঙ্গে আনন্দোৎসবে যোগ দেন। একথাটি শুনে খুব আনন্দ হ'ল এবং আরও শুনলুম, এঁরা সবাই প্রীতির ভাবে মিলে মিশে আছেন। নিজেরা চাঁদা করে ঠাকুরবাড়ীর ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। আমি মনে মনে ভাবছি, এখানকার ভদ্রলোকেরা বাঙ্গালীর বদ্‌নাম ঘুচিয়েছেন, কারণ বাইরে সর্ব্বত্রই দেখা যায় পাঁচ জন বাঙ্গালীর একসঙ্গে থাকা দায় হয়। এখানে দেখছি তার ঠিক বিপরীত। শুধু বাঙ্গালী নয়, এতগুলো ভারতবাসী একসঙ্গে মিলে মিশে আছে।

দেবালয় হ'তে বে'র হ'য়ে সামনের রাস্তায় দেখলুম মাদ্রাজীদের ঠাকুরবাড়ী। আরো এগিয়ে তিনটি বৌদ্ধবিহার দেখে বাজারের দিকে গেলুম। বৌদ্ধ মন্দিরে অনেক সুন্দর ও বিরাট্ বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে। ব্রহ্মদেশের মন্দিরগুলি দেখলেই এই বর্মীদের ধর্ম্ম ভাবটা যে কতটা সজাগ তা বেশ বোঝা যায়। আমরা বাজারের মাঝের পথটি ধরে' চলেছি, দু'ধারে নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ দোকানের সারি আলোকমালায় সজ্জিত হ'য়ে গ্রাহকের আকর্ষণ করছে। শাক-সব্জী, আলু, মূলা, মাছ মাংসের একটি ভিন্ন বাজার আছে। এরূপ বাজার ব্রহ্মদেশের ছোটখাট সহরের সর্ব্বত্র। উপরে টিনের চালা, চারদিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, চারটি দুয়ার, মাঝে ইটের বাঁধান উঁচু মেঝে

যাতায়াতের প্রশস্ত পথ। ভিন্ন ভিন্ন লাইনে জিনিষপত্র নিয়ে দোকানিরা বেচা-কেনা করে। বাজারে ঝাড়ুদার ও দারোয়ান রয়েছে। দোকানের ভাড়া প্রত্যেক দিনেই আদায় করা হয়। এতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। বাজার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসে এবং বন্ধ হয়। চা'র পাশে দরজাগুলো বন্ধ করে দারোয়ান সারারাত পাহারা দেয়, কারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। দোকানীরা সব বর্মী, চীনা ও ভারতীয়। আমরা বাজারের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসতেই সামনে দেখলুম, একটি চীনা চায়ের দোকানে অনেক বর্মী ও চীনা বসে চা খাচ্ছে, ওখানে শুকর, গরু, পোকা, মাকড় প্রভৃতি অনেক রকম মাংসই বিক্রী হচ্ছে। এবার বাসায় ফিরে চলেছি, উভয় দিকে সব উকিল বাবুদের অফিস, নামের বোর্ড সব টাঙ্গানো রয়েছে, তার পরেই কোর্ট, স্কুল, পোষ্ট অপিস, ইত্যাদি। সরকারী কাজের সুবিধার জন্য এখানে থেকে টেলিফোন লাইন বেসিন পর্য্যন্ত গিয়েছে। আমরা এসব দেখতে দেখতে রাত প্রায় দশটায় ফিরে এলুম। পথের উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভগুলো তখনও আঁধারে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। বাসায় এসে আরও একঘণ্টা গল্পগুজবে কেটে গেল, পরে হ'ল আহার ও বিশ্রাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই উঠে নদীর ধারে বেড়াতে চললুম, সোজা রাস্তায় গিয়ে দুই তিনটি বর্মা পাড়ার ভিতর দিয়ে যেতেই দেখলুম, একটি কারুকার্য্যময় সুন্দর বৌদ্ধ মন্দিরে, শাক্যমুনির অনেক প্রস্তর নির্ম্মিত সুশোভন মূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে। মন্দির দুয়ারে প্রণত হ'লুম। দলে দলে বৌদ্ধ ভক্তগণও এসেছেন অতি প্রত্যুষে দেবতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতে। আমরা আবার সামনের পথ ধরে চললুম। এবার সহর ছেড়ে পল্লীর ভিতরে এসেছি। পথের সামনে খৃষ্টধর্ম্মের বিজয়-স্তম্ভস্বরূপ একটি গীর্জ্জা দাঁড়িয়ে আছে। বর্মীদের সভ্য ও শিক্ষিত করে খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত করবার জন্য পাদ্রীদের আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। এদের একটি স্কুল ও আছে। আমরা ফিরে রওনা হ'লুম। পথে বর্মা-পল্লীর ভিতর দিয়ে আসতে হ'ল। দেখলুম, বর্মীরা কেউ খাচ্ছে, কেউ বা নানা কাজে ব্যস্ত।

কেউ আবার শাক-সব্জী ও খাবার নিয়ে বাজারের দিকে বিক্রী করতে চলেছে, রাস্তায় ফেরিওয়ালিরা নানা জিনিষ নিয়ে ডেকে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেড়িয়ে ফিরে এলুম। উকিলবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এবার সবাই মিলে সকালের জলযোগ শেষ করা গেল। পূর্ব্বে শুনেছিলুম ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব বাঙ্গালী বাস করছেন তাঁরা যদি কোন বাঙ্গালী সাথী পান, তা'হলে অতি আপনার ভাবে আদর আপ্যায়ন করে থাকেন। এখানে এই ভদ্রলোকের ব্যবহারে আমাদের সেই কথাটি বার বার মনে হ'তে লাগ্‌ল। ভগবানের কৃপায় উকিল পরিবারের ধন, জন, বিষয় ও পসার প্রতিপত্তির যথেষ্ট সুনাম এদেশে আছে।

উকিলবাবুকে কথার ছলে আমি জিজ্ঞেস করলুম, এদেশে বর্মীরা আপনাদের প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করে? তিনি উত্তরে বললেন, "সাধারণ লোকদের ভিতর তেমন কিছু বোঝা না গেলেও শিক্ষিত উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার আমাদের প্রতি খুবই বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। কারণ তাঁদের চোখের সামনে আমরা যথেষ্ট পয়সা রোজগার করছি, তাঁরা মোটেই সুবিধা করতে পারছেন না; অবশ্য তাদের পয়সা না পাওয়ার কারণ যে তাঁরা নিজেরাই, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। মক্কেলের পয়সা নিয়ে বর্মী উকিল ব্যারিষ্টাররা মোটেই কাজ করতে চান না, শুধু অলসভাবে সময় কাটিয়ে পয়সা নিতে চান। তাই বর্মীরা তাঁদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে বাঙ্গালী উকিলদের দিয়ে কাজ করাতে আসে। বাঙ্গালীরা পয়সাও যেমন যথেষ্ট নেয়—কাজও তেমন করেন, ফাঁকি দিয়ে বাঙ্গালী বড় হয়নি, খেটেই পয়সা করেছে। বর্মীরা যাই ভাবুক না কেন, আমরা এদেশে যতদিন থাকবো ঠিক বাঙ্গালীর মতই বাস করবো"।

একটু বাদে তিনি কি কাজে সাইকেলে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও সহরের অপর দিকটা দেখবার জন্য আবার বের হ'লুম। যেখানে জেলখানা পুলিশ কোয়ার্টার ইত্যাদি রয়েছে, সেদিকে সোজা রাস্তায় এগিয়ে চললুম, কতকটা গিয়েই একটি আম নারিকেল ও কলাবাগানের ভিতর দিয়ে ধুলাভরা পথে

খানিকটা এগিয়ে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মাঝ দিয়ে চললুম। সাম্‌নেই কাঁকর দেওয়া প্রশস্ত পথটি জেলের দুয়ার পর্য্যন্ত চলে গেছে। উভয় পার্শ্বে আলোক-স্তম্ভ এবং নানা জাতীয় গাছ। আমরা ঐ রাস্তায় জেলের দিকে চলেছি, প্রায় পনর বিশ মিনিট পরে অদূরে দেখলুম, প্রশস্ত জায়গায় উচ্চ প্রাচীর ঘেরা বিরাট্ জেলের অর্গলবদ্ধ প্রধান দুয়ার। বন্দুকধারী প্রহরী দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। দেয়ালের চা'রদিকেই গভীর খাত ও তারের বেড়া, কয়েদী যাতে কোন প্রকারে পালাতে না পারে সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে প্রায় দু'হাজারের উপর অপরাধী থাকতে পারে। ব্রহ্মদেশের সব জেলার জেলখানাগুলোই বেশ প্রশস্ত জায়গা নিয়ে তৈরী। আর আমরা জেলের গেট হ'তেই সবটা একবার দেখে' বাইরে বর্মী পুলিশ, পাঞ্জাবী ও গুর্খাদের থাকবার ব্যারাকগুলোর পাশ দিয়ে ফিরে চল্‌লুম।

জেলের তিন দিকেই প্রশস্ত খোলা মাঠ এবং বনানীর নিবিড় ঘন সবুজ শোভা। আশেপাশে ছোট দু'টি একটি বর্মা পল্লীও আছে। সহরটির প্রায় চারদিকেই এরূপ গভীর অরণ্য। এখানে সহরের কোলাহলের চেয়ে পল্লীর নীরবতাই বেশী। আমরা প্রায় দশটায় ফিরে এলুম।

বিকেলে উকিলবাবুর নিকট বিদায় নিয়ে রিক্সায় উঠে চল্‌লুম। পথে প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের আন্তরিক আতিথেয়তার কথাই মনে হ'তে লাগলো। আবার সেই পরিচিত পথটি দিয়ে চলেছি, উভয় পার্শ্বে বিশাল বৃক্ষরাজির ছায়াশীতল স্নিগ্ধস্পর্শ মনপ্রাণে একটা আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে দিলো। বাজারের মাঝদিয়ে ষ্টেশনে এসে হাজির হ'লুম অদূরে একটি চীনা তাড়ির দোকানে ভারতীয় কুরুঙ্গী কুলীদের ভিড় দেখতে পেলুম। এরা সমস্ত ব্রহ্মদেশ জুড়ে কলে, মিলে, ষ্টীমারে, মাঠে চাষ ও কুলির কাজ করছে। জানিনা কেন এই ক্রেতাদের দেখে অনেকদিনই প্রাণের ভিতর যেন, একটা বেদনা অনুভব করেছি। এ সহরটি ছোট হ'লেও এখানে ভারতীয়দের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। একটু পরেই আমাদের ষ্টিমার ঘাটে লাগলো। ষ্টেশনে ভিড় জমে গেলো, অনেক যাত্রী বেসিন

হ'তে এই ষ্টীমারে এসেছে, কতক এখানে নেমে গেল। আমরা ষ্টীমারে উঠে সামনের দিকে বসে পড়লুম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার অন্ধকারের সাথে ষ্টীমারখানা আলোকমালা সজ্জিত হ'য়ে তার বাঁশীর গুরু গম্ভীর শব্দে সবাইকে চকিত ক'রে নৈশ আঁধারের বুক চিরে রেঙ্গুনের দিকে ছুটে চল্‌ল। আমরা খানিকক্ষণ পরে সুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে দেহটি এলিয়ে দিলুম। পরদিন ভোরে ৬॥ টায় প্রভাতসূর্য্যের আলোক-বিচ্ছুরিত কোলাহলময় রেঙ্গুন সহরের বুকে আমাদের নামিয়ে দিলে।

মগের মুলুক আকিয়াব

এবার বিশেষ দরকারে আমাকে বাধ্য হ'য়েই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রেঙ্গুন থেকে রওনা হ'তে হ'ল আরাকান বা মগের মুলুকে। বর্ষাকাল, খুব ঝড়-বৃষ্টি চল্‌ছে। সমুদ্রের অবস্থা বড়ই ভীষণ, তিন দিনে পাড়ি দিয়ে জাহাজ আকিয়াব সহরে পৌছবে। এসময় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা কেউ যাতায়াত করে না।

রেঙ্গুন বন্দরের ঘাটে দাঁড়িয়ে "চাক্‌দাড়া" জাহাজ খানা তার সুগম্ভীর বংশীরবে যাত্রীদের কানে বার বার তীর ছেড়ে যাবার সঙ্কেত পৌছে দিচ্ছে। নির্দ্ধারিত সময়েই জাহাজ ছে'ড়ে যাবে, তাতে একটুকুও ভুল হ'বে না। যাত্রীরা সব পোট্‌লা-পুট্‌লি নিয়ে আগেই জাহাজে উঠে গেছে। এ জাহাজ এখান হ'তে চাটগাঁ পর্য্যন্ত যাবে। তাই এপথে আরাকান ও চট্টগ্রামের যাত্রীই বেশী যায়। আমি যখন এসে ঘাটে হাজির হ'লুম, তখন জাহাজের সিঁড়ি উঠে গেছে, বন্ধন রজ্জুগুলিও খুলে দিয়েছে। ছাড়বার সময় হ'য়ে গেছে,—অতি ধীরে জাহাজ খানা ঘাট হ'তে সরে যাচ্ছে। আমাকে যেতেই হ'বে। তাই প্রাণপণে

চীৎকার ক'রে বড় অফিসারকে ব'লে জাহাজের গা বেয়ে যে ঝোলান দড়ির সিঁড়িটী রয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটির সাহায্যেই উপরে উঠে গেলুম। একবার যে কোন ভাবে উঠতে পারলে, কে আর নামায়! পূর্ব্বেই আমার কুলিটি "ডেকে" ভাল জায়গা দেখে কম্বল পেতে সামান্য ক'টা জিনিষ ওখানেই রেখে গেছে।

তেতলা বাড়ীর মত বিরাট্ জাহাজখানা নঙ্গর তুলে নদীর মাঝে চল্‌ল। ডেকের রেলিং ধরে এবার নিশ্চিন্তে বন্ধুদের দেখছি ও বিদায় অভিবাদন গ্রহণ করছি। এই ঝড়-বাদলার দিনে সমুদ্র-পীড়ায় যে আমার খুবই কষ্ট হ'বে তার জন্য এবিষয়ে অভিজ্ঞ বন্ধুরা প্রতিকারের উপায়, যার ঝুলিতে যতটা জমা ছিল, আমার সাহায্যার্থে নিঃশেষে উজার ক'রে সবই অকাতরে নিবেদন কর্‌ল। আমি সব শুনে রাখলুম, কিন্তু কি অবস্থায় কি হ'বে তা কে জানে! শুনেছি দু'চার জন যাত্রী নাকি, সাগর-দোলায় বেশ আনন্দেই পাড়ি দেয়, কোনই কষ্ট হয় না। ধীর সমুদ্রে যেতে আমিও ক'বার বেশ আরামই বোধ করেছি। তবে বর্ষার সময়ের অভিজ্ঞতা নেই।

জাহাজখানা বন্ধুদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে এলো। এখনো রেঙ্গুন বন্দরের "প্যাগোডার" স্বুবর্ণ চূড়া ও মিল কলের দু'চারটী চোঙা মাত্র দেখা যাচ্ছে। আরো এগিয়ে যেতেই সব আড়ালে পড়ে গেল। এবার নদীর উপর দিয়ে বি. ও. সির বিরাট্ বিরাট্ তেলের ট্যাঙ্কের সারি, এর পরেই সমুদ্রে পড়তে হ'বে। জাহাজ এখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পরে এগিয়ে গিয়ে সাগর ও নদীর মোহনায় "পাইলট্‌কে" নামিয়ে দিল। সে সাগরের মুখ হ'তে জাহাজগুলিকে বন্দরে নিয়ে যায়, এবং ঘাট হ'তে আবার সমুদ্র মুখে পৌছে দেয়—এই তার কাজ। সমুদ্রে চল্‌তে কাপ্তেনের উপরে সব দায়িত্ব। আমাদের জাহাজের পাইলট্ সমুদ্র মুখে কাপ্তেনকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে জাহাজ হ'তে নৌকায় ক'রে তার গন্তব্য ষ্টীমারে চ'লে গেল। এবার জাহাজখানা সাগর-জলে গা ভাসিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউয়ের তালে দোল খেতে লাগল; আমরাও সে দোলা বেশ অনুভব কর্‌তে লাগলুম। তীরের দিকে সাগরের গভীরতা কম ব'লে জলের রং খানিকটা

সাদা। ক্রমেই জলের গভীরতার সাথে সাথে রংও গাঢ় নীল হ'তে লাগল; গভীর সমুদ্রের জল একেবারে কালো হয়। জাহাজ বেশ দু'লে দু'লে চল্‌ছে।

জাহাজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা অতি অল্প। তাঁরা চেয়ারে ব'সে কেউ গল্প করছেন, কেউ বা কাগজ পড়ছেন। সাধারণ ডেক্‌-যাত্রীর সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। আমিও তাদের মধ্যে একজন। অনেক ডেক্‌-যাত্রীই জল-ঝড়ের ভয়ে আগে থেকেই জাহাজের খোলের মধ্যেই স্থান নিয়েছে। সেখানে আলো বাতাস কোনটাই প্রচুর নয়, তা ছাড়া বড়ই নোংরা। আমি উপরের ডেক্‌ হ'তে চেয়ে দেখ্‌ছি, সামনে চির-চঞ্চল সাগর-বক্ষ, সীমাহীন তরঙ্গমালায় অবিরাম দোল খাচ্ছে। তার গুরু গুরু গর্জ্জন মুক্ত বাতাসের শীতল স্পর্শের সাথে আমাদের প্রাণে সভয় শিহরণ জাগিয়ে দিচ্ছে। উপরে আকাশের গায় জল-ভঁরা মেঘ ছেয়ে আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল সাগরের বুকে। জাহাজের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি জ্ব'লে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘণ্টা বাজলো ঢং ঢং ক'রে। ভদ্র শ্রেণীর যাত্রীরা ডিনার-টেবিলে গিয়ে বস্‌লেন। তাদের টেবিলের পাশে চোগা-চাপকান পরা ও মাথায় পাগড়ী বাঁধা "বয়রা" ঘোরা ফেরা করছে। ডেক্‌-যাত্রী সবাই হোটেল হ'তে সস্তায় কিনে অথবা যার যার পুটুলি খুলে খেয়ে নিচ্ছে। আমি খেতে আরম্ভ করতেই মাথাটা যেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'রে উঠ্‌লো। সব বমি হ'য়ে গেল, শরীরটাও যেন কেমন বোধ হ'তে লাগ্‌লো। খাওয়া আর হ'লো না।

বিছানায় শুয়ে রইলুম। সন্ধ্যার সাথেই খুব জোরে জল ও ঝড় আরম্ভ হ'ল, জাহাজখানাও গভীর সমুদ্রে এসে পড়েছে। এবার জাহাজে ভয়ানক দোল দিতে লাগ্‌ল। দু'পাশ হ'তেই প্রবল গর্জ্জনে পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউগুলি জোরে এসে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছে। এতেই জাহাজখানাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ছে। একটা ঢেউ সামলাতে না সামলাতেই অপর একটা এসে আঘাত করছে। জাহাজ দু'দিকেই দোল খেতে লাগ্‌ল। অবস্থা বুঝে যাত্রীরা যে যার যায়গায় গিয়ে সাবধানে বসেছে বা শুয়ে পড়েছে। এসময় কারোই আর উঠা,

বসা বা চলার উপায় নেই। অভিজ্ঞ খালাসীরা কিন্তু বেশ নিয়মিতভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। তারা মাঝে মাঝে জাহাজের পিছুতে, হালের উপর পরিমাপ-যন্ত্রটী দে'খে এসে কাপ্তেনকে খবর দিচ্ছে, কত মাইল এলো। কাপ্তেন তার ম্যাপ দেখে ঠিক করছে জাহাজ কোথায় এসেছে, এবং ঘণ্টায় কত মাইল চল্‌ছে; মাঝে মাঝে দূরবীণ দিয়েও চারদিক দেখে যেন ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে।

রাতের গভীরতার সাথে ঝড়-বাদল আরও বেড়ে চল্‌ল, জাহাজও ক্রমে বেশী ক'রে দোল খেতে লাগল। এবার যেন চারদিক থেকেই প্রবল ঢেউ এসে তাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে লাগ্‌ল। যাত্রীদের 'আঃ!' 'উঃ!' এবং বমনের শব্দে চারদিক্ যেন আরও ভয়াবহ হ'য়ে উঠ্‌ছে, মাথা উঠাবার আর কারও শক্তি নেই। নিজের অবস্থাও বড়ই শোচনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। শরীরে বড়ই অস্বস্তিকর অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হ'তে লাগল,—শুয়ে ব'সে কোনটাতেই শান্তি নেই, তার উপর পেটের ভিতর কেমন একটা অব্যক্ত যাতনা চল্‌ছে। একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যতীত একথা কাউকে ব'লে বোঝাবার নয়। এবার বেশ বুঝ্‌লুম সমুদ্রপীড়া বা "সি-সিক্‌নেস্‌কে" কেন লোকে এত ভয় পায়। কি আর করি, বন্ধুদের উপদেশ সবই সাগরজলে ভেসে গেল। এখন ভাবছি দুর্য্যোগ রাত্রিটা কাটলে হয়, তা—যে আর কাট্‌ছে না। বিপদ যেন আরও ঘনিয়ে এলো। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের জল গ'ড়িয়ে এসে বিছানা-গুলি ভিজিয়ে দিচ্ছে। অনেক জিনিষপত্র এদিক থেকে ওদিক ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকেই কারো সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই। ধীরে ধীরে বিপদের রাত্রি ভোর হ'ল। ক্রমে ঝড় জল থেমে গেল, চারদিকে মেঘান্তরিত সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তখনও সূর্য্যের দেখা মিল্‌ল না। দুর্ব্বল শরীর, তাই শুয়ে শুয়েই সমুদ্রের অবস্থা দেখতে লাগ্‌লুম। দেখ্‌লুম, সমুদ্রে তখনও কোন পরিবর্ত্তন আসেনি, চারদিকের পাহাড়ে ঢেউগুলি পাগলের মত ছুটে এসে আমাদের জাহাজখানাকে জোর ক'রে জলের গভীরে নিয়ে যেতে চাইছে। জাহাজও প্রবল প্রতিরোধ ক'রে বীর যোদ্ধার মত ঢেউগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে চলেছে। এ যেন উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু এদের এই বাঘে-মোষের যুদ্ধে নিরীহ

যাত্রিদল রুদ্ররূপ দেখে ও গর্জ্জন শুনে পৌছবার আশা যেন প্রাণে আর থাকে না।

জাহাজের ডাক্তার এসে আমার প্রতি একটু সদয় হ'য়ে একটা ডেক্-চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে গেলেন, আর নাক টিপে একটা ঔষধ খাইয়ে দিলেন। সাময়িক একটু আরাম বোধ করলুম বটে, কিন্তু খানিক বাদেই আবার সেই বিশ্রী যাতনা শুরু হ'ল। কিছুতেই যেন এর শান্তি নেই। এমনি একভাবেই সমস্ত দিন রাত্রি যাতনা ভোগ করছি, কত যাত্রী একেবারে মরার মত প'ড়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে বমি করছে, ডাক্তার নাড়ী টিপে ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছেন। কেবিনের যাত্রীরা দুয়ার বন্ধ ক'রে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মুখ বাড়িয়ে বমি করছে। কারুরই এ ব্যাধি হ'তে নিস্তার নেই, একমাত্র জাহাজের কর্ম্মচারীরাই নিরুদ্বেগে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। ঝাড়ুদার ঢেউয়ের জল তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত। সমুদ্রের দিকে আর চাইতে পারছি না, এক একবার মনে হচ্ছে যেন সাগর-তলে জাহাজ শুদ্ধ তলিয়ে যাচ্ছে। আজ আর কারুর আহারাদির সাড়া নেই। সবাই যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ পট্ করছে।

এমনি ক'রেই বড় দুঃখের দিন ও রাত্রি দু'টি কেটে গেল। জাহাজখানা খুবই নির্ভীক ভাবে পাড়ি জমাচ্ছে। পর দিন বেলা প্রায় দশটায় "চক্ফিউ"তে জাহাজ ভিড়ল। সমুদ্রের একটা বাঁকেই চক্ফিউ সহর, জাহাজটা প্রায় এক ঘণ্টা থেমে রইল, সেখানে শুনলুম আজই বিকেলে জাহাজ আকিয়াবে পৌছবে। শু'নে মনে আনন্দ হ'ল। শরীর খুবই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, আমি শুধু এ দুই দিন লিমনসিরাপ একটু জলে মিশিয়ে খেয়েছি, তাও বমি হ'য়ে বেরিয়ে গেছে। এখান হ'তে জাহাজ ছেড়ে আবার সাগরের কয়েক মাইল দূর দিয়ে ঢেউ খেতে খেতে এগিয়ে চল্ল। দুই দিন বাদে আজ একটু চিক্মিকে রোদ দেখা গেল এবং দূরে দূরে সাগরের বুক চিরে উঁচু পাহাড় শ্রেণী কালো রেখার মত দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য্য, ওসব দেখতে পেয়ে যাত্রীরা কেউ কেউ আজ মাথা তুলে চাইছে। জাহাজ আরও এগিয়ে যেতে দূর হ'তে সমুদ্র-গর্ভে ছোট একটি উঁচু পাহাড়ের উপর আকিয়াবের

বাতি ঘর Light House দেখা গেল। এই আলোই রাত্রিতে জাহাজকে পথের নির্দ্দেশ দেয়। সাগরের তীর ক্রমে নিকটে এগিয়ে আস্‌ছে—বেলা আর বেশী নেই। যাত্রীরা পার দেখ্‌তে পেয়েই সত্বর সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ল,—হেসে একে অপরের সাথে আলাপ আরম্ভ ক'রে দিল। জাহাজ যতই এগুচ্ছে, ততই সারি সারি পাহাড়ের শ্রেণী—কালো মেঘের মত দেশটা ঘিরে দাঁড়াতে লাগ্‌ল। এবার অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছি। বিকাল চারটায় সাগর ও নদীর মোহনায় জাহাজখানা আস্‌তেই একজন পাইলট্ লঞ্চ থেকে জাহাজে উঠে এলো। এবার পাইলট্ কাপ্তেনের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিয়ে জাহাজকে ধীরে ধীরে সাগর-মুখ হ'তে নদী-পথে নিয়ে এসে প্রায় পাঁচটায় আকিয়াব বন্দরের ঘাটে লাগিয়ে দিল। এবার সত্যই মগের মুলুকে এসে পড়া গেল।

আশ্চর্য্য, যাত্রীরা যেন এর মধ্যেই নূতন প্রাণ পেয়েছে। গত কয়েক দিনের দুঃখ কষ্ট এক নিমেষে ভুলে গিয়ে বেশ সুস্থ লোকের মতই সবাই নেমে চল্লো। কতক যাত্রী সহরে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে অথবা বেড়াতে গেল। জাহাজখানা আজ এখানে বিশ্রাম ক'রে কাল সকালেই আবার চাটগাঁয়ের দিকে পাড়ি জমাবে। মিঃ দাস আগে থেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন; তিনি জাহাজের নিকটে এগিয়ে আস্‌তেই উভয়ের হাসিমুখে সাদর সম্ভাষণ বিনিময় হ'ল। আমিও বেশ ভাল মানুষটীর মত নেমে তাঁর গাড়ীতেই বাসায় চল্লুম,—জাহাজ থেকে বেড়িয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ভদ্রলোক আমার পথের কাহিনী শুনে বাসায় কি যত্নই না করেছিলেন! আহারাদির পর রাত্রিতে খুব আরামে ঘুমিয়ে পড়লুম্। পরদিন সকালেও অনেক বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে রইলুম, আজও শুয়ে, ব'সে, জিড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন সাগর-দোলায় দুল্‌ছি। অবশ্য শরীরের গ্লানি অনেকটা কেটে গেছে। খানিক বেলায় একজন সঙ্গীর সাথে সহর দেখ্‌তে বেরুলুম। সহরটী বিশেষ বড় নয়। রাস্তাও তেমন ভাল নয়। তবে এখানকার বিশেষ সৌন্দর্য্য হ'চ্ছে—সহরের গা ঘেঁসে বিশাল সমুদ্র অবিরাম তরঙ্গ-দোলায় দুলছে, আর সাম্‌নে দিয়ে

বয়ে যাচ্ছে বিখ্যাত "কালাডোন" নদী। সহরের অন্য সব দিক্‌গুলি শ্যামল বনছায়ায় শোভিত পাহাড়-বেষ্টিত। সহর থেকে পাহাড়-তলীর বাড়ীগুলি বেশ চোখে পড়ে। ঐ সব নিবিড় পল্লীগুলির শান্ত ছবি বহু দূরাগত প্রবাসীর মনে এক অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া এঁকে দেয়। এই আকিয়াব বন্দরটা ধানের প্রাচুর্য্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। আর এই ধানের মায়াতেই—রেঙ্গুন-চাঁটগাঁ লাইনের জাহাজগুলি বার মাস এমনি ঝড় বাদল অগ্রাহ্য ক'রেও ছুটোছুটি করছে। শহরটী ব্যবসায়ীদের বল্লেই হয়। তবে আরাকানিজদের পাশে ভারতীয় ব্যবসায়ীও রয়েছে যথেষ্ট। তার মধ্যে বাঙ্গালীও অনেক, আর বাঙ্গালী ডাক্তার, মাষ্টার ও উকিলের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এসব ভারতীয় ও স্থানীয় আরাকানিজদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত বেশ একটা প্রীতির ধারা চ'লে আসছিলো।

এবার সহরের বিভিন্ন পথে ঘুরে এগিয়ে চল্লুম। আরাকানিজদের গৃহ-শয্যাও ঠিক বর্ম্মীদের মতই—মেয়ে-পুরুষের পরিধানে সেই সুন্দর লুঙ্গি; আহারও সেই দু'বারই সকাল বৈকাল মাছ-মাংস সহযোগে বর্ম্মীদের মতই, কোন পার্থক্য নেই। এ সহরের সব অঞ্চলেই সুন্দর কাঠের বাড়ীগুলির প্রাচুর্য্য চোখে পড়ে। আরাকানিজদের বাড়ী, ধর্ম্মমন্দির, স্কুল, দোকান-পাট, অফিস, হাসপাতাল, ইত্যাদি—সবই দেখা হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেলাও মাথার উপর উঠে এল; এবার ঘরে ফিরবার কথা। মগ মেয়েরা পথে পথে জিনিষ-পত্র ফেরী ক'রে বিক্রয় করছে, তা'ছাড়া বাজারে ক্রয়-বিক্রয় এরাই করে।

এই দেশবাসীরা আরাকানিজ মগ ব'লে প্রসিদ্ধ বর্ম্মীদের সঙ্গে এদের ধর্ম্মের মিল থাকলেও, চেহারায়, গায়ের রংয়ে এবং বংশের ধারায় বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। এদের রং ময়লা, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ, এবং মনে দুর্জয় অপরিসীম সাহস। কথায় লোকে আজও ব'লে থাকে,—"মগে আর বাঘে সমান।" মগ রাজাদের বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। আজও এ দেশের "উরীতং" ও "মেহং" নামে দু'টী স্থানে এদের অতীত গৌরবস্মৃতি জড়িত হ'য়ে সেই রাজ-প্রাসাদ, দুর্গ ও ধর্ম্ম-মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষগুলি

সেদিনের সাক্ষ্য দিবার জন্যই যেন দাঁড়িয়ে আছে। এরাই একদিন দুঃসাহসী নৌ সৈন্য নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলা দেশে আক্রমণ চালাত। বর্ম্মীদের সঙ্গে আরাকানিজ মগদের পোষাকে, চাল-চলনে, আহার-বিহারে এবং সাধু ভাষার সবই মিল থাকলেও, কথার ভাষায় আশ্চর্য্যজনক অমিল দেখা যায়। এ অমিল অতি সুপষ্ট যেমনটী কলিকাতা ও চাটগাঁয়ের ভাষায় দেখা যায়। ভাষার উচ্চারণে বর্ম্মীরা যতই সুনাম অর্জ্জন ক'রে থাকুক না কেন, উচ্চজ্ঞানে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় পূর্ব্বাপর আরাকানিজ মগরাও সমগ্র বর্ম্মা মুলুকে বর্ম্মীদের চেয়ে কম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে নাই। ভিক্ষু উত্তমের অপূর্ব্ব খ্যাতি তার একটি বিশেষ প্রমাণ। এরাও বুদ্ধাশ্রয়ী বুদ্ধদেবকে ফড়া ব'লে সম্বোধন করে, বর্ম্মীরা বলে "ফায়া"; এদেরও পাড়ায় পাড়ায় ফুঙিচঙ (মানাষ্টরী), মন্দির, ভিক্ষু, এবং নিয়মিত ভিক্ষাদান ইত্যাদি এবং ভিক্ষুদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে বর্ম্মীদের মতই এরা সব কিছু নিয়ম শিক্ষা পালন ক'রে থাকে।

আজ আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিঃ দাসের সাথে বেড়াতে বে'র হ'লুম। নদীর ধার দিয়ে যে সুন্দর পথটী সোজা সমুদ্রের দিকে চলে গেছে, সেই পথে গল্প কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে চল্লুম্। এই পথটী সমুদ্রের তীরে যেখানে এসে থেমেছে, সেখানটার নাম "মাঙ্কি পয়েণ্ট্"। এখানেই সহরের নদীটি এসে অসীম সাগরের বুকে ঢ'লে পড়েছে। কি উদার, কি সুন্দর, এই বিরাট্ মোহনা! এর পানে চাইলে মন আপনা থেকেই এক নীরব-গম্ভীর আনন্দে যেন ভ'রে উঠে,—নিজকে যেন আর ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয় না।

তীর থেকে সুরু ক'রে সমুদ্রের গর্ভেও খানিকটা দূর অবধি একটী চওড়া জায়গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সকাল সন্ধ্যায় সহরের অসংখ্য নরনারী বেড়াতে আসে। ওখানে বস্‌বারও ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। আবার এখানে বন্দরের উচ্চ "ফ্ল্যাগ স্টাফ্" দাঁড়িয়ে আছে। তাহার মাথায় টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় বন্দরগামী জাহাজের সঙ্কেতের চিহ্নগুলি।

আমরা এখানে ব'সে বেড়িয়ে বেশ আরাম বোধ করছিলুম। ক্রমে বেলাও নেমে গেল ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশ রক্তিম রংঙে রাঙিয়ে দিয়ে, তীরের মানুষের সাথে রংয়ের হোলি খেল্‌তে খেল্‌তে সহসা সূর্য্যদেব যেন সাগর জলে ডুবে' কোন্‌ অচীন দেশে পালিয়ে গেলেন। অমনি চারিদিকের অন্ধকারের সাথে সাথে মনের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। আমরাও নিঃশব্দে ঘরের পানে ফিরে চল্লুম্‌।

এই আকিয়াবে ক'দিন থাক্‌বার পরেই এ সহর হ'তে বাহিরে পাহাড়ী পল্লী দেখতে বে'র হ'লুম। এখান হ'তে নিত্যই অনেকগুলি ষ্টীমার বিভিন্ন নদী-পথে পল্লী অঞ্চলে কোন মহকুমা অথবা "টাউনসিপে' 'যায় আসে। আমি একদিন সকালে একখানা ষ্টীমারে রওনা হ'য়ে আঁকা-বাঁকা নদী-পথে ঘুরে' ঘুরে' সারাদিন পরে সন্ধ্যায় গিয়ে নিবিড় পাহাড়ী পল্লীর "বুথিডং" মহকুমা-সহরে পৌছলুম। নদীর ধারে ছোট সহর চারদিকে পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা মাত্র কয়েকখানা কাঠের সুন্দর বাড়ীতে অফিস, হাসপাতাল, জেল ও স্কুল। নিকটেই ছোট বাজারটী, সহরের পাশের এবং দূরের মগ-পল্লীগুলি ও দুই একটী বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া চখে পড়ে। এখানে আমি বাঙ্গালী ডাক্তারের বাসায় উঠেছিলুম, তিনি খুবই আদর আপ্যায়ন করলেন, এবং আমার সাথে অনেকদিন পরে বাংলা ভাষায় দেশের দশের অনেক আলাপ ক'রে বোধ হয় প্রচুর আনন্দ পেলেন। আমার কিন্তু এখানে একদিন থেকেই মনে হ'ল যেন, কোন নিরাশ্রয় নিবিড় ঘন জঙ্গলে এসে পৌছেছি—পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'ল,—এজায়গাটা মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। এখানে লোক-গুলি আবার বড় বড় ঝক্‌ ঝকে লম্বা দাঁ হাতে নিয়ে পথ চলে,—দেখে ভয়ই হয়!

পরদিনই একটী কুলী সঙ্গে নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পথে হেঁটে, ছয় মাইল দূরে "মংডু টাউনসিপে" উপস্থিত হ'লুম। পথে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল; কথা কইবার কেহ নেই, তবে প্রাণে আনন্দ ছিল যথেষ্ট। মংডু জায়গাটী বেশ নদীর ধারে, একটা প্রশস্ত স্থানে অফিস, বাজার, স্কুল, হাসপাতাল সবই আছে। অনতিদূরে সাগরের ঢেউ দেখা যাচ্ছে, পাহাড়সারিও কাছে নেই—পল্লীগুলিও সমতলেই।

নিকটেই মগ পাড়ার পরে একটু দূরে কয়েকটা মুসলমান বস্তীও রয়েছে। এরা চাঁটগাঁ ও নোয়াখালি হ'তে এসে বসবাস করছে। কতক বাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়ীও এ অঞ্চলে আছে। এখান হ'তে সপ্তাহে দুইখানা ষ্টীমার নদী-পথে কক্সবাজার হয়ে চাঁটগাঁ যায় আসে।

সরকারী ওভারসিয়ার মিঃ চক্রবর্ত্তীর বাসায় কয়দিন বেশ আনন্দেই কাট্‌ল। আবার এখান হ'তে হেঁটেই সাত আট মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে "আলিজং" বাজারে পালবাবুদের মোকামে গিয়ে হাজির হ'লুম। এরা এখানকার বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী ও জমিদার, বাড়ী কক্সবাজার। এ বাজারটী ছোট হ'লেও জায়গাটী বেশ ভালই লাগ্‌ছে। ঘরে বসেই সাগরের ঢেউ দেখা যায়,—অবিরাম গুরু গুরু গর্জ্জনও কানে আসে। কাছেই মগ-পল্লীর বৌদ্ধ চঙ্‌ বা বিহার দেখা যাচ্ছে। এ বাজারে নিকট ও দূর হ'তে পল্লী ও পাহাড়ের মেয়ে পুরুষ দলে দলে আসে। জিনিষপত্র তারাই কেনে ও বেচে। এখানে পালবাবুদের আন্তরিক আদর-আপ্যায়নে আমার দিনগুলি আনন্দেই কাট্‌ছিল, এবং তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে আমাকে তাঁরা একেবারে আপনার ক'রে ফেলেছিলেন।

পাহাড়ীদের উৎসবে

অগ্রহায়ণ মাস—আরাকানের এই পাহাড়ী পল্লীগুলোতে শীতের আমেজ বেশ পড়েছে, দিনরাত মেঘাচ্ছন্ন গগনের অবিরল বারিপাত কিছুদিন হ'তে থেমে গেছে। সম্মুখে ঐ বিশাল সিন্ধুর গভীর গর্জ্জন শুদ্ধ হ'য়ে আজ শান্ত-শীতল ভাব ধারণ করেছে, শুধু জোয়ারের সময় নিত্য তার উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গলহরী শোঁ শোঁ রবে বেলাতটে আছ্‌ড়ে প'ড়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে যায়। অদূরে সবুজ শ্যামল উঁচু-নীচু গিরিরাজি অচল অটল ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অপরাহ্ণে সূর্য্যদেব যখন পাহাড়-চূড়ার আড়ালে নেমে পড়েন, তখন কুয়াসাচ্ছন্ন হ'য়ে সাগর ও পাহাড়ের মাঝখানটায় সমতল গ্রামগুলো অবধি ঢেকে যায়, মনে হয় যেন সাঁঝের আঁধারে চারিদিক ঘিরে ফেলেছে।

এই সমতলেই আলিজং বাজার। আমি মাঝে মাঝে এখানকার আশেপাশে পাহাড়ী পল্লীগুলো ঘুরে' বেড়িয়ে—এই সরলপ্রাণ, অর্দ্ধ উলঙ্গ, সবল, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ জাতির মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়োর সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে ভাষার আদান-প্রদান ক'রে এবং এদের আড়ম্বরহীন সরল ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের পরিচয় পেয়ে সত্যই মুগ্ধ হয়েছি।

এদিকের পাহাড়ীরা প্রায় সবই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী—আরাকানের মগদের সংস্পর্শে এসে এই অসভ্য জাতিরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। তাই ব'লে এরা নিরামিষ বা অহিংসার পথ গ্রহণ করেনি। দু'চারখানা গ্রাম একত্রিত হ'য়ে ফুঙ্গিচঙ (বিহার) তৈরী ক'রে দেবালয় স্থাপন ও বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রত্যেক চঙেই দু'একজন ফুঙ্গি (ভিক্ষু) থাকেন। পাহাড়ীরা এঁদের "ঠাগু" বলে সম্বোধন করে। ফুঙ্গিরাই ধর্ম্মগুরু—তাঁরাই এদের ধর্ম্মের নীতি ও শীল শিক্ষার উপদেশ দিয়ে থাকেন; ফুঙ্গিদের যা-কিছু দরকার গ্রামবাসীরাই আগ্রহ সহকারে তা সংগ্রহ করে। ভগবানকে এরা 'ফড়া' বলে। আমার নিকট এঁদের 'ফড়া' বা বুদ্ধদেবের কথা শুনে সবাই একেবারে অবাক্। আমি ফড়ার দেশ—ভারতবর্ষের লোক, তাই এরা আমার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিল। এরা যদিও শুনেছে যে, ফড়ার জন্মস্থান ভারতের কপিলাবস্তু নগরে—কিন্তু সে দেশ কোথায়, কতদূর, কি ব্যাপার—সে বিষয়ে মোটেই এদের জ্ঞান নেই। তাই আমার মত সে-দেশের একজন নগণ্য লোককেও কাছে পেয়ে তাদের এত আনন্দ! এমন কি, এদের ফুঙ্গিগণ পর্য্যন্ত অতি আগ্রহ সহকারে ধর্ম্মকথা আলোচনা করবার জন্য আমার নিকটে আস্‌তেন। এ ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি এদের একজন অতি আপনার জন হ'য়ে পড়েছিলুম।

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বেই পাহাড় অঞ্চলের ধান কাটা শেষ হ'য়ে গেছে; সমতলেও এখন ধান কাটা প্রায় শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। তাই বর্ত্তমানে পাহাড়ী ও সমতলবাসী সবারই অবস্থা বেশ সচ্ছল, মনে প্রচুর আনন্দ; কারণ এই ফসলই হ'লো তাদের আয়ের প্রধান ব্যবস্থা। এ সময় চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা সাম্পান (এক প্রকার সাগরগামী নৌকা) যোগে সাগর পাড়ি দিয়ে মগের মুলুকে এসে ধান কিনে নিয়ে যায়, তাই সবারই দু'চার পয়সা আমদানী হয়। সরকারী ট্যাক্সও এসময় আদায় হয়। দেনা-পাওনা, আমোদ-প্রমোদ, দান-ধর্ম্ম সবই এসময় হ'য়ে থাকে।

ক'দিন হ'তেই দূরে ও নিকটে পাহাড়ী পাড়াগুলো উৎসব-আনন্দে মেতে' উঠেছে। আমার নিকট লোকের পর লোক ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হ'তে আস্‌ছে, তাদের উৎসবানন্দে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করতে। সেদিন এক পাহাড়ী সর্দ্দার তার দলবল নিয়ে আমার ঘরের দুয়ারে উপস্থিত। পাহাড়ী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় সে আমায় তাদের পাড়ার উৎসবে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে—"এ ঠাগু ন যাইব? আমার মানু ইমিকা বসি রইব"*। আমার দো-ভাষী কাছেই ছিল, তাকে বল্‌ছে যদি আমি যেতে অস্বীকার করি, তাহ'লে তারা আজ ফিরে যাবে না, প্রায় ৩০ জন লোক—মেয়ে-পুরুষ এভাবে তাদের প্রাণের আব্দার জানিয়ে ব'সে রইল। আমি আর তাদের অবহেলা করতে পারলুম না। পাহাড়ী পথে যত কষ্টই হোক আগামী কাল এদের পাড়ার উৎসবে যাবো স্থির হ'ল। তারা এ সংবাদ শুনে মহোল্লাসে বাড়ী ফিরে গেল। পরদিন দুপুরের আহারাদি সমাপন ক'রে বিশ্রামান্তে প্রায় একটার সময় একজন দো-ভাষী, একজন দেশীয় মগ (বন্দুক-ধারী), আরো তিন-চারজন বাঙ্গালী যুবক সঙ্গে ক'রে আলিজং বাজারের উত্তর-পূর্ব্ব দিকের মাঠের মাঝ দিয়ে রওনা হ'লুম। ধান কাটা হ'য়ে গেছে, তাই সোজা পথে মাঠ পার হ'য়ে, পাহাড়ের অতি নিকটে সমতলের একটী মগ-পল্লীর ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। গ্রামবাসীরা আমার পূর্ব্বপরিচিত, আমাদের দেখে দুই-একটী কুকুর

* (চট্টগ্রামের লোকেদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে এরা এই বাঙ্গালা শিখেছে)।

চীৎকার করতেই গ্রাম্য বালকগণ তাদের থামিয়ে দিয়ে, আমাদের সঙ্গে রাস্তায় কতকটা এগিয়ে এলো। এবার সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্‌ছি। সম্মুখে, দূরে, পার্শ্বে—শুধু চোখে পড়্‌ছে নিবিড় বনানীর সবুজ শোভায় উঁচু-নীচু পাহাড়-শ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও বা বনানীর আভরণ-বিবর্জ্জিত নগ্ন-দেহ নিশ্চল পর্ব্বত—তার শূন্য গা' বে'য়ে উপর হ'তে কল্‌কল্‌ রবে ঝরণা-ধারা অবিরল প্রবাহিত হ'চ্ছে। আমাদের একজন পথ দেখিয়ে সাম্‌নে এগিয়ে চলেছে, সবাই তাকে অনুসরণ করছি—কখন পাহাড়ের গা বে'য়ে, কখন বা তার পাশ দিয়ে, আবার কখনও দু'টী পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে, এই বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে এগিয়ে চলেছি। একসঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি বেশ উৎসাহে ও আনন্দে গল্প করতে করতে যাচ্ছি, তা না হ'লে একা এ জনবিরল পথ চলা খুবই কষ্টকর হ'ত। এসব পাহাড়ে বাঘও, হাতীর উৎপাত যথেষ্ট। বন্য হরিণ আশে পাশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়ায়। এবার আমরা খানিকটা পথ ঘুরে উপরে উঠতেই চারিদিকে আর কিছুই দেখছি না, শুধু দিগন্ত হাওয়া, পাহাড়পুঞ্জ। যে দিকেই চেয়ে দেখি সেদিকেই পাহাড় আর পাহাড়, চেয়ে চেয়ে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে দু'একটা পাহাড়ে পাখীর সুমিষ্ট সুরলহরী এই নিবিড় নিস্তব্ধ অরণ্যানীকে মুখরিত ক'রে আমাদের প্রাণকেও মোহিত করছে। বেশ ধীরে ধীরে পথ চলেছি। অদূরে উঁচু একটি পাহাড়ের একস্থানে পাহাড়ীদের সাত আটখানা ঘর দেখা গেল। ছোট ঘরগুলো তিন-চার ফিট উঁচু বাঁশের খাঁচার উপর বাঁশ ও পাতা দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক ঘরেই একটি আস্ত গাছের লম্বা একখানা সিঁড়ি রয়েছে ওঠা-নামা করবার জন্য; রাত্রে রাত্রে ওটা উঠিয়ে রাখা হয়। আরো এগিয়ে যেতে দু'দিকেই দেখা গেল, ওরকম দু'তিনটি পাড়া অনেকটা ব্যবধানে রয়েছে। চলার পথে অনেক কথাই মনে হ'লো, পাহাড়ীরা যে কত কষ্টসহিষ্ণু, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বারমাস কত বড় বড় বোঝা নিয়ে অবাধে এই বিপদসঙ্কুল দুর্গম অপ্রশস্ত পথ বে'য়ে মেয়ে-পুরুষ সর্ব্বদা যাওয়া-আসা করছে! কোনও কষ্ট বা অসুবিধা তাদের বোধ হয় না।

এবার আমারা একটী নদী পার হ'য়ে চলেছি, মাত্র একহাঁটু জল, স্রোত তেমন নেই—তবে খুবই কন্‌কনে ঠাণ্ডা। পার হ'বার সময় মনে হ'ল যেন পা দু'খানা অসাড় হ'য়ে গেল। উভয় পার্শ্বের বাঁশবন নদীটীকে ঢেকে রেখেছে—সে এঁকে-বেঁকে পাহাড় হতে নিম্নে সাগরে গিয়ে মিশেছে। সঙ্গীরা বলেন, "ফেরবার সময় নদীতে জোয়ার হ'বে, সে সময় দেখবেন, এ নদীর কি প্রবল স্রোত।" আমি কিন্তু দেখে' কিছু বুঝতে পারলুম না—একটি শুষ্ক জলধারা বলেই মনে হ'ল। পথপ্রদর্শক এগিয়ে চলেছে, আমরাও তার পিছু পিছু চলেছি। সামনে ও ধারে পাহাড়ের গায়ে, তূলা, কলা, শশা, কুমড়া—নানাজাতীয় ফসল ফলে রয়েছে। এই হ'লো পাহাড়ীদের কৃষিক্ষেত্র। ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোন কোন পাহাড়ের জঙ্গল কেটে' অগ্নি-সংযোগে পরিষ্কার করা হয়; পরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটু বৃষ্টি হ'লেই একদিকে হয়ত কলা, কচু ইত্যাদি লাগিয়ে, অপরদিকে ধান, যব, তিল, সরিষা, শশা ও কুমড়া প্রভৃতির বীজ কাটারির সাহায্যে একটু খুঁড়ে একসঙ্গে মিশিয়ে, পুঁতে দেয়। এদের লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে হয় না,—একটি দাঁ দিয়েই সব কাজ করতে হয়। সব ফসলের গাছই এক সঙ্গে গজিয়ে ওঠে—যে গাছে যখন ফসল হয়, সেটিকে কেটে' নিযে যায়। বর্ত্তমানে ধান, যব কেটে' নিয়ে গেছে—অবশিষ্ট ফসলের গাছগুলো রয়েছে, তাদেরও ফলফুল হচ্ছে।

আমরা এ চিরগম্ভীর গিরিরাজীর শান্ত নীরব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে কর্‌তে চলেছি। এবার আমাদের পথ-প্রদর্শক অদূরে পাহাড় চূড়ায় একটি ফুঙ্গিচঙ নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌লে, "আমরা ঐ পাড়ায় যাবো।" আর বেশী দূর নয়,—দেখে আমাদের মনেও ভরসা এলো, কিন্তু ঐ ফুঙ্গিচঙ ব্যতীত পাড়াটি এখনও দৃষ্টির বাইরে। আরো এগিয়ে এবার দেখ্‌তে পেলুম—নিকটেই বড় রকমের একটি পাহাড়ী পাড়া জন-কোলাহলে মুখরিত উৎসবানন্দের সাড়া ভেসে আস্‌ছে। পাড়ার মোড়ল তার লোকজন নিয়ে বহুক্ষণ অবধি আমাদের পথ চেয়ে' রয়েছে; এবার আমাদের দেখ্‌তে পেয়েই মহানন্দে ছুটে এসে তাদের রীতি অনুযায়ী আদর-আপ্যায়ন ও সম্মান ক'রে পাড়ার ভিতর দিয়ে ফুঙ্গিচঙে নিয়ে গেল।

সবাই উৎসবানন্দে মেতে রয়েছে বটে, কিন্তু মোড়ল যেন আমাদের না আসা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পারছিল না,—তাই এখন সে আনন্দে অধীর। আমাদের জন্য কি করবে তাই নিয়ে সে অতি ব্যস্ত। ফুঙ্গিচঙটি এ বস্তি হ'তে অনেকটা উঁচু পাহাড়ে, আজ এখানে চারদিকার পাহাড়ী পাড়া হ'তে মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো এ উৎসবে আনন্দ কর্‌তে এসেছে। অপরিচিত অনেক নূতন পাহাড় আমাদের দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। আমরা বুদ্ধচঙে গিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সামনে প্রণত হ'য়ে বাইরে এলুম। একজন ফুঙ্গি আমাদের চঙটি ঘুরিয়ে দেখালেন।' যদিও আশ্রমটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় নীরব গিরিশৃঙ্গে স্থাপিত, তা হ'লেও নূতন ক'রে আজ উৎসব উপলক্ষে লতা-পুষ্পে তাকে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

এবার গ্রামের প্রধান আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে তাদের পল্লীর সম্মুখে বিরাট্ উৎসব-ক্ষেত্রে হাজির হ'লেন। এখানে এসে উৎসব ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'লুম। ন্যাংটা পাহাড়ীদের সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র ধারণা আরও পরিবর্ত্তিত হ'ল। তাদের পরিধানে একটিমাত্র কৌপীন—মেয়েদের একহাত প্রস্থ দু'খণ্ড বস্ত্র কোমরে ও বুকে জড়ান, সভ্য জগতের কোন খবরই তারা রাখে না। সেই উলঙ্গ, অভদ্র, পাহাড়ী জাতির যে এতটা সৌন্দর্য্য-বোধ তা' এ ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। উৎসবের প্রশস্ত স্থানটিকে বাঁশ ও পাতার দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে একটি মঞ্চ তৈরী হ'য়েছে, যাতে দুই-তিন শত লোক বস্‌তে পারে। তার এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হ'তে আগত ফুঙ্গি এবং প্রধান ব্যক্তিদের জন্য বাঁশের মাচা বেঁধে পাতার ছাউনি দিয়ে একটি লম্বা ঘর তৈরী হ'য়েছে।

আমরাও এই ঘরে ব'সে বিশ্রামের সঙ্গে এদের সব অনুষ্ঠানগুলো অতি আগ্রহ ও প্রীতি সহকারে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। আমাদের পার্শ্বেই ছয়-সাতজন ভিক্ষু ব'সে রয়েছেন; এঁরা অন্য স্থান হ'তে এসেছেন। ইতিমধ্যে সর্দ্দারের ইঙ্গিতে দুইজন সেবক—উৎসবের অতিথিদের যাঁরা আদর যত্ন করছেন তাঁরা আমাদের জন্য আখের সরবৎ নিয়ে এলেন,—তাদের এই সশ্রদ্ধ দান আমরা সবাই মহানন্দে—গ্লাসের

পরিবর্ত্তে বাঁশের চোঙ্গায় ক'রে পান ক'রে পরিতৃপ্ত হ'লুম। মঞ্চের মাঝখানে পুষ্প-পত্রে শোভিত উচ্চ আসনে ব'সে একজন প্রাচীন ফুঙ্গি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ আরম্ভ করেছেন। এতে তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে। এ পুঁথি সমাপ্ত না হ'লে তিনি আসন ছেড়ে উঠবেন না—ঠিক হিন্দুদের চণ্ডী পাঠের মত, খুব নিষ্ঠার সহিত পাঠ করছেন। সম্মুখে এক দিকে মেয়েরা, অপর পার্শ্বে পুরুষেরা ব'সে নিবিষ্ট মনে ভক্তি-সহকারে পুঁথি শ্রবণ করছে। সত্যই পাঠ শ্রবণে দয়াল দেবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। খানিকক্ষণ পরে গ্রামের সর্দ্দার আমাদের নিয়ে উৎসব-ক্ষেত্রের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে গিয়ে যা দেখ্‌লুম, তাতে হৃদয়-মন আরো উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো।

সামনে একটা সমতল মাঠের মাঝখানটায় উচ্চ মঞ্চের উপর বুদ্ধদেবের সুন্দর একটী মূর্ত্তি বসিয়ে, তার চারিদিকে বিস্তৃত স্থানে বাঁশের কেয়ারির দ্বারা ঘিরে' মাঝে আকা-বাঁকাভাবে অনেকগুলো রাস্তা তৈয়ারী করা হ'য়েছে ; কিন্তু প্রবেশ পথ একটী, অপরগুলি বে'র হ'বার পথ। একটু সতর্ক ও বুদ্ধিমানের মত প্রবেশ-পথে যেতে হয়, নয়তো পথ হারিয়ে গোলে পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা ; রাস্তাগুলো সে ভাবেই তৈরী। প্রবেশ-পথে গিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে মাঝখানে বুদ্ধমূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হ'য়ে আলো জেলে প্রণাম প্রার্থনাদি ক'রে অপর পথে ঘুরে বে'র হ'তে হয়। এদের ধারণা পুণ্যবান্ সোজা সরল পথে একেবারেই "ফড়ার" নিকট চলে যায়। পাপীকে সংসারে ঘুরে ঘুরে, ভুলে ঠেকে, অনেক কষ্ট পেয়ে তাঁর নিকট যেতে হয়। তারই উদাহরণ স্বরূপ ঐটী তৈরী করা হ'য়েছে। একে অভিমন্যু বধের চক্রব্যূহ বল্‌লেও মন্দ হয় না। দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ঘুরে' ঘুরে' ঐ ব্যূহ ভেদ ক'রে ভগবানের সকাশে চলেছে, কেউ বা সোজা পথে যাচ্ছে, কেউ কেউ বা হঠাৎ ভুলপথে গিয়ে ফিরে এসে ঘুরে' আবার ঠিক পথে যাচ্ছে, কেউ বা এরূপ ভ্রমে পড়ে বারবারই ফিরে আসছে ; তবুও প্রকৃত পথ পাচ্ছে না। আমরা দাঁড়িয়ে দেখে খুবই আনন্দ বোধ কর্‌ছি। এই মুক্ত ময়দানের উৎসব-মঞ্চটীও লতা-পুষ্প এবং রঙ্গিন কাগজে সুসজ্জিত করা হ'য়েছে। যারা এই "চক্রব্যূহ" তৈরী

করেছেন, তারা যে বেশ বুদ্ধিমান সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বাইরে চারদিক ঘুরে ঘুরে পাহাড়ীদের অভিনব বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান-বাজনা চল্‌ছে—ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে, দলে দলে দেবতার নিকট গিয়ে প্রণত হ'য়ে দীপ জেলে ফিরে আস্‌ছে।

আমরা কৌতুহল-চিত্তে একটী দলের সঙ্গে ঐ ধাঁধাঁ ব্যূহচক্রে প্রবেশ করলুম। আমাদের পুণ্যফলে, অথবা দেবতা আমাদের ভুলা'তে পারেন নি ব'লে, ঠিক পথেই ধাঁধাঁয় বা বাঁধায় না পড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রণাম-প্রার্থনার পর ফিরে এলুম। ধারেই একস্থানে উৎসবে অভ্যাগতদের আহারের ব্যবস্থা হ'য়েছে—শুক্‌নো মাছপোড়া, লাল চালের ভাত পাতায় তুলে নিয়ে তারা দিব্যি খাচ্ছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, চক্রব্যূহের চারদিকের শত শত মোমবাতি জোনাকীর মত জ্বলে উঠ্‌লো। দু'চারটী "ফানুস" তৈরী করা হ'য়েছে, এটা উৎসবের একটী প্রধান উপকরণ। গভীর রাতে "ফানুসটীকে" উড়ান হ'বে, হাওয়ার সাথে সাথে "ফানুস" যত উঠবে তত অধিক ধর্ম্ম হবে, অর্থাৎ উর্দ্ধে ভগবানের নিকট সে আলো পৌঁছবে—এই তাদের বিশ্বাস।

সাঁঝের আঁধার অন্তে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো উদ্ভাসিত হ'লো, উৎসব-মঞ্চের ভিতরে ও বাইরে শুক্‌নো বাঁশের তিন-চারটা মশালের উগ্র আলো প্রজ্বলিত হ'য়ে উৎসবক্ষেত্রকে আলোকময় ক'রে দিলো। পাশে বিরাট এক গাছের গুঁড়িতে দিনরাত আগুন জ্বল্‌ছে; কেউ বা তাতে বাঁশের নলে পুরে, তামাকে আগুন জ্বালিয়ে নিচ্ছে—কেউ বা পাতার তৈরী চুরুট ধরাচ্ছে—আবার কারো শীত বোধ হ'লে কাছে গিয়ে উত্তাপে গরম হ'য়ে আস্‌ছে। চারিদিকে উৎসব আনন্দের হল্লা চল্‌ছে। দিন রাত কোন্ দিক্ দিয়ে কেটে যাচ্ছে কারো সেদিকে খেয়াল নেই। কেউ বা নিজেদের তৈরী পাহাড়ী মদ খেয়ে ভরপুর নেশার আনন্দে মশ্‌গুল। আমরা এ সব দেখে' ওখান হ'তে ফিরে প্রথমকার উৎসব-মঞ্চে এলুম। এখন সেই বুদ্ধজীবনী পাঠ শেষ হ'য়েছে। এবার একজন ফুঙ্গি উচ্চাসনে ব'সে ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেন এবং সবাই আগ্রহ সহকারে শুন্‌ছে। আমরা

ব'সে ফুঙ্গির বক্তৃতা কতকটা শুনলুম; দো-ভাষী আমায় দু'চারটি কথা বুঝিয়ে বলছিলো—বেশ ভালই বোধ হ'লো।

আমাদের ফিরে আসবার সময় সর্দ্দার এসে সবিনয়ে বললে, "একবার এদিকে আসুন।" তার সঙ্গে উৎসব-মঞ্চের এক পাশে গিয়ে দেখলুম—একটি বাঁশকে চিরে' গাছের মত তৈরী ক'রে তার ডালপালা বিস্তার ক'রে—তাতে সাদা সূতোর গায়ে গঁদ্ মেখে—চাল জড়িয়ে দিয়ে ঐ বৃক্ষের ডালে বেঁধেছে—দেখতে বড়ই সুন্দর! তার নিম্নে পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়ী মেয়ে পুষ্প-সাজে সজ্জিত হ'য়ে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা গানের সঙ্গে অপূর্ব্ব নৃত্যকলার সমাবেশে দর্শকদের মোহিত করছে। দু'-তিনজন বাদকও তাদের সঙ্গে বাজাচ্ছে; একজন বাঁশীওয়ালার সুমধুর স্বর যেন আজও আমার শ্রবণে রেশ দিচ্ছে। ঘুরে' ফিরে' যতই উৎসব অনুষ্ঠানটি দেখছি, ততই প্রীত ও মুগ্ধ হচ্ছি,—দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে এরা সবটুকু প্রাণ-মন ঢেলে এই উৎসব-আনন্দ করছে। সর্দ্দার আমাদের সঙ্গে অনেকের পরিচয় করিয়ে দিলো। আমরা যে এখন ফিরে চলে যাবো, এতে তাদের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগছে, তাদের ইচ্ছা সারারাত উৎসবানন্দে কাটিয়ে যাই। এবার তারা আমাদের কিছু ফল ও চা খেতে দিল। তাই একটু খেয়ে, সবার নিকট হ'তে বিদায় নিলুম। নতজানু হ'য়ে মেয়ে-পুরুষ তাদের আপন সরল প্রাণের বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলো এবং আমাদের উপস্থিতিতে যে তারা খুবই আনন্দিত হ'য়েছে তা প্রকাশ করলো।

রাত হ'য়েছে, তাই গ্রামের প্রধান তার তিন চার জন বিশ্বস্ত জোয়ানকে আমাদের পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। তাদের সবাই একখানা লম্বা দা হাতে নিয়ে ও একটা ক'রে শুকনো বাঁশের মশাল জেলে রাস্তা আলোকিত ক'রে এগিয়ে চললো। কাটারিখানা হ'লো এদের জীবনের চির-সহচর। আমাদের সঙ্গে একটা টর্চ্চ-লাইট ছিল; দো-ভাষী বললে এ আলোতে বাঘ, হাতী সামনে আসতে ভয় পায়—এ পাহাড়ী পথে আবার এ সবেরও ভয় রয়েছে। ফিরে আসতে রাস্তায় দেখলুম চার-পাঁচটী মেয়ে-পুরুষ মশাল জেলে দূর পাহাড় হ'তে

উৎসব দেখ্‌তে চলেছে। আমাদের সঙ্গীয় পাহাড়ীদের সাথে তাদের আলাপ হ'লো। এবার আমরা অনেকটা সোজা পথে চল্‌ছি। খানিকটা এগিয়ে মশালধারী পাহাড়ীরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে কি যেন বল্‌তে লাগ্‌লো। দো-ভাষী তাদের জিজ্ঞেস ক'রে আমায় বল্‌লে, ওরা বাঘের গন্ধ পেয়েছে, নিকটেই বাঘ রয়েছে! আমাদের বন্দুকধারী এগিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "বাঘ কোথায়?" জবাব না দিয়ে ওরা এগিয়ে চল্‌লো। নিকটেই একটা পাহাড়ী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মশালধারিগণ বল্‌লে, "ঐ দেখ, ছোট একটা বাঘ সাঁত্‌রে নদী পার হ'চ্ছে।" আমরা টর্চ্চের আলো ফেলে দেখ্‌লুম—সত্যিই একটা জানোয়ার। বন্দুকধারীর আর ধৈর্য্য মান্‌ছে না, সে বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে; তাকে অনেক ব'লে ক'য়ে থামানো গেল, বাঘও জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ল। আমাদের কিন্তু সবারই মন বেশ চঞ্চল হয়েছিল। এবার নির্ভীক-চিত্তে সবাই এগিয়ে চলেছি—উঁচু নীচু পথ, নীরব-গম্ভীর পাহাড়ের গায়ে কোন সাড়া শব্দ নেই! এতক্ষণে আমরা সেই মৃতপ্রায় শুষ্ক নদীটার পাড়ে এসে তার ভীষণ ভৈরব রূপ দেখে অবাক্ হ'লুম। প্রবল স্রোতে বড় বড় গাছ পাথর ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এখন আর হেঁটে পার হওয়া সম্ভব নয়। তাই সঙ্গীরা নিকট হ'তে কতকগুলো কাটা বাঁশ জড়ো ক'রে লতা দিয়ে ভেলা তৈরী ক'রে পারে যাবার ব্যবস্থা করলো। এই বাঁশের ভেলায় পার হ'বার সময় মনে হলো, —বাঁশ পাহাড়ীদের কত উপকারী; আর কত ভাবেই যে এর ব্যবহার হয়, দেখে' আজ খুবই আশ্চর্য্য হয়েছি। বাঁশের ঘর, বাঁশপাতার ছাউনী, বাঁশের বেড়া, বাঁশের চাটাই, বাঁশের টুক্‌রী, বাঁশের লাঠি, বাঁশের তীরধনুক, শুক্‌নো বাঁশের দড়ি, বাঁশের বাজনা, বাঁশের বাঁশী, বাঁশের চোঙ্গায় জলপান, ভাতসিদ্ধ ও দই জমান, বাঁশের চেয়ার, বাঁশের খাট, বাঁশের মেঝে, বাঁশের ভেলা, আবার এই বাঁশ বিক্রয় ক'রে পয়সা উপার্জ্জন এবং আরো কত কি। বাঁশের দ্বারাই যেন পাহাড়ীরা সংসারের সকল কাজ সমাধা করে। সমতলবাসিগণ কিন্তু এরূপভাবে বাঁশের ব্যবহার জানে না।

পাহাড়ী নদীর যে এত স্রোত আমার ধারণাও ছিল না—জলও অনেক বেড়েছে। এ পারে এসে সোজা একটা রাস্তা পেয়ে বিশ্বস্ত মশালধারী পাহাড়ীদের বিদায়

দেওয়া হ'লো। তারা সর্দ্দারের কথা অমান্য করতে নারাজ, আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবার জন্য সর্দ্দারের হুকুম ছিল। অনেক বলে' কয়ে বুঝিয়ে ফেরান গেল। তারা ফিরে গেলো, আমরাও আনন্দে পাহাড়ী পাড়া হ'তে উৎসব দেখে' রাত প্রায় দশটায় আলিজং ফিরে এলুম।

তারপর কত বছর চলে' গেছে, এদেশে কত সহরে, কত নগরে ও পল্লীতে বিরাট্ বুদ্ধোৎসব দেখেছি, কিন্তু সেই সরলপ্রাণ পাহাড়ীদের উৎসব-স্মৃতি যেন আজও প্রাণের মাঝে জেগে রয়েছে!

সীতা-পরীক্ষার পাহাড়ে

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে চা খাবার জোগাড় করছি। পৌষ মাসের কুয়াসা তখনও পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অন্তর্হিত হয়নি,—সকাল বেলায় কন্‌কনে শীত।

ছাম্পা আমাদের অনেক পূর্ব্বেই ঘুম থেকে উঠে' সেজে-গুজে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসে' আরাম করছে—তার মুখে অবিরত একটি চুরুট জ্বলছে। সে আমাকে তাদের পাড়ায় নিয়ে যাবার জন্য আজ দু'দিন যাবৎ অপেক্ষা করছে।

এখানে অদূরে ঐ সাগরের বেলাতটে যখনি বেড়াতে গিয়েছি, তখনি অবাক্ হ'য়ে দেখেছি—সুদূরে উত্তর-পূর্ব্বদিকে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট্ উন্নতশীর্ষ পর্ব্বত। বড়ই মনোরম সে দৃশ্য। মনে হ'ত যেন একখণ্ড কালমেঘ সাগর-জলে নিশ্চল হ'য়ে ভেসে' রয়েছে!

এখানকার অধিবাসীরা ঐটিকে 'সীতা-পরীক্ষার পাহাড়' ব'লে নামকরণ করেছে। আমি কিন্তু এ নামের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ক'রে কিছুই বুঝতে

পারিনি। এ মগের মুলুকে সীতা ত' কখনও আসেননি,—রামচন্দ্রও পদার্পণ করেন নি! তবে নামকরণ করেছেন এখানকার কাল্পনিকেরা, এই যা'। যে ভাবে ওর কল্পনা করা হয়েছে, তা' শুন্‌লে সবারই হাসি পায়! তাঁরা বলেন, ঐ পাহাড়টিকে নাকি দূর হ'তে দেখা যায়, ঠিক যেন রাবণ-লাঞ্ছিতা সীতা অন্তঃপ্রচ্ছন্ন মর্ম্মদাহী দুঃখের নির্ব্বাক বেদনায় সাগরকূলে অধোবদনে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাই, এর ঐ নাম। অথচ এদেশবাসী মগ বা মুসলমান কেউ রাম-সীতার খবর বিশেষভাবে জানে না। এখানকার দীর্ঘদিন প্রবাসী হিন্দু ব্যবসায়ীরাই এ নাম আরোপ করেছেন। তা' যা হোক, এখানে আসা অবধি যে ঐ পাহাড়ের দিকে আমার দৃষ্টি ও গোটা মনটা পড়ে রয়েছে—তা'তে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ওখানে কুর্মী, মুরুম্, চাক্‌মা এরূপ দু'তিনটি পাহাড়ী জাতি অনেকদিন ধ'রে বাস কর্‌ছে।

আজ সকালে সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই চা পান শেষ ক'রে গরম জামা-কাপড় পড়ে' একজন সঙ্গী ও দোভাষী সহ ছাম্পার সঙ্গে 'সীতা-পরীক্ষার পাহাড়' দেখ্‌তে চলেছি। ছাম্পা সেই পাহাড়ের 'মুরুং' পাড়ার একজন মোড়ল। বড়ই সরল প্রকৃতির মানুষ সে। সাধারণতঃ পাহাড়ীরা কোনও কুটিলতা বা প্রতারণা কিছুই জানে না। তারা সত্যটাকে বেশ আপনার ক'রে নিয়েছে, তাদের এই সরলতা একটা অপূর্ব্ব সম্পদ।

রাস্তা আমাদের ভুল হ'বার সম্ভাবনা নেই, কারণ ছাম্পাই পথ দেখিয়ে চলেছে। 'আলিকুং' বাজারের পূর্ব দিকের প্রশস্ত রাস্তাটীর উপর দিয়ে চলেছি। ছাম্পা বল্লে, "বাবু, আমাদের পাড়ায় যাবার দু'টী রাস্তা রয়েছে; সমুদ্রের ধার দিয়ে গেলে খুবই সোজা পথ, তবে জোয়ার এলে একটু অসুবিধা হয়; নয়ত মাঠ ও পল্লীর ভিতর দিয়ে ঘুরে' ঘুরে' অনেক সময়ে যাওয়া যায়।" আমি তাকে বল্লুম, "সোজা পথেই চল, ওতে আমাদের কোনই অসুবিধা হ'বে না।" অমনি সে মোড় ঘুরে' সমুদ্রের ধার দিয়ে আমাদের নিয়ে চল্‌ল। আলিকুং বাজার হ'তে প্রায় সাত আট মাইল হেঁটে যেতে হ'বে। আমাদের একজন অশ্বপৃষ্ঠে সবার

আগে আগে যাচ্ছেন। ছাম্পা তার বাঁশের চোঙায় তামাকের পাতা পুরে' আগুন ধরিয়ে, চুরুটের মতন টেনে টেনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। তার শক্ত, বলিষ্ঠ, খর্ব্ব দেহটী একখানা কম্বলে আচ্ছাদিত, কটিবাসে কৌপীন। কোমরে ঝুলান একখানা উন্মুক্ত লম্বা দা। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, খুবই নির্ভীক সে—যদিও বয়স নেহাৎ কম নয়! সে মহানন্দে আমাদের পথ দেখিয়ে, তাদের পাড়ায় নিয়ে চলেছে, আমরা তাকে অনুসরণ করছি। ঘোড়সওয়ার মাঝে মাঝে পিছন ফিরে' দেখ্‌ছেন আমরা কতদূরে।

সম্মুখে ঐ ভোরের তরুণ সূর্য্য তখন তার স্বর্ণাভ কিরণের প্রদীপ্ত সম্পদ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। শীতের জড়তা ধীরে ধীরে কমে' আস্‌ছে। পার্শ্বেই সীমাহীন শান্ত সাগরের অপূর্ব্ব রূপরাশি—প্রভাত-বায়ুর স্নিগ্ধ নিবিড় স্পর্শে তার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, অর্দ্ধস্ফুট সঙ্গীতের প্রাণ-উন্মাদী চাঞ্চল্য। সে সঙ্গীতের ভিতর ছিল মুক্তির উদার আহ্বান, গৃহহারা বিরাগী করবার পাগল করা বাণী! প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য্যের এই অপরূপ স্বপ্নমায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে অমর কবির সেই ছত্রটীই মনের ভিতর গুঞ্জরণ ক'রে উঠ্‌ছিল,—

"ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে,
ওরে বাহির ভেঙ্গে আকাশকে আজ নেবরে লুঠ ক'রে।"

আমরা বেলা-তটের বালুকাময় পথেই এগিয়ে চলেছি,—ভোরের স্নিগ্ধ-বাতাস আমাদের বিপরীত দিক হ'তে কানের পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ রবে ব'য়ে চলেছে। সাগর-বারি ভাঁটার টানে অনেকটা নীচে নেমে এসেছে। সূর্য্যের তাপ এখনও তেমন প্রখর হ'য়ে ওঠেনি, তাই আমাদের চলার পথে বেশ আরামই বোধ হচ্ছিল। খানিকটা পথ এগিয়ে যেতেই অদূরে দেখ্‌তে পেলুম, এ দেশীয় একদল লোক সমুদ্রের জলে কি কাজে যেন ব্যস্ত। নিকটে যেতেই দেখ্‌লুম, ওরা সবাই আমার পরিচিত লোক,—'অলিজং'এর পশ্চিমে 'কাম্বি' পাড়ার চৌদ্দ পনের জন মগ মাছ ধরবার জন্য এখানে এসেছে। তারা আমায় দেখে' অভিবাদন জ্ঞাপন করল।

আমি মাঝে মাঝে এ দেশের পল্লীর বাজারে নানা জাতীয় প্রচুর মাছের আমদানী দেখে' জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি,—মগেরা সমুদ্র হ'তে মাছ ধরে। কি ভাবে এত মাছ এক সঙ্গে ধরা পড়ে, তা' দেখবার জন্যে ইচ্ছাও হয়েছে। তাই এই সুযোগ অবহেলা না ক'রে খানিকক্ষণ দেখে যাবো মনস্থ ক'রে দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কত সময় দেরী হ'বে?" সে বল্লে, "বিশেষ নয়, আধঘণ্টা হ'বে, কারণ অনেকটা ওরা ঘিরে' ফেলেছে, এখন শুধু টেনে তুলবে।" দোভাষী ছাম্পাকে বল্লে, "একটু দাঁড়াও, এ মাছ-ধরাটা দেখে যাবো।" আমাদের ঘোড়সওয়ার পূর্ব্ব হ'তেই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলেন। ছাম্পা ইতিমধ্যে তার নির্ব্বাপিত তামাকের নলটার মুখে আগুন ধরিয়ে আবার নূতন ক'রে ধোঁয়া ছাড়ছে,—আমরা সবাই দাঁড়িয়ে মাছ-ধরা দেখ্‌ছি। ভোরের শীতকে অগ্রাহ্য ক'রে, অনাবৃত-শরীর জোয়ান জোয়ান দশ বারজন মগ দু'খানা লম্বা নৌকো নিয়ে নির্ভীকভাবে সমুদ্রের মাঝে অর্থাৎ তীর হ'তে ৩০।৪০ হাত দূরে গিয়ে নৌকা হ'তে দু'দিকে জালটা ফেলে চলেছে; একখানা নৌকা সাম্‌নে অপরখানা পিছু এগিয়ে চলেছে। জাল কিন্তু একখানাই, দৈর্ঘ্যে প্রায় একশো হাত, আর প্রস্থে পনর কুড়ি হাত হ'বে। দু'টী নৌকাতেই জালখানা লম্বালম্বি ভাবে সাজান থাকে। ঐরূপ ভাবে অনেকটা জায়গা জাল দিয়ে ঘিরে' উভয়দিকের শেষরজ্জু দু'টী নিয়ে নৌকো দু'খানা দু'দিকে তীরে এসে পৌছতেই, নৌকা হ'তে জালের রজ্জু দুইটী নিয়ে, দু'দিকের লোক নেমে গেল, এবং সাগর-সৈকতে যারা অপেক্ষা করছিল তারাও এসে' এদের সঙ্গে একযোগে উভয়দিকের জাল টানতে সুরু করলে। নৌকো দু'খানা এদের নামিয়ে দিয়ে কয়েকজন লোক নিয়ে জালের মাঝের দিকে গিয়ে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত হ'ল,—যা'তে মাছ না পালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে নৌকোর লোক কয়জন জালের উপরের রজ্জু ধরে' উঁচু ক'রে রাখ্‌ছে। এ ভাবে ধীরে ধীরে দু'দিক হ'তেই খুব সতর্কতার সঙ্গে জাল টেনে পাড়ে গুটিয়ে আন্‌ছে। মাছগুলো যেমনি তাদের বিপদ বুঝতে পারছে, অমনি কোনটী জাল ছিঁড়ে, কোনটী

লাফিয়ে—যে কোনও উপায়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কোনটি আবার দূরে হ'তে লাফ দিতে গিয়ে জালের আবেষ্টনীর ভিতরই পড়ছে। জালটী যতই পাড়ের নিকট আস্‌ছে, মাছগুলো ততই যেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছগুলির পালাবার অদ্ভুত উপায় দেখে' তাদের ঝম্প-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে হাততালি দিয়ে সহানুভূতি জানাচ্ছিলুম। এ সময়ে জেলেরাও অতি সাবধানে এবং দ্রুত জাল গুটিয়ে পাড়ে তুল্‌ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লুম—কতকগুলো মাছ দিক্‌ভুলে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে লাফ দিতে গিয়ে ডাঙায় এসে' পড়েছে। এবার জালটী সম্পূর্ণ পাড়ে তুলে নিয়েছে। নানাজাতীয় মাছ—প্রায় পাঁচ-সাত শত ধরা পড়েছে। ইলিশ মাছের সংখ্যাই অধিক। তারপর সমুদ্রের নানারূপ মাছ, কোনটী গোল, কোনটী চৌকো, কোনটী লম্বা। তার আবার রংও লাল, নীল, কালো—কতই রকম যা' কখনো দেখিনি! এক সঙ্গে এত মাছ-ধরা জীবনে এই প্রথম দেখে' আশ্চর্য্য বোধ হ'ল।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে মাছ-ধরা দেখা শেষ হ'ল। এই কার্ত্তিক মাসে মগেরা দল বেঁধে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে বে'র হয়। সাগর-জলে মাছের ঝাঁক দেখ্‌লে এরা বুঝতে পারে এবং তখনি জাল দিয়ে ঘিরে' ফেলে। আর কেউ বা নৌকো নিয়ে মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে শক্ত ডুরিতে বাঁধা অসংখ্য বঁড়শীতে টোপ গেঁথে যথেষ্ট মাছ ধরে। সবাইকেই সরকারকে টাকা দিয়ে প্রতিবৎসর মাছ ধরবার পাশ নিতে হয়। কার্ত্তিক হ'তে চৈত্র পর্য্যন্তই মাছ ধরবার উপযুক্ত সময়। এ সময়ে সাগর বেশ শান্ত ও স্থির থাকে। অবশ্য মগ জাতি জলে স্থলে সর্ব্বত্রই নির্ভীকতার পরিচয় সর্ব্বদাই দেয়।

ছাম্পা এত সময় ব'সে ব'সে তার চুরুট ধ্বংস করছিল আর আমাদের দেখ্‌ছিল। এবার আমরা সবাই মিলে পুনরায় রওনা হ'লুম। বেলাও অনেকটা হয়েছে। চলার পথে কিছুক্ষণ শুধু মাছের গল্পই হ'ল, কোন্ মাছটা কি ভাবে পালিয়ে গেল বা আট্‌কা পড়ল—এই সব। ক্রমেই সূর্য্যের তাপ বেশ প্রখর বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সম্মুখেই একটি পাহাড়ী নদী সাগরের সঙ্গে

মিশেছে। এখানে জলস্রোত তেমন নেই। নিম্নে স্বচ্ছ বালুকারাশি বেশ ঝক্ ঝক্ করছে। আমরা হাঁটু-জল হেঁটেই পার হ'লুম। ঘোড়সওয়ার অশ্বপৃষ্ঠেই নদী পার হ'লেন।

আমরা অনেকটা পথ এসেছি, এবার সমুদ্রের জল যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, আর ঢেউগুলো কাতারে কাতারে সোঁ সোঁ রবে বেলাতটের উপর আছ্ড়ে পড়ছে। আমরা যে পথে চলেছি, সে পথটি ঢেউএর পর ঢেউ এসে অতি অল্প সময়েই ভাসিয়ে দিয়ে গেল। আমরা তিন চার হাত উপরে উঠে চল্লুম; তাতেও কিন্তু সমুদ্রের লবণাম্বু এসে পাদস্পর্শ করল! ছাম্পা পূর্ব্বেই বলেছিল, —জলবৃদ্ধি হ'লে চলার পথে অসুবিধা হ'বে, তাই সে এবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আমরা তাকে এই ব'লে আশ্বস্ত ক'রলুম যে, এতে আমরা অসুবিধার চেয়ে আনন্দই বেশী উপভোগ করছি। ছোটবেলা হ'তে শুনে আসছি, সাগরে জোয়ার ভাটা হয় না। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ক'রে সে ভুল চিরতরে দূর হ'ল। প্রভাতে যে সাগরকে অত শান্ত সৌন্দর্য্যময়, চঞ্চলতাবিহীন দেখেছিলুম, এখন যেন সে বৈচিত্র্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার বদলে, যে রুদ্রমূর্ত্তির কল্পনা, অসীমের যে ভয়াবহ বিকাশ মনে ভেবেছি, তাই প্রত্যক্ষ দেখ্লুম। অবাক্ হ'য়ে তার ভীম-ভৈরব রূপটি দেখ্তে দেখ্তে এগিয়ে চলেছি। ছাম্পা বল্লে, "দরিয়ায় দিনরাত আরো অধিক গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন হয়; ঐ না দেখ্ছেন, ও ত' তেমন কিছুই নয়, খানিক বাদেই থেমে যাবে! জোয়ারের সময় জল বাড়ছে, তাই ঐরূপ; আবার ভাটার টানে জলও কমে যাবে, সব ঠাণ্ডাও হ'য়ে যাবে।" সাগর-জল কিন্তু জোয়ার-ভাটায় একদিকেই প্রবাহিত হয়—গতির কখনও পরিবর্ত্তন হয় না।

আমাদের পথচলা ঠিক ভাবেই চল্ছে। সমুদ্রের তীর হ'তে কতকগুলো লাল নীল শামুক কুড়িয়ে নেওয়া গেল। দোভাষী সাগরের মাঝখানে একটী বড় রকমের দ্বীপ দেখিয়ে বল্লে,—ঐটীর নাম 'নারিকেল জিঞ্জিরা।' ঐ দ্বীপে অনেক নারিকেল গাছ রয়েছে, তাই ও নাম। ওখানে অনেক লোকের বাস।

চট্টোগ্রাম হ'তে সমুদ্রপথে আসতে ঐ দ্বীপটী দেখা যায়। আমরা দ্বীপের বনানীর শ্যামল শোভার কতকাংশ কালো রেখার মত সারি সারি দেখ্‌তে পেলুম।

অদূরেই আমাদের গন্তব্যস্থান—'সীতা-পরীক্ষার পাহাড়'। ঘোড়সওয়ার এত সময়ে পাহাড়ের পাশে গিয়ে পৌঁছেছেন। পাহাড়টী সাগরের পাড় হ'তে আরম্ভ ক'রে সাগরের মধ্যেও অনেকটা জায়গা বিস্তৃত ক'রে—কে জানে কত কাল হ'তে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন দূর হ'তে পাহাড়টীকে সাগরের মধ্যেই আছে মনে হ'ত, আজ দেখ্‌ছি পাড়ের সঙ্গে সম্পর্কও কিছু রেখেছে। এবার আমরা গিয়ে পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হ'তেই—আমাদের ছাম্পা, মুরু পাড়ার মোড়লকে মহানন্দে তার নিজের ভাষায় কি যেন ব'লে উঠ্‌ল; অমনি দেখ্‌তে পেলুম, দশ বারজন মেয়ে-পুরুষ, তারস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে ছুটে' আস্‌ছে। জোয়ান জোয়ান পুরুষদের হাতে উন্মুক্ত লম্বা দা, কটিতে কৌপীন, আর মুখে জ্বলন্ত চুরুট। মেয়েদের কোমরে ও বক্ষে কাপড় জড়ানো, মুখে চুরুট ও হাতে দা রয়েছে। বুঝতে আর অসুবিধা হ'ল না যে, আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যই এরা এগিয়ে আস্‌ছে। সর্দ্দার পূর্ব্ব হ'তেই তাদের খবর পাঠিয়েছিল।

এবার সমুদ্র-পাড় ছেড়ে পাহাড়ী পথের উপর যেতেই পথের মাঝখানে পাহাড়ীদের সঙ্গে মুখোমুখী সাক্ষাৎ হ'ল। যা'রা আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য আস্‌ছে, তারা সবাই রাস্তা ছেড়ে সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ছাম্পা পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে, আমরা তার পিছু পিছু চলেছি। ঘোড়সওয়ার ঘোড়াটী নিয়ে হেঁটেই চলেছে, আর পাহাড়ীরা সঙ্গে আস্‌ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পাহাড়ের উপরে 'মুরুং' পাড়ায় এসে উপস্থিত হ'লুম। এ পাড়ার সর্দ্দার আমাদের ছাম্পা। দোভাষীকে পাহাড়ীরা একটা ঘর দেখিয়ে ব'ল্লে, 'ওখানে চলুন, ও ঘরই আপনাদের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।' দোভাষী আমাদের নিয়ে একটা আস্ত গাছের সিঁড়ি বেয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটী চার পাঁচ হাত উঁচু। বাঁশের মাচার উপর বাঁশ ও পাতা দিয়ে তৈরী। মাঝখানে

কয়েকটা বাঁশের চাটাই পেতে তার উপরে কয়েকখানা কম্বল পেতে রেখেছে। আমরা সেখানে ব'সে বিশ্রাম ও আরাম করতে লাগ্‌লুম। ছাম্পার আদেশে একটী বালক ঘোড়াটীকে চরাতে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে একজন 'মুরুং' একখানা কাঠের পাত্রে পান, সুপারী, চূণ ও চুরুট আমাদের সম্মুখে রাখল। এটী পাহাড়ীদের অভ্যর্থনার রীতি। এবার দলে দলে পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো এসে বিনীতভাবে নতজানু হ'য়ে, তাদের সরল প্রাণের অভিবাদন জ্ঞাপন করতে লাগ্‌ল। আমাদের মত অতিথি পেয়ে তাদের বড়ই আনন্দ হয়েছে। দোভাষীর সাহায্যে তাদের সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল। ইতিমধ্যে ছাম্পা আমাদের আহারের জন্য প্রথম কতকগুলী শশা, কলা, ফুট—সবই তাদের পাহাড়ে উৎপন্ন—এবং একখানা দা এনে নিকটে রাখ্‌ল। আমি একটী পাহাড়ীকে ব'লে তাদের কায়দায় কাটিয়ে উপস্থিত সকলকে দু'এক টুক্‌রো ক'রে দিয়ে, পরে আমরা সকলে গ্রহণ করলুম। পাহাড়ীরা প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করছিল, কিন্তু আমাদের ব্যবহারে তাদের ও-ভাব দূর হ'ল। বিশ্রাম-আলাপের পর তাদের সঙ্গে বস্তিগুলো দেখ্‌তে বে'র হ'লুম। এই 'মুরুং' পাড়ায় দশ পনরখানা ঘর একই ভাবে বাঁশ ও পাতার দ্বারা চার পাঁচ হাত উঁচু ক'রে মাচার উপর কুঠুরীর মত তৈরী। গৃহস্থালীর বিশেষ কোনও আড়ম্বর নেই। দু'তিনটী জলের কলসী, তাও আবার পাকা লাউয়ের গোটা খোলা দ্বারা তৈরী, আর দু'চারখানা বাসন। মাটীর হাঁড়িতে রান্না হয়, অথবা বাঁশের চোঙায় চাল সিদ্ধ ক'রে নেওয়া হয়। মাংস বা মাছ পুড়িয়েই তৃপ্তির সহিত এরা আহার করে। সরু বাঁশের নলে তামাক পাতা পুরে' আগুন ধরিয়ে মেয়ে-পুরুষ সবাই প্রায় সব সময় মনেরই আনন্দে ধোঁয়া টানে। পান বা কাঁচা সুপারী এদের বড়ই প্রিয়; তার সাথে এক টুক্‌রো পচা তামাকপাতা এরা বড়ই উপাদেয় মনে করে। তামাক ভিজিয়ে তৈরী এ পদার্থটী এদেশে যথেষ্ট বিক্রী হয়। জীবন-মরণের চির-সহচর একখানা লম্বা দা সর্ব্বদাই হাতে রয়েছে। ঐ দিয়ে সুপারীকে দু'ভাগ ক'রে পানের সঙ্গে মুখে পুরে' মেয়ে-পুরুষ উভয়েই চিবোয়। দা-খানাই হ'ল এদের জীবনের

প্রধান সম্বল। গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ হ'তে কৃষিকার্য্য পর্য্যন্ত ঐ দায়ের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। কৃষির উৎপন্ন ফসল ও বাঁশ গাছ কেটে' নীচের পল্লীর বাজারে বিক্রী ক'রে এদের জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রতে হয়। অন্ধ আলোর পরিবর্ত্তে বাঁশের মশাল জ্বালিয়ে একপাড়া হ'তে অন্য পাড়ায় যায়। এই আলোতে হিংস্র জন্তুও ভয় পায়। শীতের সময় সব বাড়ীতেই একটা বড় গাছের গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে রাখে, দরকার হ'লেই তার পাশে ব'সে আরাম করে। এদের দেহ বেশ সুস্থ, সবল এবং সুপুষ্ট, তবে লম্বা তত নয়। উন্মুক্ত দেহে নানা রঙে বিচিত্র উল্কি দেওয়া, পুরুষদের কটিতে লম্বা কৌপীন, মেয়েদের কোমরে ও বক্ষে আধ হাত বস্ত্রখণ্ড জড়ান, এতে কিন্তু লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। মাথার চুলগুলি রুক্ষ,—তবে মেয়েদের সৌন্দর্য্য-বোধ বেশ র'য়েছে। ঝরণায় মেয়ে-পুরুষ উলঙ্গ হ'য়ে স্নান করে, সন্ধ্যায় বা সকালে মেয়েরা নানা জাতীয় ফুল তুলে' মাথার চুলে জড়িয়ে, সেজেগুজে বেড়াতে বে'র হয়। কানের নিম্ন দিক বিদ্ধ ক'রে, বাঁশের, কাঠের, পাথরের অথবা অবস্থানুযায়ী রূপোর নল পুরে' রাখে—দেখ্‌লে মনে হয় যেন কানটা ছিঁড়ে যাবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ী জাতি-মাত্রই কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। সবার ঘরেই হাতে বোনবার একখানা তাঁত রয়েছে; ওতেই নিজেদের কাপড় তৈরী ক'রে নেয়,—তূলাও নিজেদেরই চাষের। ধর্ম্ম হিসাবে এই পাহাড়ী লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। এদের কেউ নূতন ক'রে এ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেনি—সমতলবাসী মগদের দেখে' এরাও বুদ্ধদেবের উৎসব উপলক্ষে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করে। অপর দু'একটী পাড়ায় বিহার ও দেবালয় স্থাপিত হয়েছে। এরা ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য গ্রহণ করেনি বটে, তবে সরল প্রাণে ভগবান বুদ্ধদেবকে 'ফড়া' বলে প্রণাম করে এবং সন্ন্যাসীদের 'ঠাগু' ব'লে পায়ে লুটিয়ে গড় করে। বছরে দু'তিন বার নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীবুদ্ধের মূর্ত্তি সাজিয়ে নিজেদের পাড়ার 'ফুঙ্গি'কে আহ্বান ক'রে দু'চার দিন পূজা, প্রার্থনা ও উৎসব নির্ব্বাহ করে। প্রত্যহ 'ফড়া'কে স্মরণ করে এবং সুযোগ পেলেই নিকটে যে পল্লীতে বিহার ও দেবালয় রয়েছে, সেখানে প্রার্থনা

করতে যায়। এদের আহার-বিহার সভ্যতার দৃষ্টিতে যতই খারাপ হোক, এরা যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তা' কিন্তু ভুল নয়; তবে এরা নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম্মাচরণ ক'রে থাকে।

এগিয়ে পার্শ্বের 'কুর্মি' ও 'চামুয়া' পাড়াটী দেখ্‌লুম। মুরুংদের সহিত এদের ভাষার বেশ একটু পার্থক্য রয়েছে। ঘরবাড়ী, গৃহস্থালী, আহার-বিহার সবই প্রায় একই রকম। চামুয়া ও কুর্মিরা এসে আমাদের অভিবাদন জানা'ল। ধারেই পাড়ার গায়ে এদের কৃষিক্ষেত্রে নানাজাতীয় ফসলের গাছ, তুলা, কলা, গম, ধান, সরিষা, তিল, কুমড়া বেশ জন্মেছে। পাহাড়ের জঙ্গলা সাফ ক'রে এরা এক সঙ্গে সকল ফসলের বীজ পুঁতে দেয়, এতেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

নিচুতে পাহাড়ের পাদদেশ চুম্বন ক'রে ফেনিল উর্ম্মিমালা দিবানিশি উদাস রবে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে। আমরা এই আড়ম্বরহীন সরলপ্রাণ, নির্ভীক পাহাড়ীদের পল্লী-জীবন দেখে' খুবই মুগ্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট 'মুরুং' পাড়ায় ফিরে এলুম।

বেলা অনেক হ'ল; দোভাষী ও ছাম্পা আমাদের আহারের জন্য ঘরের পার্শ্বে রান্নায় ব্যস্ত হ'ল। পাহাড়ীরা আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছে না—তারা যে আমাদের জন্য কি করবে তাই নিয়ে ব্যস্ত। যাতে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি তাদের সুপ্রখর। সবাই ব'সে তামাক ও পান সাবাড় কর্‌ছে। এবার আমরা সাগরে স্নান সমাপন ক'রে এলুম। আমার সঙ্গী ঘোড়সওয়ার কিন্তু খুবই সাহসে নির্ভর করে' উত্তাল ঢেউএর মাঝে হাবুডুবু খেয়ে খানিকটা সাঁত্‌রে এলেন। পাহাড়ী ছেলেরা দেখে হাস্‌ছিল। দেড়ঘণ্টার ভিতর রান্না শেষ হ'য়ে গেল। দোভাষীও স্নান ক'রে এল। ছাম্পা তাদের ভাষায় সবাইকে এখন যেতে বল্লে, কারণ এখন আমরা আহার কর্‌ব। পাহাড়ীরা নীচে নেমে গেল। এরা সর্দ্দারের কথা কখনও অবহেলা করে না, এমন কি, তাঁর আদেশে নির্ভয়ে জীবন দিতেও অগ্রসর হয়।

কলা পাতায় পাহাড়ী চালের ভাত এবং শাকসব্জীর এক তরকারী খেতে বেশ তৃপ্তিবোধ হ'ল। সমতলের মগপাড়া হ'তে ছাম্পা মহিষের দুধ এনেছিল। তাই

দিয়ে চিনি সংযোগে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করা গেল। ছাম্পাও আমাদের অনুরোধে পার্শ্বে বসে' আহার করল। পানীয় জল একটু নোনা। সমুদ্রের নিকটে ব'লে এরা কূপ খনন ক'রে পানীয় জল ব্যবহার করে। এ জলের স্বাদ ঐরূপই হয়। ঘরের পিছুতে হাতমুখ ধুয়ে এলুম। পিছনেই ঐরূপ ব্যবস্থা রয়েছে—কারণ রাতে এরা বাহিরে বড় একটা আসে না; ঘরের সিঁড়িখানাও তুলে রাখে।

আমাদের আহার শেষ হ'তেই পাহাড়ী মেয়েপুরুষ দলে দলে এসে ঘর ভ'রে ফেল্‌ল। তারা আজ বিশ্রাম আহার ত্যাগ করেছে—শুধু তাদের নূতন অতিথিদের পার্শ্বে ব'সে থেকে সেই অপূর্ব্ব দেশের কথা শুন্‌তে। অবশ্য এদের বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। পাহাড়ে বাস করে, নিম্নের পল্লীর বাজারে গিয়ে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করে, দরকারী যা' কিনে নিয়ে আসে—এ-ই এদের বারোমাস চল্‌ছে। পল্লীর লোক বাজারের দোকানীদের ছাড়া দুনিয়ার কোনও খবরই রাখেনা—একেবারে অনভিজ্ঞ এরা; তবে পাহাড়ী অঞ্চলে এরাই অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ। গল্পে গল্পে প্রায় তিনটা বেজে গেল—এবার ফেরবার সময়। তারা আজ আমাদের কিছুতেই আস্‌তে দেবে না—জানু পেতে সাম্‌নে সব মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে ব'সে রইল। তাদের সরল প্রাণের আকুল অনুরোধে আমাকেও চঞ্চল ক'রে দিল। আমি যেন তাদের কত আপনার জন। তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করবার মত ক্ষমতা আমাদের রইল না, তাই বাধ্য হ'য়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হ'ল; এতে সবাই বেজায় খুসী!

নিম্নে সমতলে একটা বর্দ্ধিষ্ণু মগপাড়ায় আগামী কাল একটা ধর্ম্মোৎসব হ'বে। তারা আমাদের এখানে আসার খবর পেয়েছে—তাই সেই পাড়ার মোড়ল তার দু'চার জন লোক সঙ্গে ক'রে এসে, নতজানু হ'য়ে তাদের প্রথা অনুযায়ী অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে তাদের পল্লীতে যাবার জন্য অনুরোধ করল। আমরা তো শুনেই অবাক্! পাহাড়ীদের সঙ্গে এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হ'ল। মগরা আজই আমাদের নিয়ে যেতে চায়, পাহাড়ীরা বিদায় দিতে মোটেই রাজী নয়। অনেক বিতর্কের পর এই স্থির হ'ল—কাল প্রত্যুষেই সীতা-পরীক্ষার পাহাড় হ'তে

সদলবলে মগপাড়ায় যা'বে। এখানকার পাহাড়ীদেরও কাল যাবার অনুরোধ জানিয়ে মগ-মোড়ল আমাদের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল। অবশিষ্ট দিন ও সমগ্র রাতটী সরলপ্রাণ পাহাড়ীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় বেশ আমোদেই কে'টে গেল। রাত্রিতেও পূর্ব্ববৎ আহারের ব্যবস্থা ছিল। শীতের জন্য ঘরের পাশে অগ্নিকুণ্ড তৈরী হ'ল। গভীর রাতে দারুণ শীতে দু'এক বার উঠে, পার্শ্বে ব'সে শীত নিবারণ করতে হয়েছিল, আর বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি।

পরদিন সকালে প্রায় আটটায় দলে দলে পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ এসে' মাথা নত ক'রে তাদের অতিথিকে বিদায় অভিবদান জানিয়ে গেল। ছাম্পা ও তার স্ত্রী আমাদের বিদায় দিতে গিয়ে অশ্রুজলে প্রাণের ব্যথা জানাতে লাগ্‌ল, একদিনেই এতটা আপনার ভাব! আমরা এই অসভ্য অর্দ্ধ-উলঙ্গ পাহাড়ীদের অমায়িক শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় বড়ই প্রীত ও মুগ্ধ হ'লুম। জগতে এরাই হ'ল সরলতার সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিগ্রহ; অবশ্য সভ্যজগৎ বুদ্ধির বাহাদুরী দেখিয়ে বলবে—এরা মূর্খ!

প্রায় বিশত্রিশ জন মেয়ে-পুরুষ সেজে-গুজে আমাদের সঙ্গে রওনা হ'ল। পুরুষদের হাতে একখানা দা, মেয়েদের মাথায় ফুল গোঁজা। সবাই চুরুট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। আমাদের জন্য যথেষ্ট ফলফুল উপহার এনেছিল। সবই প্রত্যাখান ক'রে দু'একটী হাতে নিয়ে এবার আমরাই এদের মোড়ল হ'য়ে এগিয়ে চলেছি। ছাম্পা সঙ্গেই রয়েছে—ঘোড়াটীকে একটী পাহাড়ী বালক হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় যারা রইল তারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের চলার পথে তাকিয়ে দেখ্‌ল; আমাদের বিদায়ে তারা বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছে। আমরাও দু' একবার ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লুম।

পল্লীপথে প্রায় দুই ঘণ্টা হেঁটে সমতলে সেই মগ-পল্লীটীর নিকটে এলুম—অদূরেই তাদের দেবালয় ও বৌদ্ধ বিহার। সবাই আমাদের আশাপথ চেয়ে রয়েছে। পাড়ায় উপস্থিত হ'তেই সর্দ্দার তার দলবল সহ এসে' প্রণত হ'য়ে আদর-আপ্যায়ন ক'রে আমাদের নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। পাহাড়ী

অতিথিদেরও যথেষ্ট আদর যত্ন করল। পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে দয়াল বুদ্ধদেবের সম্মুখে যুক্তকরে প্রণত হ'লুম। পাহাড়ীরাও সব ফুলফল নিয়ে এসেছে, দেবতার সম্মুখে সে সব উপহার রেখে' ভক্তিনত-চিত্তে সবাই প্রণত হ'ল। আমাদের দোভাষীর সঙ্গে একজন প্রধান বৌদ্ধভিক্ষুর আলাপ হ'ল। তিনি বল্লেন, "আজ একটী ছেলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে,—তাই এই উৎসব আয়োজন।"

সর্দ্দার আমাদের নিয়ে পল্লীর মাঝে গেল। পল্লীটি আজ উৎসব-আনন্দে মুখরিত। ছেলেমেয়ে সবাই আনন্দে মেতেছে। গ্রামবাসীরা আমাদের পানে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। পাহাড়ীরাও এখানে সেখানে ব'সে গল্পগুজবে মেতে' গেছে। এদের সঙ্গে পূর্ব্ব হ'তেই এ পাড়ার লোকদের পরিচয় ছিল। ছাম্পা কিন্তু আমাদের সঙ্গেই ঘুর্‌ছে। ঘোড়াটী মাঠে চ'রে বেড়াচ্ছে। এই মগদের সঙ্গে পাহাড়ীদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদের কোনও সাদৃশ্য নেই। এদের কাঠের বাড়ী, ঘরদোর বেশ সাজানো গুছানো, যথেষ্ট পয়সা ব্যয়ে তৈরী। সবারই জমি, হাল, গরু-মহিষ রয়েছে, সব ঘরেই কাপড় তৈরীর তাঁতও আছে। মেয়ে-পুরুষদের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ পরিপাটী সকলে সূতার বা রেশমের লুঙ্গি ও জামা ব্যবহার করে। মেয়েদের চুলের পরিপাট্য যথেষ্ট। গহনার দিকে এদের বিশেষ নজর নেই। চুরুট এদের সবারই প্রিয়। মাছ, মাংস আহারে এরাও তৃপ্তিবোধ করে। পথে চল্‌তে এরা লম্বা একখানা দা ব্যবহার করে। ভিক্ষু ও দেবতার প্রতি এদের শ্রদ্ধা অসীম।

প্রতি গ্রামে বিহার তৈরী ক'রে 'ফুঙ্গি' বা ভিক্ষুদের ভরণ পোষণ করা গৃহীদের প্রধান কর্ত্তব্য; এরাও তার ত্রুটী করে না। ছেলেমেয়েরা বিহারে নিয়মিতভাবে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করে।

আজ এই বিশেষ দিনে সবাই সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। সর্দ্দার সমাদরে আমাদের আসনে বসিয়ে মিষ্টালাপে তৃপ্ত কর্‌তে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে যার ছেলেটী ভিক্ষু হ'বে—সে-ই আমাদের জন্য চা তৈরী ক'রে এনে আপন

কৃতজ্ঞতা জানাল।—আমরা চা পান করলুম। বেলা দশটা বেজে' গেল—এখনই ছেলেটির সন্ন্যাস হ'বে। গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদীর মাঝে দু'তিনখানা নৌকো এক সঙ্গে বেঁধে ওপরে কাঠ দিয়ে ভেলার মত ক'রে তার ওপর বাঁশ ও পত্র-পুষ্প দিয়ে একটী মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। এদেশে প্রবাদ, করদ ভূমিতে পবিত্র সন্ন্যাস হ'তে পারে না তাই জলের ওপর ঐরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে—জল নিষ্কর ব'লে এদের ধারণা। এবার প্রধান ভিক্ষু ছেলেটিকে নিয়ে নদীর তীরে রওনা হ'লেন। মুণ্ডিত-মস্তক কাষায়-বস্ত্র পরিহিত সতেরো-আঠারো বছরের বালকটি ধীর গভীরভাবে আচার্য্যের অনুসরণ ক'রে চলেছে। পিছনে গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে গান বাজনা নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে মহানন্দে নদীতীরে উপস্থিত হ'ল। নদীমধ্যে ঐ মঞ্চে ছয়সাত জন ভিক্ষু ছেলেটিকে নিয়ে প্রবেশ ক'রে আসন গ্রহণ করলেন। প্রধান ভিক্ষু আচার্য্যরূপে পালিগ্রন্থ হ'তে পবিত্র ভিক্ষু-জীবনে প্রবেশ লাভের প্রতিজ্ঞা-মন্ত্রগুলি পাঠ আরম্ভ করলেন। ছেলেটিও সম্মুখের আসনে ব'সে শ্রদ্ধা সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

নদীতীরে জনতার আনন্দ-কোলাহল গান-বাজনা চল্‌ছে। ছেলেটী পবিত্র ভিক্ষুমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল, আচার্য্য একটি ভিক্ষাপাত্র ও একখানা পাখা তার হাতে দিলেন। ভিক্ষুগণ সকলেই তাকে নিয়ে এই আনন্দ-মুখরিত জনতার মাঝ দিয়ে বিহারে ফিরে এলেন। ভিক্ষু হওয়াটা এদের জীবনে মহাপবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ভিক্ষুগণ নব-দীক্ষিত ভিক্ষুটীকে সঙ্গে ক'রে ঐ গ্রামে ভিক্ষায় বে'র হ'লেন। ভিক্ষুদের সম্মানার্থে পল্লীপথ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়েছে। ভিক্ষুগণ পর পর শ্রেণীবদ্ধভাবে সেই গ্রামে প্রবেশ কর্‌তেই গৃহিণীগণ একপাশ হ'তে নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন দ্বারা তাদের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন। নব-দীক্ষিত ভিক্ষুর পিতা অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে প্রত্যেক ভিক্ষুকে একজোড়া নূতন কাষায়-বস্ত্র বা চিবর দান করে পুণ্যার্জ্জন কর্‌ল। ছেলেকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে দিয়ে আজ তাদের স্বামী-স্ত্রীর যে কত আনন্দ—তারা যে আজ মহা সৌভাগ্যবান ও ধার্ম্মিক—সেই গৌরব-গর্ব্বে আনন্দ আর তাদের প্রাণে ধর্‌ছে না!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানগুলি দেখ্‌ছি। ভিক্ষুদের প্রতি এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দে'খে খুব আশ্চর্য্য বোধ হ'ল এবং মনে হ'তে লাগল, যে দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের কথা! ভিক্ষুগণ ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে বিহারে ফিরে গেলেন। এবার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হ'তে আগত লোকদের আহারের ব্যবস্থা হ'ল, পাহাড়ীরা মহানন্দে আহার সমাপন কর্‌ল। আমাদের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট ঘরে নানাপ্রকার আহার্য্য নিয়ে এল, আমরা তৃপ্তির সহিত গ্রহণ কর্‌লুম। অবশ্য সব জিনিষ খেতে পারিনি। আমাদের এতটা উদারতা দে'খে সবাই অবাক্ হ'ল; কারণ তাদের সন্দেহ ছিল—তাদের দেওয়া আহার আমরা গ্রহণ করব কি না! সর্দ্দার কাছে ব'সে খুবই যত্ন করতে লাগল। আহারান্তে দেবায়তনের সম্মুখে গিয়ে কতক সময় ব'সে এদের গান বাজনা ও নৃত্য উপভোগ করলুম। পাহাড়ীরাও উৎসবে খুব মেতেছে—সবার মুখে পান চুরুট চল্‌ছে। চারিদিক উৎসব-মুখরিত। বহুলোক বিভিন্ন জায়গা হ'তে এসেছে।

বিশ্রামান্তে বেলা আন্দাজ চারটায় আমরা গ্রাম্য পথে ফিরে রওনা হ'লুম। পাহাড়ীরা ও মগরা এসে ব্যথিত হৃদয়ে আমাদের বিদায় দিল। বিদায়ের ক্ষণ চিরদিন করুণ রসে সিক্ত হয়। আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। ঘুরে' ফিরে' দু'তিনটি মগ-পল্লীর পাশ দিয়ে ছায়া-শীতল পল্লীপথে বেশ আরামে গল্প ক'রে চলেছি। সঙ্গী ঘোড়সওয়ার এবার অশ্বপৃষ্ঠে দৌড়ে ছুটেছেন। আমরা ধীরে ধীরে প্রায় সন্ধ্যায় এসে আলিজং-এ উপস্থিত হ'লুম। অমনি পূর্ণিমার চাঁদও সাঁঝের আঁধার ভেদ ক'রে তার স্নিগ্ধ-নির্ম্মল-রূপালী আলোকে বিশ্বভুবন দীপ্ত ক'রে আকাশের পট-প্রান্তে দেখা দিল। সেদিনটী অতীতের মাঝে নিবিড় হ'য়ে মিশে আছে। কিন্তু তার শুভ্র স্মৃতি আজও অন্তরের গোপন মণি-মঞ্জুষাকে প্রদীপ্ত ক'রে রেখেছে আপনার অম্লান জ্যোতির মহিমায়।

ক'মাস বাদেই আলিজং হ'তে আকিয়াব ফিরে' এলুম। কিছুদিন পরেই আবার আকিয়াব হ'তে ভিন্ন পথে "চক্‌টো" টাউনীসপের দিকে চল্‌লুম। ওখানে পৌছতেও নদীপথে ঘুরে' ঘুরে' প্রায় দশ ঘণ্টা সময় লাগ্‌ল।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে
আশ্রমবাসী দুইটি বালকও যাইতেছে।

আরাকানের পুরাতন রাজধানী মেহং

আরাকানে এসে অবধি এখানকার পুরাতন রাজধানী মেহং দেখ্‌বার ইচ্ছা হচ্ছিল। প্রবাসী ভারতীয়গণ এস্থানের নামকরণ করেছে 'পাথরী কিল্লা'। বহুদূর হ'তে এই রাজবাড়ীর পাথরে-তৈরী উচ্চ প্রাচীর দেখা যায়। এ দেশীয় লোকদের নিকট এর সম্বন্ধে নানা কথা শু'নে দেখার ইচ্ছা খুব প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

একদিন অতি প্রত্যুষে চক্‌টো হ'তে একখানা মোটরবোটে আমরা তিন-চারজন যাত্রী রওনা হ'লুম। অনেক দিনের আশা সফল হ'তে চলেছে—এজন্য মনে একটা স্বাভাবিক আনন্দ হচ্ছিল। আমাদের মোটরবোট তার শক্তি এবং সামর্থ্যের উপযুক্ত বেগে ছুটে চল্‌ল। দু'ঘণ্টার ভিতর কালাডোন নদী পার হ'য়ে আমাদের বোট একটী ছোট পাহাড়ী নদীর ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে তার গন্তব্যপথে পাড়ি জমাতে লাগ্‌ল। নদী একটীও সোজা নয়, সবই বাঁকা; তাই ড্রাইভার অতি সাবধানে বাঁক ঘুরিয়ে চালাতে লাগ্‌ল। আমাদের চলার পথে দুই ধারে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র—এতে প্রচুর ধান জন্মায়। মাঝে মাঝে আম-কলা-নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা মগ পল্লীগুলিও আমাদের চোখে পড়্‌ছিল। প্রবল জলধারাকে বিশৃঙ্খল ক'রে আমাদের বোট এগিয়ে চলেছে—গ্রাম্য বালক-বালিকারা নদীর ধারে এসে' নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাই দেখ্‌ছিল। এদেশে দূর-গাঁয়ে যে'তে পায়ে হাঁটা পথ তেমন নেই, জলপথেই যেতে সুবিধা। নিকটে এবং দূরে পর্ব্বতশ্রেণী এবং নিবিড় ঘন অরণ্যানী দেখা যাচ্ছে। পাহাড়-চূড়ায় অথবা পল্লী-পার্শ্বে বৌদ্ধমন্দির এবং বিহারগুলি ধর্ম্মভাবের নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এসব দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা প্রায় দেড়টার সময় মেহং রাজধানীতে উপস্থিত হ'লুম। বোটখানা ষ্টীমারঘাটে থাম্‌ল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আহারাদির পর রাজধানী দেখ্‌তে বে'র হ'লুম।

এখানে এসেই আমাদের মনে হচ্ছিল এবং দেখ্‌ছিলুম—এটা যেন একটা পার্ব্বত্য দুর্গম-অরণ্য-পরিবেষ্টিত স্থান।

ভিতরে যে এতবড় এক রাজবাড়ী অথবা প্রতাপশালী ধার্ম্মিক রাজাদের অসংখ্য কীর্ত্তিস্তম্ভ রয়েছে একথা মোটেই মনে হয়নি। রাজবাড়ীতে প্রবেশ কর্‌বার পথে পাহাড়ের উপরে বহু মন্দির-শীর্ষ সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা তাঁর রাজধানী এমন স্থানে এত সুরক্ষিত ভাবে স্থাপন করেছিলেন যে, শত্রুপক্ষ বা অন্য কোন অজানা লোকের পক্ষে বাইরে থেকে এর সন্ধান পাওয়া মোটেই সম্ভবপর ছিল না। আর এখান থেকে অন্য কোন দেশে যাবারও প্রকাশ্য স্থলপথ ছিল না। একমাত্র গুপ্ত পার্ব্বত্যপথে এদেশের নানাস্থানে যাতায়াতের এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া, জলপথে যাওয়াই প্রশস্ত ছিল। নদী হ'তে রাজবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কর্‌বার জন্য তৈরী পথ ছিল। সেই পথ রাজপ্রাসাদের দুর্গ-প্রাচীরের পাশ দিয়ে তিন-চারটী নানারকমের প্রাচীর অতিক্রম ক'রে এঁকে-বেঁকে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়া, বিশেষ প্রয়োজনের জন্য একটী সরল সোজা পথও ছিল। যেন অজানা লোক প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য সেই পথে কড়া পাহারা থাকৃত।

আমরা সাম্‌নের সুসজ্জিত বাজারের ভিতর দিয়ে রাজবাটীতে উপস্থিত হ'লুম। দোকানীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। রাজবাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলুম। সরকার থেকে চারদিককার দৃঢ় দেয়াল-গুলো ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রাজপ্রাসাদটীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মাঝখানে সরকারী আফিস, ডাকবাংলো, পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি বসেছে। এ সত্ত্বেও রাজবাড়ীর চারিদিকের জলপূর্ণ পরিখা ও সুড়ঙ্গপথ এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। ঐ পথ দিয়ে অতি সহজে বেরিয়ে যাবার পথ ছিল। আজও এসব দেখা-মাত্রেই লোকের মনে পুরাতন রাজগণের স্মৃতি জেগে ওঠে। আমরা সাম্‌নের সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে ঢু'কে সরকারী আফিস আদালতগুলি দে'খে চার পার্শ্বের

পরিখা ও বিধ্বস্ত প্রাচীরের পাশ দিয়ে মাঝের সুড়ঙ্গ-পথটি বিশেষ ক'রে দেখ্‌লুম। এ দেশে প্রবাদ, যখন বৃটিশরাজ আরাকান আক্রমণ করেন, সেই সময় রাজপরিবারের সকলেই ঐ গুপ্ত-সুড়ঙ্গপথে নিরুদ্দেশ হ'ন। বৃটিশ সরকার ঐ দেশ জয় করেছিলেন বটে, কিন্তু কখনও রাজবাড়ীর কেউ তাদের হাতে ধরা দেয়নি। এখানে দাঁড়িয়ে আজ সেই গৌরবময় প্রবল প্রতাপশালী আরাকান-রাজের অতীত ইতিহাসের কত সমুজ্জ্বল স্মৃতিই না মনে জে'গে উঠ্‌ছিল। চারিদিকের পুরাতন ভগ্ন পাথরগুলি আজও যেন অতীত দিনের সাক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানেই একদিন আরাকানের অগণিত বীর যোদ্ধা, সুবিখ্যাত নৌ-বহর, গোলা-গুলি কামান-বন্দুক সুরক্ষিত ছিল। ধার্ম্মিক রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত কীর্ত্তি-স্তম্ভগুলি দেখে, পিছনের সিঁড়ি বেয়ে বের হ'তেই দেখ্‌তে পেলুম—ডান পাশে দেওয়াল-ঘেরা একটি পুরাতন পুকুর। শুন্‌লুম রাণীরা এতে স্নান কর্‌তেন।

আমরা সাম্‌নের রাস্তা ধ'রে পল্লী-পথে এগিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লুম, অদূরে পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ-মন্দিরের উন্নতশির আজিও সগৌরবে দয়াল দেবতার আশীর্ব্বাণী ঘোষণা কর্‌ছে। অধিকাংশ মন্দিরই পুরাতন হ'য়ে গেছে—কতক-গুলি বৃক্ষলতায় ঢেকে রয়েছে। রাজবাড়ী হ'তে বাইরে এসে পূর্ব্বদিকে কতকটা পথ এগিয়ে আস্‌তেই সম্মুখে দুইটী মন্দির দে'খে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে সেখানকার দেবতাকে দর্শন, স্পর্শন ও প্রদক্ষিণ কর্‌লুম। প্রধান মন্দিরের চারদিক ঘিরে' অনেকগুলো ছোট মন্দির রয়েছে। এদের নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি আধুনিক। তাই মনে হ'ল, রাজপ্রতিষ্ঠিত প্রধান মন্দিরটীকে সযত্নে ঠিক নূতনের মতই রক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিদিন এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

এবার গ্রাম্য পথে বাঁক ঘু'রে উত্তর দিকে এগিয়ে চল্‌লুম। দুইপার্শ্বে পাখীর কলকাকলী-মুখর তরু-শ্রেণীর ছায়া-শীতল পথটি একটা সুস্নিগ্ধ আরাম বিকীর্ণ কর্‌ছিল। খানিক দূর এগিয়েই সম্মুখের দ্বাদশটি মন্দির পরিবেষ্টিত একটি সুশোভিত বিরাট্‌ মন্দিরের সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়ে প্রণত হ'লুম। মন্দির-প্রাঙ্গণের

চারিদিক প্রদক্ষিণ ক'রে একটি প্রাচীন মন্দিরের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লুম। মন্দিরটি বড়ই সুন্দর—প্রস্তর-গাত্রে বহু কারুকার্য্য উৎকীর্ণ এবং অভ্যন্তরে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের চারদিকে সাতটি বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, সাতটি বারের নাম অনুযায়ী ঐ মূর্ত্তিগুলি তৈরী। বাইরের বিপদ থেকে মন্দিরকে রক্ষা করবার জন্যই ঐ সব মূর্ত্তি প্রহরায় নিযুক্ত। এই মন্দিরের অনতিদূরেই একটী কৃত্রিম গৃহ রয়েছে। এদেশে প্রবাদ, রাজা তাঁর রাজকার্য্যের অবসরে কখন কখন এই গৃহে নীরব সাধনায় মগ্ন থাকতেন।

এখান থেকে বের হ'য়ে জঙ্গলা পথে একটী পাহাড়ে উঠ্‌লুম। অদূরে চোখে পড়্‌ল একটী বহু পুরাতন বিরাট্ স্তূপ-মন্দির। আমাদের সঙ্গী বল্লেন, "এ মন্দিরটী এদেশে খুবই প্রসিদ্ধ ও প্রধান। এতে আশী হাজার বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—এর নাম আশীহাজারী মন্দির। ধার্ম্মিক রাজা নিজে এ'টী প্রতিষ্ঠা করেন।" আমরা একথা শু'নে খুবই আশ্চর্য্য হ'য়ে, ভাল ক'রে দেখ্‌বার ইচ্ছায় মন্দিরের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লুম। বাইরে থেকে দেখে তেমন কিছুই মনে হয় না, শুধু প্রস্তরের বহু পুরাতন একটি মন্দির—এই যা। এই মন্দিরের একটি বিশেষত্ব,—এর অভ্যন্তরে প্রবেশ-রথ রয়েছে এবং ভিতরেই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত,—অন্য সব স্তূপমন্দিরের মত নয়। এবার প্রবেশপথে অগ্রসর হ'য়ে মন্দিরে ভিতরে অন্ধকার পথে ঘু'রে ঘু'রে ধাপের পর ধাপ যতই উপরে উঠ্‌ছি, মন-প্রাণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ততই অভিভূত হচ্ছে। প্রত্যেক পদক্ষেপেই দেখ্‌ছি প্রত্যেক প্রস্তরফলকে ভগবান বুদ্ধের অপূর্ব্ব সুন্দর নানাভাবের প্রতিমূর্ত্তি সব বিরাজিত, যতই দেখ্‌ছি পুরাতন ভাস্কর্য্যের কি সুন্দর জীবন্ত চিত্রই না দৃষ্টিকে অভিভূত করছে। এই ভাবে টর্চ লাইটের সাহায্যে অপূর্ব্বকারুকার্য্য-খচিত মূর্ত্তিগুলি দে'খে বাইরে এলুম। সত্যই আশী হাজার মূর্ত্তি এখানে রয়েছে। অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব্বে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, দে'খে এসে সে ভাব দূর হ'ল, মন তৃপ্তির মহানন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। অন্ধকার পথে মাঝে মাঝে প্রাণে ভয়ের সঞ্চারও হ'য়েছিল, শুধু সঙ্গীদের সাহায্যেই দর্শন সফল হয়েছে। যদিও
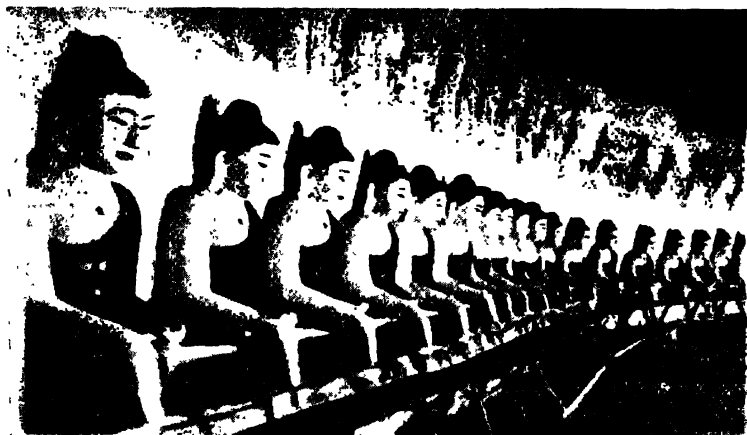
শ্রেণীবদ্ধভাবে ভগবান তথাগতের মুর্ত্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ

ব্যবসায়ী ব্রহ্ম মহিলা

ঐ মন্দিরটী ধ্বংসের পথে—তব এটী এদেশের ধর্ম্ম-গৌরব-স্তম্ভ। বাহিরে —চারিদিকে আরও মূর্ত্তি রয়েছে। প্রবেশ-পথের পার্শ্বে সেদিনের একটী শিলালিপি দেখে বুঝ্‌লুম ইহা পালি ভাষায় লেখা।

এই মন্দির হ'তে বে'র হ'য়ে কাছেই আর একটী পাহাড়ে অপর এক বিরাট্‌ ধ্বংসোন্মুখ মন্দির দেখ্‌তে চল্‌লুম। এ মন্দিরটী এদেশের রাজপুত্র পিতার ধর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে নব্বই হাজার বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছিল। আমরা দূর হ'তেই প্রণত হ'য়ে প্রবেশপথে এগিয়ে গেলুম। প্রথম দুয়ার হ'তে প্রতি পদক্ষেপেই চোখে পড়্‌তে লাগ্‌ল বুদ্ধদেবের অগণিত নানা ভাবের মূর্ত্তি। এতে সেই পুরাণ দিনের সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্য-শিল্পের অপূর্ব্ব অবদান সমৃদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। আজ এই মন্দিরটী ধ্বংসপ্রায় এবং লতাগুল্মে ছেয়ে আছে। কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি জঙ্গল সাফ ক'রে রাস্তা তৈরী ক'রে দিয়েছেন। আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না ক'রে বহিঃপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ ক'রেই ফিরে এলুম। এদেশে প্রবাদ, রাজার সাথে প্রতিযোগিতা ক'রে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা কর্‌বার কিছুদিন পরই রাজপুত্র মারা যান এবং মন্দিরেরও কতক অংশ ভেঙ্গে যায়। এদেশের ভক্তগণ বলেন—রাজপুত্রের অহঙ্কারের এইরূপ প্রতিফল হয়েছিল; মন্দিরটী আজ তারই সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ঘুরে' ঘুরে' দেখ্‌লুম, সর্ব্বত্রই রাজপরিবারের ধর্ম্মভাবের নিদর্শনস্বরূপ বহু মূর্ত্তি ও মন্দির ছড়িয়ে আছে। পাহাড় হ'তে নেমে খানিকটা দূরে 'দোকাছি' নামক মন্দিরটী দেখ্‌বার জন্য এগিয়ে চলেছি। বনানীর শ্যামলিমায় ঢাকা অপ্রশস্ত পথ বে'য়ে সেই মন্দিরে সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লুম, মন্দিরটি ভগ্নপ্রায়। মনে মনে দেবতাকে প্রণাম নিবেদন কর্‌লুম। এই মন্দিরটিও পাথরে-তৈরী এবং অনেক পুরাণ। অভ্যন্তরে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। প্রধান মন্দির ঘিরে' অনেক ছোট ছোট স্তূপ-মন্দির রয়েছে। এর দু'টি প্রবেশ-পথই এখন ভগ্নপ্রায় এবং লতা-গুল্মে ঢে'কে রয়েছে।

বেলা প'ড়ে এল; আমরাও যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হয়েছি। মাঝে, পাহাড়ে ব'সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে পুনরায় বন্য-পথে এগিয়ে চলেছি। আমাদের সঙ্গী বল্লেন, "আরও ক'টী মন্দির দেখতেই হ'বে।" তিনি পথ দেখিয়ে চল্লেন, আর আমরা ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলেছি। অল্পকাল পরেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্লুম, পাশাপাশি বিপুলকায় পাঁচটী মন্দির। উহার বহির্গাত্রে বুদ্ধের কয়েকটী সুন্দর ধ্যান-মূর্ত্তি স্থাপিত দে'খে মুগ্ধ চিত্তে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করলুম। এখানকার বৌদ্ধ-পুরোহিতের নিকট ঐ মন্দির-কয়টী'র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুনে' এবং রাজপরিবার যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন তার নিদর্শন পেয়ে সত্যিই প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্ল। বৌদ্ধ পুরোহিত বল্লেন, "এই মন্দিরগুলো একই সময় তৈরী হয়নি; তবে একজন রাজাই স্থাপন ক'রেছিলেন—বিভিন্ন সময়ে। রাজা এক সময় মনে ভাবলেন, তাঁর সমকক্ষ রাজা জগতে আর নেই, তিনিই শ্রেষ্ঠ; তাই সেই স্মৃতি উপলক্ষ্যে প্রথম মন্দিরটি তৈরী হ'ল। যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই উপলক্ষ্যেও দ্বিতীয় ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আবার এক সময় তিনি অসুস্থ হ'য়ে একটী ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর আরোগ্য লাভ ক'রে আর একটী ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপন করেন। অবশেষে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু নিশ্চয় জেনে শেষ-স্মৃতিস্বরূপ আরও একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যকলাপের সঙ্গেই ধর্ম্মকে যেন সহায় ও সম্পদরূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।" ভিক্ষু আরও বল্লেন, তিনি যেমন বিভবশালী প্রতাপান্বিত তেজস্বী রাজা ছিলেন, তেমনই ধর্ম্মপ্রাণ, দাতা এবং অমায়িক ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি, ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি এবং বুদ্ধের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। আমরা ভিক্ষুর কথা শু'নে অবাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ-চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলুম।

এই কয়ঘণ্টার মধ্যে এখানকার বর্ত্তমান সহর, পল্লী ও পুরাতন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এবং তার চারদিকের মন্দির, বিজন পল্লীপথ এবং বিহার ইত্যাদি দে'খে সত্যই মনে হচ্ছিল যে, ধার্ম্মিক রাজগণের পুণ্যালোকদীপ্ত 'প্যাগোডার দেশ'

নাম সম্পূর্ণ সার্থক। আমাদের এই ভাবান্তরের সুযোগ নিয়েই যেন সূর্য্য অস্তাচলে ডুবে গেলেন—সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নিবিড় হ'য়ে নেমে এল। প্রশান্ত-দর্শন বৌদ্ধ-ভিক্ষুটীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বিহারে বিশ্রামালাপে কিছু সময় অতিবাহিত ক'রে, সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ ক'রে পল্লী অতিক্রমের পর সহরের রাস্তায় উপস্থিত হ'লুম। পাথুরে-কাকরে তৈরী পথ। কিছুদূর ব্যবধানে দুইপার্শ্বের আলোক-স্তম্ভগুলি মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে। লোকজন রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছে, চায়ের দোকানে আরাকানীজদের চা খাওয়া ও হল্লা চল্‌ছে। এই সহরটি বর্ত্তমানে একটি মহকুমা, কাজেই, উকীল, ডাক্তার, পুলিশ, স্কুল,—সবই আছে।

আমার মনে কিন্তু এসব ততটা তৃপ্তি দিল না; শুধু মনে হ'তে লাগ্‌ল প্রাচীন রাজবংশের কথা আর তাঁদের পুণ্যস্মৃতি! মানুষ ম'রে যায় বটে, কিন্তু রেখে যায় তার চির-স্মরণীয় উজ্জ্বল স্মৃতি, যা' তাকে অমর ক'রে রাখে জগৎ সমক্ষে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে—বৌদ্ধযুগে রাজগণ যে শুধু নিজেরাই ধার্ম্মিক ছিলেন তা নয়, তাঁরা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চারিদিকে ভিক্ষু ও পণ্ডিতদের পাঠাতেন এবং নানাস্থানে বৌদ্ধ-মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠা ক'রে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করতেন। আরাকানরাজও তাঁর রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মপ্রচারার্থ নানাস্থনে মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠা ক'রে এই মহান্ ও উদার ধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন। সেই স্মৃতি-গৌরব চিরদিন এই রাজপরিবারকে বৌদ্ধ-জগতে চিরস্মরণীয় ও বরেণ্য ক'রে রাখ্‌বে,—এইরূপ অনেক কথাই মনে হ'ল।

ধীরপাদক্ষেপে আলো-আঁধার ঘেরা রাজপথে আমরা এগিয়ে চলেছি; শরীর ক্লান্ত, রাত্রিও বেশ হয়েছে। এবার ফিরে এসে' আমাদের মোটরবোটে উপস্থিত হ'লুম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম ও আলাপে কাটিয়ে সবাই মিলে আহার সমাপন করলুম। পরদিন অতি প্রত্যূষে চা-খেয়ে এই প্রাচীনপুণ্য-স্মৃতি-বিজড়িত রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে, দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে, এ দেশ হ'তে বিদায় নিলুম। আমাদের মোটরবোট তার পূর্ণগতিতে চক্‌টো অভিমুখে ছুটে চল্‌ল। ক্ষুদ্র নদীর স্রোত বে'য়ে উভয় পার্শ্বের বনানী-শোভিত আঁকা-বাঁকা পথে পরিচিতের মতই সে এগিয়ে চল্‌ল।

ন্যাংটাদের দেশ পেলেটোয়া

চক্‌টোতে বাস করবার সময়ে ওখানকার লোকদের কাছে শুনতুম, উপরের পাহাড়ে ন্যাংটাদের বাস। তারা নাকি খুব হিংস্র ও অসভ্য।

এখানে একটি কথা ব'লে রাখ্‌ছি, আমি যেখানে বাস ক'র্‌তুম সে স্থানটি পাহাড়ী দেশ হ'লেও নবীন সভ্যতার আলোকরশ্মিতে সেখানকার সবাই আলোকিত ও পুলকিত। আফিস, স্কুল, মন্দির,—সবই রয়েছে। আকিয়াব সহর থেকে প্রত্যহই তথায় ষ্টিমার যাতায়াত করে। কাজেই এখানকার আরাকানীজদের দে'খে সেই ন্যাংটাদের কথা ভাবা সম্ভব নয়। তবে কখন কখন দু'চারজন সুস্থ সবল বিশালাকৃতি মানুষ যখন নেংটি পরে একেবারে খালি গায়ে একটা লম্বা দা হাতে ক'রে নির্ব্বিকার ভাবে এই ভদ্রলোকালয়ে এসে' উপস্থিত হ'ত, তখন তাদের দে'খে সত্যিই মনে হ'ত উপরের পাহাড়ে নিশ্চয়ই ন্যাংটা লোকের বাস রয়েছে।

সন্ধান ক'রে জান্‌লুম, প্রতি সপ্তাহে দু'দিন ক'রে এখান হ'তে একটি ছোট ষ্টিমার অতি প্রত্যূষে যাত্রী ও সরকারী ডাক নিয়ে পার্ব্বত্য নদী বে'য়ে উপরের দিকে "পেলেটোয়া" পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করে। ঐ পেলেটোয়াই হ'ল পার্ব্বত্য জেলা। লুসাই পাহাড়ের সাথে পেলেটোয়ার পর্ব্বতশ্রেণীর অতি নিকট সম্বন্ধ।

সত্যিই আমি একদিন ভোর ছ'টায় সেই পেলেটোয়া-গামী ক্ষুদ্র ষ্টিমারে উ'ঠে পড়্‌লুম। কয়েক মিনিট পরে ষ্টিমার তার শেষ সাড়া দিয়ে নঙ্গর তু'লে দাঁড়াল। ষ্টিমারের প্রধান চালক সারেঙের ইঙ্গিত-ধ্বনি হওয়ামাত্র টুং টাং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌বার সাথে সাথে ষ্টিমার গন্তব্য পথে ছুটে চল্‌ল। প্রভাতের সোনালি আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। পাখীর কাকলি ও জনগণের কর্ম্মকোলাহল নিত্যকার মতই চলেছে।

সারেঙ ও কেরাণীর সাথে আমার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। আদর-যত্ন করতে তাঁরা কোনই ত্রুটি করলেন না। ষ্টিমারখানা অতি ছোট, সেই অনুপাতে যাত্রী

বেশী, তাই পাশাপাশি ব'সে সবাইকে মিলেমিশে যেতে হয়। একটি ফার্ষ্ট ক্লাস এতে আছে, সেটি প্রায়ই সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য রিজার্ভড্ থাকে। আমি কোন মতে নিজের একটু জায়গা ক'রে ব'সে পড়্লুম। ষ্টিমারের নাম "কালাডোন্", আর এই পার্ব্বত্য নদীটিরও নাম "কালাডোনা।"

ষ্টিমার ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে নদীর উভয় তীর হ'তে যাত্রীদের আহ্বানে মাঝে মাঝে থাম্তে লাগল। ষ্টিমারের সাথে সর্ব্বদা একখানা ছোট নৌকো বাঁধা থাকে। সেই নৌকোয় যাত্রীদের পার হ'তে নিয়ে আসা এবং নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ষ্টিমার দু'একটী বড় ঘাটে ব্যতীত অন্যত্র ভিড়ে না। তবে রাস্তায় যেখানে সেখানে লোক ডাক্লেই ষ্টিমার নদীর ভিতর দাঁড়িয়ে থেকে নৌকোর সাহায্যে লোক উঠিয়ে নেয়,—এ বড়ই সুন্দর ব্যবস্থা। এসব দেখ্তে দেখ্তে এগিয়ে চলেছি। নদীর দু'ধারেই পাহাড়ের নীচু সমতল ছোট ছোট গ্রাম, শস্যপূর্ণ ক্ষেত, মন্দিরের চূড়া,—এসব দেখ্তে পেলুম। আবার সমতলের গা ঘেঁসে কাল মেঘের মত সারি সারি বিশাল ঢেউখেলান পাহাড়গুলো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও পাহাড়ের চূড়া হ'তে ধূম উদ্গীরণ হচ্ছে, কোনটা কুয়াসাচ্ছন্ন, কোথাও বা সূর্য্য-কিরণ প্রতিবিম্বিত হ'য়ে জ্বল জ্বল কর্‌ছে। এ ভাবে ঘণ্টা দেড়েক এগিয়ে যাওয়ার পরই ধীরে ধীরে নদীর উভয় পার্শ্বের সমতল ভূমি আর দেখ্তে পাচ্ছি না। দু'ধারে শুধু প্রাচীরসদৃশ দৈত্যের মত উঁচু পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝ দিয়ে প্রবল বেগে পাহাড়ী নদী ব'য়ে চলেছে। নদীর জলের খরস্রোত আমাদের বিপরীত দিকে ছুটেছে, তাই ষ্টিমারখানি তার প্রাণপণ শক্তিতে অতি কষ্টে উপরের দিকে উঠ্ছে। নদীটীও তেমন প্রশস্ত নয়। যারা আসামের গৌহাটি হ'তে মোটরে চৌষট্টি মাইল শিলং পাহাড়ে উঠেছেন, তাঁরাই আমার কথার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝ্তে পার্‌বেন। আমাদের ষ্টিমারখানা জলপথে সেরূপ এঁকে-বেঁকে উপরের দিকে উঠ্তে লাগল, কারণ উভয় পার্শ্বেই উঁচু পাহাড়ের সারি। জলের নীচেও ডুবু পাহাড়, কাজেই অতি সন্তর্পণে যেতে হচ্ছে,—একটী আঘাতেই জাহাজ নষ্ট হ'বার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রমেই নদীটী আরো এঁকে-বেঁকে চলেছে ; ষ্টিমারকেও সেভাবে যেতে হচ্ছে। এখন আর গ্রাম দেখ্‌তে পাচ্ছি না,—শুধু পাহাড়, আর পাহাড়। তাতে আবার নির্ব্বাক বনানীর শ্যামল শোভা, কত যে ছোট বড় গাছ, লতা, শাল, সেগুন, অর্জ্জুন, বাঁশ, আরো কতরকম নাম-না-জানা গাছ ও লতা, সুসজ্জিত এক বনানীকুঞ্জ তৈরী হ'য়ে আছে। কোথাও বা লতাবীথিকার আভরণহীন শুষ্কগাত্র পাহাড় আমাদের ষ্টিমারের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও জলমধ্যে হস্তীপৃষ্ঠবৎ শিলাখণ্ড ভেসে আছে। শুনলুম, এসব নিবিড় অরণ্যময় পাহাড়ে বন্যহাতী, হরিণ, বাঘ, ভালুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বদাই স্বাধীন ভাবে চ'রে বেড়ায়। এ দিক্‌কার পাহাড়গুলোতে ভয়াবহ নিস্তব্ধতার সাথে একটা কমনীয়তাও ফু'টে রয়েছে। ষ্টিমারের সারেঙ অতি দূরে নির্দ্দেশ ক'রে আমায় দেখাতে লাগল, আরো উপরের পাহাড়ের মাঝে মাঝে এক এক স্থানে চারপাঁচখানা মাচা-বাঁধা ছোট ছোট উঁচু ঘর। তাতেই নাকি ন্যাংটাদের বাস, ঐসব তাদের পল্লী। ঐ ঘরগুলো দে'খে আমার খুব আনন্দ ও আগ্রহই হ'ল। ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, অত দূর পর্ব্বত হ'তে তারা কিভাবে নীচে আসে, কি সাহসেই বা হিংস্র জন্তুর মধ্যে নির্ভয়ে বাস করে, কেমন ক'রে একাকী তাদের এই কঠোর বিচিত্র জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইত্যাদি। ষ্টিমারের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম বেলা একটা বেজে গেছে। চল্‌তি পথে প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনপ্রাণ এতই তন্ময় হয়েছিল যে, এ পর্য্যন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হয় নাই। প্রায় দেড়টায় আমাদের ষ্টিমার এসে এ পার্ব্বত্য পথে একটী ষ্টেসনে উপস্থিত হ'ল। ষ্টেসনের নাম "মেওয়া"। এখানে সরকারী বনবিভাগের অফিস, ডাকবাঙ্গলো, সাময়িক পোষ্টাফিস আছে। এখান হ'তে এখনও চিঠি বিলি করা হয় না, অর্থাৎ এদের সুসভ্য করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে মাত্র। আরও শুনলুম, একটী প্রাইমারী স্কুলও নাকি খোলা হয়েছে, এটি একটী বড় রকমের গ্রাম, আর এই গ্রামটীই হ'ল আকিয়াব জেলার শেষসীমা। এর পর হ'তে পার্ব্বত্য জেলা আরম্ভ হয়েছে, তাই এখানে ষ্টিমার কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ঐ কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার দু'চারজন লোক নীচের দিকে অফিস-

আদালতে কখন কখন যায়, তাই ওখানকার লোকদের দে'খে এরা পোষাক-পরিচ্ছদে অনেকটা ভদ্র সভ্য হয়েছে। ষ্টিমার আসবামাত্র অনেক পাহাড়ী ছু'টে আসে সহরবাসীদের দেখবার জন্য, আর দূরে দাঁড়িয়ে আপন ভাষায় কি যেন ব'লে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে।

আমাদের ষ্টিমার তার বিদায়সূচক মর্ম্মভেদী বাঁশী বাজিয়ে একটু পরেই ছেড়ে চল্‌ল। এই ষ্টেসন হ'তে দু'চারজন যাত্রিও উপরের দিকে যাবার জন্য উঠ্‌ল। এখান থেকে আমরা আরও নিবিড় ঘন বনময় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নদীপথে চলেছি। যেদিকেই চাইছি, শুধু আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি চারদিক ঘিরে' আছে, আর কিছুই নেই। নয়ন-মনের সাম্‌নে প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর রূপটী ভেসে ওঠে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর, উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে দুচারখানা ঘর দেখ্‌তে পেলুম। এবার ষ্টিমারের কেরাণীর সঙ্গে আলাপ হ'তে লাগ্‌ল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা শেষ ষ্টেসন "পেলেটো"য় পৌছাব। আমি তাকে 'পেলেটোয়া' সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম। তিনি বলতে লাগলেন, "সেটা একটা পার্ব্বত্য জেলা, তথায় একজন ডেপুটি কমিশনার ও কতক রক্ষী পুলিশ রয়েছে। বিদ্যালয় এবং জেলখানাও আছে। পূর্ব্বে এদেশ শাসনও সংরক্ষণ করবার জন্য অনেক সৈন্যও এসেছিল। কিন্তু শাসন করবে কাদের? এই পাহাড়ী ন্যাংটাদের সাথে দেখাশুনাত হয়ই না, তারা দূরে—অতি দূরে উঁচু পাহাড়-শিরে স্বাধীন ভাবে বাস করে, তারা কারও শাসনে বাধ্য নয়, কোথাও কিছু অসুবিধা বোধ করলে অপর পাহাড়ে চলে যায়। কাজেই এদের দেখা পাওয়া বড়ই মুস্কিল। এসব কারণে সরকারী রাজস্বও তেমন আদায় হয় না। তাই সৈন্যদলকে বিদায় দিয়ে শুধু রক্ষী পুলিশবাহিনী রাখা হয়েছে। বনবিভাগের কর বেশ আদায় হয়, এবং নানা উপায়ে ন্যাংটাদের শাসন-শৃঙ্খলায় আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এদের যেসব খুব সখের জিনিষ, সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ ক'রে প্রতিবৎসর নানারূপ উৎসব-আমোদের ভিতর দিয়ে এদের আয়ত্বে আন্‌বার অনেক চেষ্টা চল্‌ছে। কিন্তু

তাতেও তেমন আশাপ্রদ ফল লাভ হয়নি। কখন কখন দেখা যায়, কোন দরকারী জিনিষের জন্য উপর হ'তে পাহাড়ী ন্যাংটার দল নীচে বাজারে নেমে আসে। এখানে একটি বাজার আছে, দোকানীরা বাংলা, বিহার ও নানা স্থানের অধিবাসী। সরকার হ'তে বিশেষ সুবিধা ক'রে দেবার চুক্তিতে এরা এখানে দোকান করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য, এখানে একটি ছোটখাট সহর গ'ড়ে পাহাড়ীদের নিকট রাজসম্মানের দাবী ক'রে রাজস্ব আদায় ও তাদের সুসভ্য করা। ডাকবাংলো, পোষ্ট অফিস, প্রাইমারী স্কুল,—সবই আছে।" ষ্টেসনটি দেখ্‌তে বেশ, পাহাড়ের একেবারে নীচে নদীর ধারে, আর এই সহরটি হ'ল পাহাড়ের উপর। উপর হ'তে অতি ক্ষুদ্রকায় এই ষ্টিমারটী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেরাণী আরও বল্‌লেন, "যে কোন বিদেশী লোক এখানে এলে এখানকার নিয়ম অনুযায়ী একজন পুলিশ তার নাম ধাম ঠিকানা, কি উদ্দেশ্যে আসা, কবে যাওয়া হ'বে, কত টাকা সঙ্গে আছে, এসব লি'খে তারপর সহরে প্রবেশ করতে দেয়। আর কোন সন্দেহ জাগ্‌লে তৎক্ষণাৎ বে'র ক'রে দেয়। কোন ওজর আপত্তি কারও শোনে না।"

আমি এসব রহস্যজনক কথা শুন্‌তে শুন্‌তে চলেছি। মনে ভাব্‌লুম, পেলেটোয়া ষ্টেসনের পূর্ব্বে কোথাও নাম্‌লে এ হাঙ্গামা হয়ত হ'ত না। অবশ্য দু'চারটি ঠিকানা আমি জোগাড় ক'রে সঙ্গে এনেছি। বাঙলা দেশের দুচারজন লোক সরকারের অনুমতি নিয়ে বহুদিন হ'তে এসব পাহাড় অঞ্চলের নানা স্থানে ব্যবসা ক'রে বেশ দুপয়সা উপায় কর্‌ছেন। এদের কোন দোকানে যেতে পারলেই আমার আর কোন গোলে পড়তে হ'বে না, অথচ সব আশা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'বে। এই ভেবে কেরাণীকে একটা ঠিকানা দেখালুম। অমনি তিনি অদূরে একটি পাহাড়ের উপরে একখানি টিনের ঘর দেখিয়ে বল্‌লেন, ঐ সেই দোকান।" আমি ওখানে নামাবার প্রস্তাব করতেই, কিছুক্ষণ পরে আমাকে এই অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে নামিয়ে দিয়ে ষ্টিমার চ'লে গেল। এক চিন্তা দূর হ'ল বটে, কিন্তু এই স্থানটী অপরিচিত ব'লে, আর এক সমস্যার উদয় হ'ল। আমি ষ্টিমার হ'তে নেমে অতি কষ্টে পাহাড়ের গা বে'য়ে কোন রকমে উপরের দোকানে

এসে উপস্থিত হ'লুম। অল্প সময়েই দোকানীর ভদ্র ব্যবহার ও আদর-আপ্যায়নে খুশি হ'লুম। আমিও তাঁদের নিকট আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলুম। একটু আলাপেই দোকানী আমার খুব আপনার-জন হ'য়ে গেলেন। আধঘণ্টার ভিতর তিনি আমার খাবার যোগাড় ক'রে দিয়ে বল্‌তে লাগলেন, "আপনার এদেশে যা দেখ্‌বার তা এখান হ'তেই দেখ্‌তে পারবেন, কারণ আমাদেরই দোকানে এখানকার বহু দূর দূরের প্রায় আট দশটি পাহাড়ের লোক জিনিষপত্র কিন্‌তে আসে। আশে পাশেও অনেক পাড়া রয়েছে।" আমি আহার শেষ করতে করতে তার কথা শুন্‌লুম। পরে দোকানের যেখানে বেচা-কেনা হয় সেখানে এসে বস্‌লুম। একটু বাদেই দেখি, একদল লোক মেয়ে-পুরুষ-শিশু নির্ভীক নিঃসঙ্কোচভাবে এ'সে দোকানে প্রবেশ করল। আমি প্রথমেই আমার অতি কাছে এদের দে'খে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লুম, কারণ মানুষ যে এভাবে লজ্জাহীন হ'য়ে লোক সমক্ষে চলা ফেরা করতে পারে, এ আমার ধারণাতেও ছিল না। পুরুষ যারা তারা ছয় সাত অঙ্গুলি প্রস্থ কাল কাপড়ের একখানি টুকরা কোমরে কৌপীনের মত ঝুলিয়ে লজ্জা নিবারণ করছে, আর মেয়েরা কোমরের নীচে ঐ প্রকার আধ হাত আন্দাজ কাপড় জড়িয়ে রেখেছে,—সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত ; ছেলেরা সব ন্যাংটা। অথচ এদের এতে লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুই নেই, বেশ স্বাভাবিক সরল ভাবে হাসি তামাসা করতে করতে তাদের জিনিষ পত্র কি'নে বাড়ী ফিরে গেল। আমি দোকানীকে এদের কথা জিজ্ঞেস করলুম, কি ভাষায় এরা কথা বলে। তিনি বল্‌লেন, এরা মগ নয়, কুকি ; এদের ভাষাও ভিন্ন, তবে এদের ভেতর দু'চারজন মগ ভাষা জানে। দোকানী আবার বল্‌লেন, "আরও দু'চারদিন এখানে বাস করলেই সব বুঝ্‌তে ও দেখ্‌তে পারেন। এখানেই আরো একটি পাহাড়ী জাতি আছে, তারা হ'ল মুরুং, কুকিদের সাথে তাদের তফাৎ দেখ্‌লেই বুঝবেন।"

এইভাবে দোকানীর সাথে অনেক কথা হ'তে লাগ্‌ল। সেই অবসরে যেন সূর্য্যদেব পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার মৌন আঁধার

নিবিড় হ'য়ে নেমে এল পৃথিবীর বুকে। পাহাড়ী পল্লীগুলি একেবারে নীরব নিঝুম আঁধারে ছেয়ে গেল। আমরা শুধু দোকানে একটি জোনাকির মত বাতি জেলে গল্প জু'ড়ে দিলুম। মাঝে এই স্তব্ধতা ভেদ ক'রে দূর হ'তে ঝিল্লীরব ভেসে আস্‌ছে। আমিও ক্লান্ত শরীরে শয্যা গ্রহণ করলুম। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ভয়ানক শীত বোধ হ'তে লাগল, কাপড় জামা কম্বল ভাল ক'রে শরীরে জড়িয়ে নিলুম, কিন্তু তাতে কিছুই হ'ল না,—সব যেন জলে ভি'জে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দোকানী আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে অম্‌নি উ'ঠে খানিকটা আগুন জ্বেলে তার সাম্‌নে ব'সে আমায় আরাম করতে বললেন। সত্যিই এতে শীতের জড়তা অনেকটা কমে গেল।

পরদিন আটটার পূর্ব্বে আর সূর্য্যদেবকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। সূর্য্য ওঠার সাথে সাথেই তার সোনালি আলো ছড়িয়ে গেল পাহাড়ের মাথায় মাথায়। চিরগম্ভীর পাহাড়ে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দু'চারটি পাহাড়ী পাখীর কলকাকলিও ভেসে আস্‌ছিল। একটু পরেই দলে দলে পাহাড়ী কুকির দল দোকানে এসে উপস্থিত হ'তে লাগ্‌ল। সবাই বহুদূর হ'তে জিনিষপত্র কিন্‌তে এসেছে। স্ত্রী-পুরুষ বালক এদের কারো কারো পোষাক গতকল্য যাদের দেখেছিলুম তাদের মতই, আবার কয়েক দলকে দেখ্‌লুম, গাছের পাতা গেঁথে কোমরে খানিকটা ঝুলিয়ে রেখেছে, সর্ব্বাঙ্গ একেবারে শূন্য। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐরূপ; কিন্তু শরীর সুস্থ সবল, হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান, খুব উঁচুও নয় বেটেও নয়, মাঝামাঝি চেহারা। প্রথমতঃ আমি এদের ঐ উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখে সঙ্কোচে নিজেই লজ্জিত হতুম; কিন্তু পরে এভাবে এদের নিঃসঙ্কোচ নির্ভীক স্বাভাবিক সরল বাক্যালাপ দে'খে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। দোকানী আমাকে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা আমায় সশ্রদ্ধ ভূলুণ্ঠিত প্রণতি জানিয়ে তাদের পাড়ায় যাবার জন্য অনুরোধ করল। আমি এদের সরল প্রাণের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলুম না, আনন্দে সম্মতি জানালুম। এরা ন্যাংটা অবস্থাতেই সর্ব্বদা থাকে। সবার সঙ্গে একখানি দা আছেই, এটি হ'ল এদের নিত্যকার প্রিয় সাথী। এদের

জীবন খুব কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু। সাধারণতঃ এরা পাহাড়ে বাঁশ গাছ ও বেত কাটে এবং তাহা নীচের লোকদের নিকট বিক্রয় ক'রে অথবা পাহাড়ের ধান, তূলো, তিল, কুমড়ো, শশা, কলা, প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপন্ন ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করে। এইসব জিনিষ এরা ঐ পাহাড়ী দোকানে বদল ক'রে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যায়। এদের মাথার সাথে দড়ি দিয়ে জড়ান লম্বা একটা ঝুড়ি বাঁধা থাকে, তাতে ক'রে সবাই প্রায় একমণ দেড়মণ জিনিষ নিয়ে এ দুর্গম পার্ব্বত্য পথে সহজেই ওঠা-নামা করে। এরা বেশ আমোদপ্রিয়, সর্ব্বদা আনন্দে থাকে,—কোন বিষাদের ভাবই নেই এদের। মেয়েরা ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে পিঠে ঝুলিয়ে কাজ করতে যায়। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এরা মাংসাশী জাতি, গরু, মহিষ, শূকর, হরিণ, মুর্গি, হাঁস,—যা পায় তাই খায়। তামাকের পাতা ও পান এদের বড় প্রিয়। ঘরে এক প্রকার মদ তৈরি ক'রে ন্যাংটারা খুব খায়, তখন সবাই মিলে খুব আনন্দে নাচ-গানে মেতে যায়। বাদ্যযন্ত্রের ভিতর কাঠের চাকায় চামড়ার ছাউনী দিয়ে ঢোলের মত বাজায় এবং দু'খানা বাঁশের টুক্‌রো দ্বারা ঠক্ ঠক্ ক'রে গানের সাথে তাল দেয়। আবার পাকা লাউয়ের খোলে, বাঁশের নলের সাহায্যে একপ্রকার বাঁশী তৈরি ক'রে নেয়—সেটি হ'ল পোঁ-ধরা বাঁশী। এদের উলঙ্গ অঙ্গ নানারূপ চিত্রে পরিশোভিত। উৎসবের সময় পাখীর পালক ও বিচিত্র রং মেখে সেজে-গুজে মেয়ে-পুরুষ সবাই আনন্দে যোগ দেয়।

আমি একদিনই দু'চারটি পাহাড়ী পাড়ায় বেড়িয়ে এদের সরল প্রাণের আপ্যায়নে খুবই প্রীত হয়েছিলুম,—যেন আমি তাদের কতই আপনার-জন! আমারও কিন্তু ওদের প্রতি ঐরূপ আপনার ভাব এসেছিল। অবশ্য দোকানী আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ব'লেই ওদের সাথে এতটা মেশবার সুযোগ হ'য়েছিল। নয়তো এরা অপরিচিত লোকের সাথে আলাপও করে না, তাদের বিশ্বাসও করে না।

কুকিরা লোকের সাম্‌নে যেরূপ উলঙ্গ অবস্থায় আসে, ঘরেও তেম্নি ভাবেই থাকে। আমরা যেমন প্রথমতঃ ঐরূপ একজন লোক দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে

সঙ্কোচের সহিত তার দিকে তাকাই, এরা তার ঠিক বিপরীত। হঠাৎ কোন কাপড়-জামাপড়া ভদ্রলোক দেখ্‌লে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের দারুণ শীতে আদুড়-গায় এরা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে কাজ করে যায়—শীত সহ্য করা যেন এদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি দু'তিন দিন বৈকালের দিকে পাহাড়ী পাড়াগুলো দেখ্‌তে গিয়ে ফেরবার পথে সাঁঝের শীতে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছিলুম। এ পাহাড়ী মুলুকে কি ভীষণ শীত! কিন্তু এখানকার শীতের একটা বিশেষত্ব আছে। সমতলে যেমন বাহিরে খুব শীত অনুভূত হয় এবং গরম জামা-কাপড় পর্‌লেই অনেকটা কমে যায়, পাহাড়ী দেশে তেমনটি নয়। এখানকার জলবায়ু বার মাসই ঠাণ্ডা থাকে। তাই শীতের সময় শীত আরও বেশী। এখানকার শীতের বিশেষত্ব হচ্ছে, হাত পা সমস্ত শরীর যেন ধীরে ধীরে একেবারে ঠাণ্ডায় অবশ হ'য়ে আসে, আর শরীরের সমস্ত আবরণগুলো শীতল হ'য়ে যায়। এর একমাত্র প্রতিষেধক আগুনের তাপ, অপর কোন গরম পোষাকে আরাম হয় না।

পাহাড়ীদের ঘরগুলো সব একই রকমের; এক বস্তিতে দশ বার খানা, কোথাও বা চার পাঁচখানা ঘর আছে। সবই উঁচু মাচা বাঁধা বাঁশের তৈরি। একটি লম্বা গাছ সেই উঁচু ঘরের সামনে ফেলে রাখা আছে—তাই দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়—ঐটিই হ'ল সিঁড়ি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুকিরা যখন ক্লান্ত হ'য়ে ফি'রে আসে, তখন সম্মুখে পাহাড়ের ঝরণায় দিব্যি মেয়ে-পুরুষ উলঙ্গ হ'য়ে স্নান সমাপন ক'রে পূর্ব্বের মত সেই পাতা দিয়ে অথবা কাপড়ের টুক্‌রো কোমরে জড়িয়ে বাড়ী আসে এবং বড় একখানা কাঠের গুঁড়িতে আগুন ধরিয়ে তার ধারে ব'সে আরাম করে। মাঝে মাঝে একটি বাঁশের নলে কিছু তামাকপাতা কুচিয়ে অগ্নি-সংযোগে টানতে থাকে। মেয়েরা ইতিমধ্যে বাঁশের তৈরি একখানা চিরুণী দিয়ে চুলগুলো মনের মত ক'রে গুছিয়ে, পাহাড়ী নানাজাতীয় ফুল তু'লে মাথায় ও কানে ঝুলিয়ে আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হয়। ফুল এদের অতি প্রিয়। পুরুষদের মাথার চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, ঐদিকে তারা বেশী নজর

দেয় না। শীঘ্রই তাদের সান্ধ্য-ভোজনের যোগাড় হ'য়ে যায়; আহার সমাপন ক'রে ঘর হ'তে নামা-ওঠার সিঁড়িখানা ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে সম্মুখের দরজা বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। আলোর দরকার হ'লে শুক্‌নো বাঁশের ফালি অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত ক'রে তাই দিয়ে আলোর কাজ সেরে নেয়। প্রায় বাড়ীতেই সমস্ত রাত আগুন জ্বালান থাকে। রাত্রিতে যদি এক পাড়া হ'তে অন্য পাড়ায় যেতে হয় তা হ'লে এক গোছা বাঁশ জ্বালিয়ে দু'তিনটি মশাল তৈরি ক'রে তাই নিয়ে এরা নির্ভীক ভাবে চলে যায়। শুনেছি, হিংস্র জন্তুও নাকি আগুনে ভয় পায়।

বিপদে অথবা শিকারের সময় কুকিরা সুতীক্ষ্ণ তীর ও শুসাল বাঁশ ব্যবহার করে; লম্বা দা-খানা তো সর্ব্বদা সহচর রূপে আছেই। যদি দূর হ'তে কাউকে ডাকতে হয় তবে মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে এমন একটী উচ্চ শব্দ ক'রে ডাকে যে, নিকটবর্ত্তী সকল পাহাড়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। যদি কাহারও উত্তর দেবার আবশ্যক হয়, সেও ঐ ভাবে সাড়া দেয়। নিয়মটি বড় চমৎকার! পাহাড়ীরা রাত্রি দিন কোন সময়েই ভয়ের লেশমাত্র বোধ করে না, একেবারে নির্ভীক। মাছ যেমন জলে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, এ হ্যাংটা কুকিরাও তেমনি নিবিড় পর্ব্বতে নির্ভয় নিঃশঙ্ক অন্তরে বাস করে। এদের ভিতর যারা আবার আরও দূরে লোকালয়ের একেবারে বাইরে অতি উঁচু পাহাড়ে বাস করে, তাদের কেউ বা গাছের ছাল অথবা কাঠের দু'খণ্ড ফালি কোমরে ঝুলিয়ে রাখে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ দেহ, উলঙ্গ মূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গে নানা চিত্রাঙ্কিত ভীষণ চেহারাটি দেখ্‌লে সবারই মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হয়। বিশেষ দরকার হ'লে কখনও নীচের পাহাড়ে তারা আসে। এদের আহার আরও বীভৎস, কাঁচা মাংসাদিও নাকি খায়!

শুন্‌লুম, এদের ভেতর হিংসার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা এত বেশী যে, প্রতি বৎসরই যে কোন সুযোগে এক পাহাড় হ'তে অপর দল এসে প্রতিশোধ নেবার ছলে দু'চার জনকে হত্যা করে, দু'একজনকে ধ'রে নিয়েও যায়। তাদের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। এই প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির ভাবটি আবার

বংশপরম্পরায় চ'লে আস্‌ছে। হয়ত একজন অপর পল্লীর কারো প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছে; নির্য্যাতিত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয় নি। এমতাবস্থায় মৃত্যুশয্যায়ও এ কথা সে তার ছেলে বা অন্য যে কেউ উপস্থিত থাকবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবে, যাতে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয়। কেউ যদি কারো নিকট ঋণী থাকে, তাহ'লে যে কোন উপায়ে তাকে ধ'রে আট্‌কে রেখে তার দ্বারা কাজ করিয়ে ঋণ প্রতিশোধ করিয়ে নেবে। এমনও হয়, যাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল তাদের উভয় পক্ষের দুজনেই মারা গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'তিন পুরুষ পরেও বংশধরেরা তার প্রতিশোধ নেবেই, এই হ'ল তাদের বংশের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রতি বৎসরই এরূপ প্রতিহিংসার পরিশোধে অনেক প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। এরা শাসন-শৃঙ্খলার বাইরে, আইন আদালত জানেও না, মানেও না। তবে প্রত্যেক পল্লীতেই কিন্তু একজন প্রাচীন প্রধান বা সর্দ্দার আছেন, তার আদেশ কেউ কখনো উপেক্ষা বা অবহেলা করতে পারে না। তার প্রতি সবারই এত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে, তার কথার প্রতিবাদ কর্‌তে কারো সাহস হয় না, যে কোন বিপদে-সম্পদে সে-ই একমাত্র উপদেষ্টা ও ভরসা।

এরা যে ধর্ম্ম মানে না, তা নয়; এই ন্যাংটা জাতেরও ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে। বৎসরে দু'তিনবার এদের দেবতার পূজো হয়। এদের কোন মন্দির, মস্‌জিদ বা চার্চ্চ নেই; তবে এরা গ্রামের নিকটে একটি বৃক্ষকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে, তার চারদিক পরিষ্কার ক'রে পূজোর দিন স্ত্রীপুরুষ ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে একটি ছাগ বা মুর্গি স্নান করিয়ে সেই বৃক্ষের সম্মুখে বেঁধে রাখে; গরু, মুর্গি, শুয়োর, ছাগ অথবা হাঁস—যে কোন একটী চাই-ই। প্রথমতঃ তারা সেখানে দেবতার উদ্দেশ্যে সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষটীর নীচে বেদী তৈরি করে, তাতে নানাজাতীয় পাহাড়ী ফুল দিয়ে সাজিয়ে সবাই মিলে নাচগান আরম্ভ করে। নিকটেই একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়, এই তাদের ভগবানের পূজো বা যজ্ঞের রীতি। তারপর ঐ বৃক্ষের নিকটে রক্ষিত পশুটিকে হত্যা করা হয়। এই আনন্দ-উৎসবের সাথে তাদের ঘরের তৈরি এক প্রকার মদ খাওয়া চল্‌তে থাকে। এভাবেই সে দিনটি আনন্দ-উৎসবের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়।

এদের সরল প্রাণের স্মৃতিটুকু আমার জীবনপথের চিরস্মরণীয় সম্বল হ'য়ে আছে। এই নিরক্ষর মূর্খ জাতির ভিতর এমন কতকগুলো জিনিষ দেখেছি, যা আমাদের শিক্ষাভিমানীদের কাছেও শিক্ষণীয়। এদের সর্ব্বাঙ্গে যেমন কোন আবরণ নেই, ভিতরটাও ঠিক সেরূপই সরল, কোন কপটতা সেখানে নেই। আমাদের মত ভদ্র পোষাকধারী শিক্ষিত কুটিলতাপূর্ণ স্বার্থপর অসত্যপরায়ণ তারা নয়। বিধাতার শুভাশীষে এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক, এই আমার অন্তরের কামনা।

সমাপ্ত